

ইসলাম শিক্ষা

নবম ও দশম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

ইসলাম শিক্ষা

নবম ও দশম শ্রেণি

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ডেস্ট্রে মো. আখতারুজ্জামান

মুহাম্মদ আবদুল মালেক

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

ড. মোহাম্মদ ইউসুফ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৪

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনোক্ত সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লঙ্ঘ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পদ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসম্বৃদ্ধি ও কৌতৃহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লঙ্ঘ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সূজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ধর্মীয় শিক্ষাকে বাস্তব ও জীবনযন্ত্রিত করতে এবং শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনে নিজ ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস ও রীতিসমূহের পরিচিতি প্রদান জরুরি। এই লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটিয়ে ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে নবম ও দশম শ্রেণির জন্য ইসলাম শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে পরিবার, সমাজ, জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল ও মানবিক মূল্যবোধসম্পদ চেতনায় উদ্বৃদ্ধ হয় সেসব দিক বিবেচনায় রেখে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লাসিক অনুষঙ্গ না হয়ে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামূলক ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিচ্ছিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বালানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বালানৱাচি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলক্রটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। প্রবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ক্রটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন, তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর, ২০২৫

প্রফেসর রাবিউল কবীর চৌধুরী
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় : আকাইদ	১-৪০	শিক্ষকের গুণাবলি	১১৫
ইসলাম	২	ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক	১১৬
ইমান	৪	শিক্ষা ও নৈতিকতা	১১৭
মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের উল্লেখ	৭	জিহাদ	১১৯
তাওহিদ	৯	জিহাদ ও সন্তাসবাদ	১২১
আল্লাহ তায়ালার পরিচয়	১০	চতুর্থ অধ্যায় : আখলাক	১২৫-১২২
কুফর	১১	আখলাকে ইমিদাহ	১২৬
শিরক	১৩	তাকওয়া	১২৮
নিহাক	১৫	ওয়াদ্দা পালন	১৩০
রিসাগাত	১৬	সত্যবাদিতা	১৩১
নেতৃত্বিক মূল্যবোধ বিকাশে রিসাগাত ও নবুয়ত	২১	শালীনতা	১৩৩
আসমানি কিতাব	২৩	আমানত	১৩৫
নেতৃত্বিক জীবন গঠনে আসমানি কিতাবের ভূমিকা	২৭	মানবসেবা	১৩৭
আখিরাত	২৮	আত্মবোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি	১৩৯
আখিরাতের কর্যকৃতি স্তর	২৯	নোরীর প্রতি সম্মানবোধ	১৪২
সৎ ও নেতৃত্বিক জীবন গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা	৩৬	বৰ্দেশপ্রেম	১৪৬
দ্বিতীয় অধ্যায় : ইসলামি শরিয়তের উৎস	৪১-৫৬	কর্তৃব্যপ্রাপ্তি	১৪৭
শরিয়ত	৪১	পরিচ্ছন্নতা	১৪৯
শরিয়তের প্রথম উৎস : আল-কুরআন	৪৪	মিতব্যায়তা	১৫১
আল-কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলন	৪৫	আত্মাত্বি	১৫৩
মুক্তি ও মাদানি সূরা	৪৯	সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ	১৫৫
তিলাওয়াত : ওলুত্ত ও মাহাআ	৫১	আখলাকে ধারিমাহ	১৫৮
সূরা আপ-শামস	৫৩	প্রতারণা	১৫৯
সূরা আদ-দৃহা	৫৬	গীবত	১৬০
সূরা আল-ইনশিয়াহ	৬০	হিস্লা	১৬২
সূরা আত-তীন	৬২	ফিতনা-ফাসাদ	১৬৩
সূরা আল-মাউন	৬৫	কর্মবিমুখতা	১৬৫
শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস : সন্মাহ	৬৭	সুদ ও ঘুষ	১৬৭
হাদিস ১ (নিরত সম্পর্কিত হাদিস)	৭১	পঞ্চম অধ্যায় : আদর্শ জীবনচরিত	১৭০-২০০
হাদিস ২ (ইসলামের তিষ্ঠি সম্পর্কিত হাদিস)	৭৩	মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সমকালীন সামাজিক	১৭৪
হাদিস ৩ (দানশীলতা সম্পর্কিত হাদিস)	৭৪	ও সাংস্কৃতিক অবস্থা	
হাদিস ৪ (বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত হাদিস)	৭৫	মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জন্ম, শৈশব ও কৈশোর	১৭৫
হাদিস ৫ (সর্বোত্তম মানুষ সম্পর্কিত হাদিস)	৭৭	হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মৌলককল, নবৃত্যপ্রাপ্তি ও	১৭৬
হাদিস ৬ (মানবপ্রেম ও সূক্তির সেবা সম্পর্কিত হাদিস)	৭৮	ইসলাম গ্রাহণ	
হাদিস ৭ (পরোপকার সম্পর্কিত হাদিস)	৭৯	হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মাদানি জীবন	১৭৮
হাদিস ৮ (ব্যবসায়ে সততা সম্পর্কিত হাদিস)	৮১	হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মক্কা বিজয় ও বিদায় হজ	১৮০
হাদিস ৯ (ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কিত হাদিস)	৮২	খুলাবায়ে রাশেপিলের জীবনদৰ্শ : হযরত আবু বকর (রা.)	১৮২
হাদিস ১০ (যিকির সম্পর্কিত হাদিস)	৮৪	হযরত উমর (রা.)	১৮৩
শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস : আল-ইজ্যা	৮৫	হযরত উসমান (রা.)	১৮৫
শরিয়তের চতুর্থ উৎস : আপ-কিয়াস	৮৭	হযরত আলি (রা.)	১৮৬
শরিয়তের আহকাম সংক্ষেপ পরিভাষা	৮৯	মুসলিম মরীয়া : ইমাম বুখারি (র.)	১৮৮
দ্বিতীয় অধ্যায় : ইবাদত	৯৭-১২৪	ইমাম আবু হানিফা (র.)	১৮৯
ইবাদত	৯৭	ইমাম গায়লি (র.)	১৯১
সালাত	১০০	ইবাদে জারির আত-তাবারি (র.)	১৯১
সাওম	১০২	জান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চৰ্চায় মুসলমানদের অবদান:	
যাকাত	১০৪	চিকিত্সা শাস্ত্র	১৯২
হজ	১০৬	অসায়ল শাস্ত্র	১৯৪
মালিক-শুমিক সম্পর্ক	১১০	ভূগোল শাস্ত্র	১৯৫
ইলম (জ্ঞান)	১১২	গণিত শাস্ত্র	১৯৬
শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য	১১৪		

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এতে বিশ্বজগতের সৃষ্টি, ধর্ম, ইহকালের সব প্রয়োজনীয় বিষয়, মৃত্যু, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সবকিছুই সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মানবজীবনের এমন কোনো দিক নেই যা ইসলামে আলোচনা করা হয়নি। ইসলাম সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে এ বিষয়গুলো আমরা জানতে পারব। এজন্য ইসলাম-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনন্বীক্ষ্য। ইসলাম শিক্ষার পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক হওয়ায় একটি পুস্তক বা একটি শ্রেণিতে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ করা খুবই দুরহ। এ শ্রেণিতে আকাইদ ও নৈতিক জীবন, শরিয়তের উৎস, ইবাদত, আখলাক ও আদর্শ জীবনচরিত শিরোনামে পাঁচটি অধ্যায়ে ইসলামের সুন্দর আদর্শ ও শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ (الْعَقَائِد)

পরিচয়

আকাইদ শব্দটি আকিদা (عَقِيلٌ) শব্দের বহুবচন। আকাইদ অর্থ বিশ্বাসমালা। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকেই আকাইদ বলা হয়। ইসলাম আল্লাহ তায়ালার মনোনীত একমাত্র দীন বা জীবনব্যবস্থা। এর দুটি দিক রয়েছে। যথা- বিশ্বাসগত দিক ও আচরণগত বা প্রায়োগিক দিক। ইসলামের বিশ্বাসগত দিকের নামই হলো আকাইদ। আল্লাহ তায়ালা, নবি-রাসূল, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, পরিকাল, জালাত-জাহানাম ইত্যাদি আকাইদের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়গুলো কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত। মুসলিম হতে হলে সবাইকে এ বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। এরপর নামায, রোয়া, হজ, যাকাত ইত্যাদি প্রায়োগিক দিক তথা ইবাদত পালন করতে হয়। বস্তুত আকাইদের বিষয়গুলোর উপর বিশ্বাসের মাধ্যমেই মানুষ ইসলামে প্রবেশ করে। এজন্য ইসলাম সম্পর্কে আলোচনার শুরুতেই আকাইদ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। এ অধ্যায়ে আমরা সংক্ষেপে আকাইদ বা ইসলামি বিশ্বাসমালার কতিপয় মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা -

- ইসলামের পরিচয় ও ইসলাম শিক্ষা পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক এবং ইমানের মৌলিক ছয়টি বিষয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের প্রতি আস্থা স্থাপনে ও অনুশীলনে উদ্বৃক্ত হব;
- মহান আল্লাহর পরিচয় ও তাওহিদে বিশ্বাসের প্রভাব বর্ণনা করতে পারব;
- তাওহিদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব;
- কুফর, শিরক ও নিফাকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব এবং এগুলোর পরিণতি জানতে পারব;
- বাস্তবজীবনে কুফর, শিরক ও নিফাক পরিহার করে চলতে পারব;
- মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;

- রিসালাত ও নবুয়তের ধারণা এবং নবি-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারব;
- নবি-রাসূলগণের গুণাবলি, তাঁদের আগমনের ধারা, নবি-রাসূলের প্রতি বিশ্বাস ও তাঁদের অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- খতমে নবুয়তের ধারণা, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হিসেবে হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- নেতৃত্ব মূল্যবোধ বিকাশে রিসালাত ও নবুয়তের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস এবং এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলক্ষ্মি করে নিজের জীবনে রিসালাতের শিক্ষা বাস্তবায়নে আগ্রহী হব;
- আসমানি কিতাবের পরিচয় ও তৎপৃষ্ঠি বিশ্বাসের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- নেতৃত্ব জীবন গঠনে আসমানি কিতাবের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, পরমতসহিষ্ণুতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে আল-কুরআনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- আসমানি কিতাবসমূহ ও কুরআন মজিদের পরিচয় জানব, বৈশিষ্ট্য উপলক্ষ্মি করে কুরআন পাঠ করতে উদ্বৃদ্ধ হব;
- আখিরাতের ধারণা ও বিশ্বাসের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- আখিরাতের জীবনের ক্ষরসমূহ- মৃত্যু, কবর, কিয়ামত, হাশর, বিচার, মিয়ান, পুলসিরাত, শাফাআত সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- জান্নাত ও জাহানামের পরিচয়, জান্নাত ও জাহানামের নাম, জান্নাত লাভের ও জাহানাম থেকে পরিত্রাণের উপায় বর্ণনা করতে পারব;
- নেতৃত্ব জীবন গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব;
- আখিরাতে বিশ্বাস ও এর তাৎপর্য অনুধাবন করে পাপমুক্ত, সৎকর্মশীল, নীতিবান, মানবহিতৈষী ব্যক্তি হিসেবে জীবন গঠনে অনুপ্রাণিত হব।

পাঠ ১

ইসলাম (মুসল্লাহ)

পরিচয়

ইসলাম (মুসল্লাহ) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা, শান্তির পথে চলা ইত্যাদি। ব্যবহারিক অর্থে আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল (স.)-এর আনুগত্য করাকে ইসলাম বলে।

শরিয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ তায়ালার প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে তার নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা, বিনা দ্঵িধায় তার যাবতীয় আদেশ-নিষেধের আনুগত্য করা ও হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর দেখানো পথ অনুসারে জীবনযাপন করাকে ইসলাম বলা হয়।

একটি হাদিসে মহানবি (স.) সুন্দরভাবে ইসলামের মূল পরিচয় তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন-

الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَتُقْيِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكُوَةَ وَتَصُومُ الْمَرْضَانَ وَتَحْجَجُ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتُ إِلَيْهِ سَبِيلًا

অর্থ: ইসলাম হলো— তুমি এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই আর মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল। সালাত আদায় করবে, যাকাত প্রদান করবে, রম্যানের রোগা পালন করবে এবং সামর্থ্য থাকলে বাইতুল্লাহর হজ আদায় করবে (বুখারি ও মুসলিম)।

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে বহু আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান প্রেরণ করেছেন। এসব আদেশ-নিষেধ শরিয়ত হিসেবে প্রদান করেছেন। শরিয়তের সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ রূপ হলো ইসলাম। এটি হলো মানবজাতির জন্য নির্দেশিত সর্বশেষ ও সর্বোত্তম জীবন বিধান। আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ عَنْ دِينِ اللَّهِ إِلَّا سَلَامٌ

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত জীবনব্যবস্থা (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯)।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَمَنْ يَبْتَغِ عِزْرَى الإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُفْلِلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ: যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন তালাশ করে, তা কখনও তার নিকট থেকে গ্রহণ করা হবেনা। আর আবিরাতে সে হবে ফতিহাস্ত (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৮৫)।

অতএব যিনি ইসলাম অনুসারে জীবন পরিচালনা করেন তাকে বলা হয় মুসলিম বা মুসলমান।

ইসলামের ভূমিকা

ইসলাম হলো আল্লাহ তায়ালার প্রবর্তিত ধর্ম বা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এটি মানবজাতির জন্য আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ নিয়ামত। মানবজীবনের সকল বিষয় ও সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধানের দিকনির্দেশনা এতে দেওয়া হয়েছে।

اللَّيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ لِكُمْ دِيْنِكُمْ وَأَمْبَثُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً وَرَضِيَتْ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينًا

অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম; আর তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৩)।

মানুষের জন্য থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল কাজকর্মের যথাযথ দিকনির্দেশনা ইসলামে বিদ্যমান। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ই ইসলামে যথাযথভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবন বা পরকালের অবস্থার বর্ণনাও ইসলামে রয়েছে। সুতরাং সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামের বিকল্প নেই।

ইসলাম শব্দটি **سُلْطَن** (সিলমুন) মূলধাতু হতে নির্গত, সিলমুন অর্থ শাস্তি। ইসলাম মানুষকে শাস্তির পথে পরিচালনা করে। ইসলাম বিধি-বিধান মেনে চললে মানুষ দুনিয়া ও আবিরাতে পরিপূর্ণ শাস্তিময় জীবন লাভ করতে পারে। এজন্য ইসলামকে শাস্তির ধর্ম বলা হয়।

ইসলাম সর্বজনীন জীবনবিধান। এটি কোনো কাল, অঞ্চল বা জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়। অন্যান্য ধর্মের নামকরণ সে সব ধর্মের প্রবর্তক, প্রচারক, অনুসারী কিংবা জাতির নামে করা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম সর্বজনীন জীবনবিধান ইওয়ার কারণে এর নামকরণ কারও নামে করা হয়নি। বরং মহান আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যের মাধ্যমে শান্তির পথে জীবন পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে এর নামকরণ করা হয়েছে ইসলাম।

ইসলাম শিক্ষার গুরুত্ব

ইসলাম শিক্ষা হলো ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। কোনো কিছু বাস্তবায়ন করতে হলে প্রথমে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হয়। যেমন সাঁতার কাটতে হলে প্রথমে সাঁতার কী, কীভাবে সাঁতার কাটতে হয় ইত্যাদি শিখতে হয়। গাড়ি চালাতে হলে গাড়ি ও গাড়ি চালনা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। ঠিক তেমনি ইসলাম অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য ইসলাম সম্পর্কে প্রথমে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। আর এর প্রধান মাধ্যম হলো ইসলাম শিক্ষা।

ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ও আনুগত্য শিখতে পারি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চলাফেরা, উঠাবসা কীভাবে করতে হবে তা জানতে পারি। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, ক্ষমা, বিনয়, ন্যূনতা ইত্যাদি গুণের অনুশীলন করতে পারি। লোভ, হিংসা, মিথ্যাচার, অহংকার, পরনিন্দা ইত্যাদি খারাপ অভ্যাস পরিহার করে উভম চরিত্রের অধিকারী হতে পারি। সাম্য, মৈত্রী, আত্ম, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, সহনশীলতা, পারম্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি ইত্যাদির মাধ্যমে সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করতে পারি। পরিকল্পনা জীবনে জান্মাত লাভ ও জাহানাম থেকে মুক্তির উপায় জানতে পারি। এককথায়, ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে আমরা দুনিয়া ও আধিবাসিতে শান্তি ও সফলতা লাভের দিকনির্দেশনা অর্জন করতে পারি। তাই, ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রভাব শুধু অন্যসব বিষয়ের মত পার্থিব জীবনে সীমাবদ্ধ নয়। অর্থাৎ সকল বিষয়ের চেয়ে এর গুরুত্ব ব্যাপক ও গভীর, যা সবার জন্য আবশ্যিক, তিনি যে পেশারই হোন না কেন।

কাজ : ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়-শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে কুরআনের একটি আয়াত
অর্থসহ লিখে দেখাবে এবং মুখ্য শোনাবে।

পার্ট ২ ইমান (إِيمَانٌ)

ইমান (إِيمَانٌ) শব্দটি আমনুন (أَمْنٌ) মূল ধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ- বিশ্বাস করা, আস্থা স্থাপন, স্বীকৃতি দেওয়া, নির্ভর করা, মেনে নেওয়া ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং তদনুযায়ী আমল করাকে ইমান বলে। ইমানের পরিচয় সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন-

أَنْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا لَمْ يَرَكُ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرٌ وَشَرٌّ

অর্থ: ইমান হচ্ছে, আল্লাহ, তার ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ, রাসুলগণ, পরকাল এবং ভাগ্যের ভালো-মন্দের (ভালো-মন্দ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই হয়) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা (মুসলিম)।

ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ, ଇସଲାମେର ମୂଳ ବିଷୟଗୁଲୋର ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍වାସକେଇ ବଲା ହ୍ୟ ଇମାନ । ଇମାନେର ମୌଲିକ ବିଷୟଗୁଲୋ ଆଲ୍‌ହାର ବାଣୀ ଆଲ-କୁରାଅନ ଓ ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ (ସ.)-ଏର ପବିତ୍ର ହାଦିସେ ବିସ୍ତୃତଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରା ହେଯେଛେ ।

ଇମାନେ ମୁଫାସ୍‌ସାଲେ ଇମାନେର ମୌଲିକ ବିଷୟଗୁଲୋ ଏକତ୍ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଯେଛେ । ସେମନ-

أَمْنِتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتبِهِ وَرُسُلِهِ وَشَرِيكِ الْأَخِيرِ وَالْقُدْرَةِ خَيْرٍ وَشَرٍّ وَمِنَ اللَّوْتَعَالِيِّ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ-

ଅର୍ଥ: ଆମି ଇମାନ ଆନଲାମ ଆଲ୍‌ହାର ଥିତି, ତାର ଫେରେଶତାଗଣେର ଥିତି, ତାର କିତାବଗୁଲୋର ଥିତି, ତାର ରାସୁଲଗଣେର ଥିତି, ଆଖିରାତେର ଥିତି, ତାକନ୍ଦିରେର ଥିତି ଯାର ଭାଲୋ-ମନ୍ଦ ଆଲ୍‌ହାହ ତାଯାଲାର ନିକଟ ଥେକେଇ ହ୍ୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ପର ପୁନରୁତ୍ସାନେର ଥିତି ।

ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟଗୁଲୋର ଥିତି ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ଚର୍ମା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟତୀତ ଇମାନଦାର ହେଯା ଯାଯା ନା । ଯିନି ଏଣ୍ଠିଲୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରେନ, ତାକେ ବଲା ହ୍ୟ ମୁମିନ ।

ଇମାନ ଓ ଇସଲାମେର ସମ୍ପର୍କ

ଇମାନ ଓ ଇସଲାମ ଦୁଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଭାଷା । ଇମାନ ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ । ଇସଲାମେର ମୂଳ ବିଷୟଗୁଲୋର ଥିତି ଆନ୍ତରିକ ବିଶ୍ୱାସ, ମୌଲିକ ଶ୍ଵୀକୃତି ଓ ତଦନୁୟାୟୀ ଆମଲ କରାକେ ଇମାନ ବଲା ହ୍ୟ । ଅନ୍ୟଦିକେ ଇସଲାମ ଅର୍ଥ ଆତ୍ସମର୍ପଣ, ଆନୁଗତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି । ମହାନ ଆଲ୍‌ହାହର ଯାବତୀୟ ଆଦେଶ ନିଷେଧ ବିନା ଦ୍ଵିଧାୟ ମେନେ ନେଓଯାର ମାଧ୍ୟମେ ତାର ଥିତି ପୂର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞରଙ୍ଗେ ଆତ୍ସମର୍ପଣ କରାର ନାମ ହଲୋ ଇସଲାମ ।

ଇମାନ ଓ ଇସଲାମେର ମଧ୍ୟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନିଷ୍ଠ ଓ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଦ୍ୟମାନ । ଏଦେର ଏକଟି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟଟି କଲ୍ପନା ଓ କରା ଯାଯା ନା । ଏଦେର ଏକଟି ଅପରାଟିର ଉପର ଗଭୀରଭାବେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଇମାନ ଓ ଇସଲାମେର ସମ୍ପର୍କ ଗାଛେର ମୂଳ ଓ ଶାଖା-ପ୍ରଶାଖାର ମତୋ । ଇମାନ ହଲୋ ଗାଛେର ଶିକଢ଼ ବା ମୂଳ ଆର ଇସଲାମ ତାର ଶାଖା-ପ୍ରଶାଖା । ମୂଳ ନା ଥାକଲେ ଶାଖା-ପ୍ରଶାଖା ହ୍ୟ ନା । ଆର ଶାଖା-ପ୍ରଶାଖା ନା ଥାକଲେ ମୂଳ ବା ଶିକଢ଼ ମୂଳ୍ୟହୀନ । ତନ୍ଦ୍ରପ ଇମାନ ଓ ଇସଲାମ ଏକଟି ଅନ୍ୟଟି ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ୟ ନା । ଇମାନ ମାନୁଷେର ଅନ୍ତରେ ଆଲ୍‌ହାହର ଥିତି ବିଶ୍ୱାସ, ଅନୁରାଗ ଓ ତାଁର ସଂସ୍କରିତ ଲାଭେର ବାସନା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଆର ତାତେ ଇବାଦତ ଓ ଆନୁଗତ୍ୟେର ମାଧ୍ୟମେ ସଜୀବ ଓ ସତେଜ ହ୍ୟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିକଶିତ ହ୍ୟ ଇସଲାମ । ଇସଲାମ ହଲୋ ଇମାନେର ବହିପ୍ରକାଶ । ଇମାନ ହଲୋ ଅନ୍ତରେର ସାଥେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆର ଇସଲାମ ବାହିକ ଆଚାର-ଆଚରଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟବଳିର ସାଥେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେମନ- ଆଲ୍‌ହାହ, ରାସୁଲ, ଫେରେଶତା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟେ ବିଶ୍ୱାସ କରା ହଲୋ ଇମାନ । ଆର ସାଲାତ, ଯାକାତ, ହଜ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ପାଲନ କରା ହଲୋ ଇସଲାମ ।

ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ, ଇମାନ ଓ ଇସଲାମ ଏକଟି ଅପରାଟିର ପରିପୂରକ । ଦୁନିଆ ଓ ଆଖିରାତେ ସଫଳତା ଲାଭ କରତେ ହଲେ ଇମାନ ଓ ଇସଲାମ ଉଭୟଟିକେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ସ୍ଵୀଯ ଜୀବନେ ବାନ୍ଧବାଯନ କରତେ ହବେ ।

ଇମାନେର ମୌଲିକ ବିଷୟମୂଳ୍ୟ

ଇମାନ ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ । ଏକଜନ ମୁସଲିମକେ ଇମାନେର କତଙ୍ଗୁଲୋ ମୌଲିକ ବିଷୟେ ଦୃଢ଼ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରତେ ହ୍ୟ । ଏଣ୍ଠିଲୋ ଆଲ- କୁରାଅନ ଓ ହାଦିସ ଦ୍ୱାରା ଅକାଟ୍ୟଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ । ଏ ବିଷୟଗୁଲୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟତୀତ କେଉଁ ମୁମିନ ବା ମୁସଲିମ ହତେ ପାରେ ନା । ଏକମ ବିଷୟ ମୋଟ ୬୮ । ଏଣ୍ଠିଲୋ ହଲୋ-

୧. ଆଲ୍‌ହାହ ତାଯାଲାର ଥିତି ବିଶ୍ୱାସ

ଇମାନେର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଓ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ବିଷୟ ହଲୋ ଆଲ୍‌ହାହ ତାଯାଲାର ଥିତି ବିଶ୍ୱାସ । ଆଲ୍‌ହାହ ତାଯାଲା ଏକ ଓ ଅଧିତୀଯ । ତିନି ବ୍ୟତୀତ କୋଣେ ଇଲାହ ବା ମାରୁଦ ନେଇ । ତିନି ସକଳ କିଛିର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପାଲନକର୍ତ୍ତା ଓ

রক্ষাকর্তা। তিনি সকল গুণের আধার। তার সত্তা ও গুণাবলি তুলনাহীন। সমস্ত প্রশংসা ও ইবাদত একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারিত। আল্লাহ তায়ালার প্রতি এরূপ বিশ্বাস স্থাপন ইমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২. ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস

ফেরেশতাগণ মহান আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি। তাঁরা নুরের তৈরি। তাঁরা সবসময় আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ও হৃকুম পালনে নিয়োজিত। তাঁদের সংখ্যা অগণিত। তাঁরা নারীও নন, পুরুষও নন। তাঁরা পানাহার ও জৈবিক চাহিদা থেকে মুক্ত। তাঁদের প্রতি এরূপ বিশ্বাস রাখা ইমানের অন্তর্ভুক্ত।

৩. আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস

আসমানি কিতাবসমূহ আল্লাহ তায়ালার বাণী। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে নিজ পরিচয় প্রদান করেছেন। মানা আদেশ-নিবেদ, বিধি-বিধান, সুসংবাদ, সতর্কবাণী ইত্যাদিও এগুলোর মাধ্যমেই এসেছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলগণের নিকট এসব কিতাব পাঠিয়েছেন। দুনিয়াতে সর্বমোট ১০৪ খানা আসমানি কিতাব নাজিল করা হয়েছে। এ সমস্ত কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যিক।

৪. নবি-রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস

মানব জাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে বহু নবি-রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবি-রাসূলগণ ছিলেন আল্লাহ তায়ালার মনোনীত বান্দা। সকল সৃষ্টির মধ্যে তাঁরাই সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাঁরা ছিলেন নিষ্পাপ। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে তাঁরা মানব জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন; মহান আল্লাহর পথে ডেকেছেন, সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখিয়েছেন, ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি ও মুক্তির দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। নবি-রাসূলগণের প্রতি এরূপ বিশ্বাস রাখা ইমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৫. আখিরাতে বিশ্বাস

আখিরাত হলো পরকাল। আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী। এ জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। সেখানে মানুষকে দুনিয়ার জীবনের সকল কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। কবর, হাশর, মিয়ান, সিরাত, জাহাত, জাহান্নাম ইত্যাদি আখিরাতে জীবনের এক একটি পর্যায়। দুনিয়াতে ভালো কাজ করলে মানুষ জাহাত লাভ করবে। আর ইমান না আনলে, অসৎ কাজ করলে মানুষের স্থান হবে ভীষণ আঘাতের স্থান জাহান্নাম।

আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।

মৃত্যুর সাথে সাথেই মানুষের জীবন শেষ হয়ে যায় না। বরং মানবজীবন দুইভাগে বিভক্ত। ইহকাল ও পরকাল। ইহকাল হলো দুনিয়ার জীবন। আর পরকাল হলো মৃত্যুর পরবর্তী জীবন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে মৃত্যুর পর আবার জীবিত করবেন। সে সময় সকল মানুষ হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। আল্লাহ তায়ালা সেদিন বিচারক হিসেবে মানুষের সকল কাজের হিসাব নেবেন। অতঃপর মানুষকে তার ভালো কাজের জন্য পুরস্কার স্বরূপ জাহাতে ও মন্দ কাজের শান্তিস্বরূপ জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। সুতরাং মৃত্যুর পর আমরা সবাই পুনরায় জীবিত হব এ বিশ্বাস রাখা ইমানের অপরিহার্য বিষয়।

৬. তাকদিরে বিশ্বাস

তাকদির অর্থ হলো নির্ধারিত পরিমাণ, ভাগ্য বা নিয়মি। আল্লাহ তায়ালা মানুষের তাকদিরের নিয়ন্ত্রক। তিনিই তাকদিরের ভালোমন্দ নির্ধারণকারী। মানুষ যা চায় তা-ই সে করতে পারবে না। বরং মানুষ শুধু তার কাজের জন্য সাধনা করবে। অতঃপর ফলাফলের জন্য আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করবে। যদি চেষ্টা করার পরও কোনো কিছু না পায় তবে হতাশ হবে না। আর যদি পেয়ে যায় তবুও খুশিতে আত্মহারা হবে না। বরং সবর (ধৈর্য) ধারণ করবে ও শোকর (ক্রতজ্জ্বতা) আদায় করবে। আর তাকদিরের ভালোমন্দ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার হাতে, মনেগ্রামে এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ইমানের উটি বিষয়ের মূল বক্তব্য বুঝিয়ে বলবে।

পাঠ-৩

মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের গুরুত্ব

ইমান অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাসকেই সাধারণত ইমান বলা হয়। আর মানবিক বলতে মানব সম্বন্ধীয় বুঝায়। অর্থাৎ যেসব বিষয় একমাত্র মানুষের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি হওয়ার যোগ্য তাই মানবিক মূল্যবোধ। অন্যকথায় যেসব কর্মকাণ্ড, চিন্তা-চেতনা মানুষ ও মানব সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাই মানবিক মূল্যবোধ।

মানুষ আশ্রাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। এ হিসেবে মানুষের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও কর্মকাণ্ড সবই উন্নত ও সর্বোচ্চ হওয়া উচিত। পশুর ন্যায় কাজকর্ম, লোভ-লালসা ইত্যাদি মানবিকতার আদর্শ নয়। যদি কোনো মানুষ এ আদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়ে পশুর ন্যায় আচরণ করে তবে সে মানবিক মূল্যবোধকে বিনষ্ট করে। মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সমুদ্ধিত রাখার জন্য উন্নত গুণাবলি ও আদর্শ অনুশীলনের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ রক্ষা করা যায়।

মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইমান নানাভাবে মানুষের মানবিকতার বিকাশ সাধন করে থাকে। ইমানের মূলকথা হলো-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَمْدُ رَسُولِ اللَّهِ

(লা ইলাহা ইল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ)। অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ বা মারুদ নেই, মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসুল। এ কালিমার তাৎপর্য হলো আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক ও মারুদ। তিনি ব্যতীত প্রশংসা ও ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি ব্যতীত আর কারও সামনে মাথা নত করা যাবে না। ব্যক্তি পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে আইন ও নিয়ন্ত্রণ হবে আল্লাহ তায়ালার। এ কালিমা মানুষকে আত্মমর্যাদাশীল করে। এ কালিমায় বিশ্বাসী ব্যক্তি শুধু আল্লাহ তায়ালার সামনে মাথা নত করে। পৃথিবীর অন্য কোনো সৃষ্টির সামনে মাথা নত করে না বা আত্মসমর্পণ করে না। ফলে মানুষের মর্যাদা সমুদ্ধিত হয়, মানবিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়।

ইমান মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথে পরিচালনা করে। নেতৃত্ব জীবনযাপনে উদ্ভূত করে। মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই মানবিকতা ও নেতৃত্বকৃতির ধারক হয়। অন্যায় অত্যাচার ও অনেতৃত্ব কার্যকলাপ ইমানের সম্পূর্ণ বিপরীত। পূর্ণাঙ্গ মুমিন ব্যক্তি কখনোই মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের বিপরীত কাজ করতে পারে না। বরং মুমিন ব্যক্তি সবসময়ই নীতি-নেতৃত্বকৃতি ও মানবিকতার আদর্শ অনুসরণ করে। সাম্য, মৈত্রী, আত্ম, সহযোগিতা, সহমর্থতা ইত্যাদি সদ্গুণাবলির চর্চা করে।

কুফর, নিফাক, শিরক ইত্যাদি ইমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ সমস্ত বিষয় মানুষের মধ্যে অসৎ কার্যাবলির বিকাশ ঘটায়। এগুলোর প্রভাবে মানবসমাজে অকৃতজ্ঞতা, অবিশ্বাস, মিথ্যাচার, ওয়াদা খেলাপ, বাগড়া-ফাসাদ, বিদ্রোহ ইত্যাদি জন্ম নেয়। যেমন মুনাফিক সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُلُّ ذُبُونٍ ○

অর্থ : আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী (সূরা আল-মুনাফিকুন, আয়াত ১)।

ইমান মানুষকে নেতৃত্ব মূল্যবোধে উদ্ভূত করে। মন্দ অভ্যাস ও অশ্রীল কার্যাবলি থেকে বিরত রাখে। ইমান মানুষকে দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহির ব্যাপারে সতর্ক করে। মুমিন ব্যক্তি সবসময় মনে রাখেন যে, তাকে একদিন আল্লাহ তায়ালা সামনে হাজির হতে হবে। সেদিন আল্লাহ তায়ালা সব কাজকর্মের হিসাব চাইবেন। অতএব এ জবাবদিহির ভয়ে মুমিন ব্যক্তি সব ধরনের অমানবিক ও অনেতৃত্ব কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى ○ فَإِنَّ أَجْنَانَهُ هِيَ الْمَاوِى ○

অর্থ : আর যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে দঙ্গযামান হওয়ার ভয় করে এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত থাকে। নিশ্চয়ই জাল্লাতই হলো তার বাসস্থান (সূরা আন-নায়িতাত, আয়াত ৪০-৪১)।

মানবিক মূল্যবোধ ও ইমান পারম্পরিক গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। ইসলামের মৌলিক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে ব্যক্তি মুমিন হয়ে ওঠে। জীবনযাপনে সে নিজ খেয়ালখুশির পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনার অনুসারী হয়। ফলে সে সবধরনের অন্যায়, অবিচার ও অনেতৃত্বকৃতি বাদ দিয়ে সুন্দর ও উত্তম আদর্শের অনুশীলন করে থাকে। এভাবে ইমান মানুষের মধ্যে মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়।

কাজ : শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থী আলোচনা করে তিনজনকে বাছাই করবে। এ তিনজন 'মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের গুরুত্ব' বিষয়ে কৌশিক লাভ করা যায়- তা বক্তব্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করবে।

পাঠ-৮

তাওহিদ (الْتَّوْحِيدُ)

পরিচয়

তাওহিদ শব্দের অর্থ একত্ববাদ। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার করে নেওয়াকে তাওহিদ বলা হয়।

তাওহিদের মূল কথা হলো- আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে অদ্বিতীয়। তিনিই প্রশংসনী ও ইবাদতের একমাত্র মালিক। তার তুলনীয় কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لَيْسَ كَمُشَبِّهٍ شَيْءٌ

অর্থ: কোনো কিছুই তার মতে নয় (সূরা আশ-শুরা, আয়াত ১১)।

আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা ও ইবাদতের যোগ্য এক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাসের নাম তাওহিদ।

তাওহিদের গুরুত্ব

ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাওহিদ। অর্থাৎ মুসলিম বা মুসলিম হতে হলে একজন মানুষকে সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদে বিশ্বাস করতে হবে। তাওহিদে বিশ্বাস ব্যতীত কোনো ব্যক্তিই ইমান বা ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না। ইসলামের সকল শিক্ষা ও আদর্শই তাওহিদের উপর প্রতিষ্ঠিত। দুনিয়াতে যত নবি-রাসূল এসেছেন সকলেই তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন। সকলের দাওয়াতের মূলকথা ছিল- **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বা আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তাওহিদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠার জন্য নবি-রাসূলগণ আজীবন সংগ্রাম করেছেন। হ্যরত ইবরাহিম (আ.) অগ্নিকুণ্ডে নিষ্কিঞ্চ হয়েছেন। আমাদের প্রিয়নবি (স.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছেন। বস্তুত, তাওহিদই হলো ইমানের মূল। ইসলামে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

তাওহিদের প্রভাব

তাওহিদ হলো আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদে বিশ্বাস। মানব জীবনে এ বিশ্বাসের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। কেননা আল্লাহ তায়ালাই আমাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তাওহিদে বিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষ এ সত্যকে স্বীকার করে নেয়। মানুষ এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা আদায় করে।

তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে আত্মসচেতন ও আত্মর্যাদাবান করে। মানুষ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারও নিকট মাথা নত করে না। ফলে জগতের সকল সৃষ্টির উপর মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মর্যাদা লাভ করে।

চরিত্রবান হওয়ার ক্ষেত্রেও মানবজীবনে তাওহিদের প্রভাব অপরিসীম। মানুষ আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি ও পরিচয় লাভ করে এবং সেসব গুণে গুণাপ্রিত হওয়ার অনুশীলন করে। মানব সমাজে ঐক্য ও আত্ম প্রতিষ্ঠায়ও তাওহিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা তাওহিদে বিশ্বাস মানব সমাজে এ ধারণা প্রতিষ্ঠা করে যে, সকল মানুষই আল্লাহর বান্দা ও সমান মর্যাদার অধিকারী। এভাবে মানুষের মধ্যে ঐক্যের চেতনা জাগ্রত হয়।

তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে ইবাদত ও সৎকর্মে উৎসাহিত করে। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানুষ সৎকর্মে ব্রতী হয়। অসৎ ও অশুল কাজ থেকে বিরত থাকে। ফলে মানব সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাওহিদে বিশ্বাস পরকালীন জীবনে মানুষকে সফলতা দান করে। তাওহিদে বিশ্বাস ব্যতীত কেউই জান্মাতে প্রবেশ করতে পারবে না। বগ্নত মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই তাওহিদে বিশ্বাস মুক্তি ও সফলতার দ্বার উন্মুক্ত করে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা তাওহিদের পরিচয়, পুরুত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে নিজের অর্জিত ধারণা শিক্ষকের নিকট মৌখিকভাবে উপস্থাপন করবে। শিক্ষক তা মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ-৫

(مَعْرِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى) আল্লাহ তায়ালার পরিচয়

আল্লাহ তায়ালা এ বিশ্বজগতের অধিপতি ও মালিক। তিনি একক ও অদ্বিতীয় সত্তা। তার কোনো শরিক নেই। তিনি অনন্য ও অতুলনীয়।

‘আল্লাহ’ শব্দের মধ্যেই তার তুলনাহীন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। **اللَّهُ** (আল্লাহ) আরবি শব্দ। পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই এ শব্দের কোনো প্রতিশব্দ নেই। এর কোনো একবচন- বহুবচন নেই। এ শব্দের কোনো স্ত্রীলিঙ্গ বা পুরুলিঙ্গ নেই। এ শব্দটি একক ও অতুলনীয়। আল্লাহ তায়ালাও তদ্বাপ। তিনি তার সত্তা ও গুণাবলিতে একক ও অদ্বিতীয়। তার সমতুল্য বা সমর্কক্ষ কিছুই নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ أَنَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُوَلَّدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ۝

অর্থ : বলুন (হে নবি!) তিনিই আল্লাহ। একক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তার মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। আর তার সমতুল্য কেউই নেই (সূরা আল-ইখলাস, আয়াত ১-৪)।

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা। তিনি অনাদি অনন্ত। তিনি চিরস্থায়ী ও চিরবিরাজমান। তার কোনো শুরুও নেই, শেষও নেই। তিনি পানাহার, নিদা, তন্দু, ঝাঁকি সবকিছু থেকে মুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۝ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

অর্থ : তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গোপন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত (সূরা আল- হাদিদ, আয়াত ৩)।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন-

اللَّهُ أَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ أَكْبَحُ الْقَيْوُمُ ۝ لَا تُخْدِلُكَ سِنَةٌ ۝ وَلَا نَوْمٌ ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝

অর্থ : তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরজীব ও সর্বসন্তার ধারক। তন্দু বা নিদা তাকে কখনোই স্পর্শ করতে পারে না। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সবই তার অধীন (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৫৫)।

আল্লাহ তায়ালা সকল গুণের আধার। সকল গুণ তার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তিনি সৃষ্টিকর্তা। বিশ্বজগৎ ও এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই তার সৃষ্টি। তিনি রিয়িকদাতা। সকল সৃষ্টিই রিয়িকের জন্য তার মুখাপেক্ষী। তিনিই সর্বশক্তিমান সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। সকল কিছুই তার পরিচালনায় সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এককথায় তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত। তার গুণের কোনো সীমা নেই। সুন্দর ও পরিত্র নামসমূহ একমাত্র তারই জন্য নির্ধারিত। তার কতিপয় গুণবাচক নাম হলো- রহিম (অসীম দয়ালু), জাববার (থ্রেল), গাফফার (অতি ক্ষমাশীল), বাসির (সর্বদ্রষ্টা), সামিউ (সর্বশ্রোতা), আলিউ (মহান), হাকিয় (মহারক্ষক) ইত্যাদি।

বক্ষত আল্লাহ তায়ালা তার সত্তা ও গুণাবলিতে এক ও অতুলনীয়। তার কোনো শরিক নেই। সকল প্রশংসা তারই জন্য, ইবাদতের ঘোগ্য সত্তা একমাত্র তিনিই।

কাজ : শিক্ষার্থীরা আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কিত পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত আয়াতমালা অর্থসহ খাতায় লিখে শিফ্ফককে দেখাবে।

পাঠ-৬ কুফর (الْكُفْرُ)

পরিচয়

কুফর (الْكُفْرُ) শব্দের আভিধানিক অর্থ অস্মীকার করা, অবিশ্বাস করা, ঢেকে রাখা, গোপন করা, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, অবাধ্য হওয়া ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটিরও প্রতি সম্পূর্ণ বা আধিক অবিশ্বাস করাকে কুফর বলা হয়।

কুফর হলো- ইমানের বিপরীত। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোতে বিশ্বাসের নাম ইমান। আর এসব বিষয়ে অবিশ্বাস, অস্মীকার, তুচ্ছ বা চ্যালেঞ্জ করা হলো কুফর।

কাফির

যে ব্যক্তি কুফরে লিঙ্গ হয় তাকে বলা হয় কাফির। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি ইসলামের কোনো মৌলিক বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ বা আধিকভাবে অবিশ্বাস করে তখন তাকে কাফির বলা হয়। কাফির অর্থ অবিশ্বাসী, অস্মীকারকারী। মানুষ নানাভাবে কাফির বা অবিশ্বাসী হতে পারে। যেমন:

ক. আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব অবিশ্বাস বা অস্মীকার করার দ্বারা। অর্থাৎ ‘আল্লাহ নেই’ এমন কথা বললে সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে।

খ. আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি অস্মীকার করা। যেমন- আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টিকর্তা বা রিজিকদাতা না মানা।

গ. ইমানের মৌলিক ছয়টি বিষয়ের যে কোন একটিকেও অবিশ্বাস করা। যেমন- ফেরেশতা, নবি-রাসূল, আসমানি কিতাব, আখিরাত, তকদির ইত্যাদি অবিশ্বাস করা।

ঘ. ইসলামের মৌলিক ইবাদতগুলো অস্মীকার করা। যেমন- সালাত, যাকাত, সাওম, হজ ইত্যাদিকে ইবাদত হিসেবে না মানা।

ঙ. হালালকে হারাম মনে করা। যেমন- হালাল খাদ্যকে হারাম মনে করে না খাওয়া।

চ. হারামকে হালাল মনে করা। যেমন- মদ, জুয়া, সুদ, ঘূষ ইত্যাদিকে হালাল বা জায়েজ মনে করা।

- ছ. ইচ্ছাকৃতভাবে কাফিরদের (শ্রেষ্ঠ মনে করে তাদের) অনুকরণ করা ও তাদের ধর্মীয় চিহ্ন ব্যবহার বা ধারণ করা।
- জ. ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা। যেমন, মহানবি (স.) কিংবা কুরআনকে নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করা।
- ঝ. আল-কুরআন ও হাদিসের কোন তথ্য বা নির্দেশনা অঙ্গীকার করা। যেমন: জিন বলতে কিছু নেই- এটি মনে করা।

কুফরের পরিণতি ও কুফল

মানবজীবনে কুফরের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কুফরের ফলে শুধু দুনিয়াতেই নয় বরং আধিরাতেও মানুষকে শোচনীয় পরিণতি বরণ করতে হবে। এর কতিপয় কুফল নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

ক. অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতা

কুফর মানুষের মধ্যে অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতার জন্ম দেয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই আমাদের লালন-পালন করেন। পৃথিবীর সকল নিয়ামত তারই দান। কাফির ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে অবিশ্বাস করে, এসব নিয়ামত অঙ্গীকার করে। সে আল্লাহ তায়ালার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়। আল্লাহ তায়ালার বিদ্ধি-নিষেধ অমান্য করে। ফলে সমাজে সে অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হিসেবে পরিচিত হয়।

খ. পাপাচার বৃক্ষি

কাফির ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা, পরকাল, হাশর, মিয়ান, জাহাত, জাহানাম ইত্যাদি অবিশ্বাস করে। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে মানুষকে তার কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে এরূপ ধারণাও অঙ্গীকার করে। তার নিকট দুনিয়ার জীবনই প্রধান। সুতরাং দুনিয়ায় ধন-সম্পদের ও আরাম-আয়েশের লোভে সে নানারকম অসৎ ও অশ্রীল কাজে জড়িয়ে পড়ে। চুরি-ভাকাতি, ছিনতাই, সন্ত্রাস, সুদ-ঘূষ, জুয়া ইত্যাদিতে সে অভ্যন্ত হয়ে পড়ে। ফলে সমাজে পাপাচার বৃক্ষি পায়।

গ. হতাশা সৃষ্টি

স্বভাবগতভাবেই মানুষ ভরসা করতে পছন্দ করে। আশা-ভরসা না থাকলে মানুষ সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। কাফির ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাকদিরে অবিশ্বাস করে। ফলে সে যেকোনো বিপদে আপদে দৈর্ঘ্যহারা হয়ে পড়ে। মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে দৈর্ঘ্যধারণ করতে পারে না। অন্যদিকে তকদিরে বিশ্বাস না থাকায় যেকোনো ব্যর্থতায় সে চরম হতাশ হয়ে পড়ে। ফলে তার জীবন চরম হতাশায় অতিবাহিত হয়।

ঘ. দুনীতির প্রসার

কুফর মানবসমাজে দুনীতির প্রসার ঘটায়। আধিরাত, জাহাত ও জাহানামে বিশ্বাস না থাকায় কাফির ব্যক্তি নৈতিকতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে না এবং দুনিয়ার স্বার্থে মিথ্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার ইত্যাদি যেকোনো পাপ ও অনৈতিক কাজই সে বিনা দ্বিধায় করতে পারে। নবি-রাসূলগণকে বিশ্বাস না করায় তাদের নৈতিক চরিত্র এবং শিক্ষাও সে অনুসরণ করে না। এভাবে কুফরের মাধ্যমে সমাজে দুনীতির প্রসার ঘটে।

৬. আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি

কুফরির মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার প্রতি অবিশ্বাস, অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতা সৃষ্টি হয়। কাফির আল্লাহ তায়ালার বিধি-বিধান ও আদেশ-নিয়েদের কোনো পরোয়া করে না। বরং আল্লাহ তায়ালা, ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে বিদ্রোহ ও বিরোধিতা করে। ফলে আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। আর যার প্রতি আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন, সে যত ক্ষমতা ও সম্পদের মালিক হোক না কেন তার ধ্বংস অনিবার্য।

৭. অনন্তকালের শাস্তি

পরকালে কাফিররা জাহানামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। তারা জাহানামে চিরকাল থাকবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন- ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا هُنْ فِيهَا خَلِدُونَ﴾

অর্থ : আর যারা কুফরি করবে এবং আমার নির্দেশনগুলোকে অস্বীকার করবে তারাই জাহানামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৩৯)।

কুফর একটি মারাত্মক পাপ। সুতরাং এ থেকে সকলেরই বেঁচে থাকা উচিত।

কাজ : শিক্ষার্থীরা পাঠ্য পুস্তকে উল্লিখিত কুফরের পর্যায়ভুক্ত উদাহরণ ব্যতীত বাস্তব জীবনে যেসব কথা ও কাজ কুফরের শামিল হতে পারে- তা জোড়ায় আলোচনা করে শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক উপস্থাপন করবে।

পাঠ-৭

শিরক (الشِّرْك)

পরিচয়

শিরক শব্দের অর্থ অংশীদার সাব্যস্ত করা, একাধিক স্রষ্টা বা উপাস্যে বিশ্বাস করা। ইসলামি পরিভাষায়, মহান আল্লাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তার সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়। যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে বলা হয় মুশরিক। শিরক হলো তাওহিদের বিপরীত। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং শিরকের ধারণা খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন-

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَكْلَمُ﴾

অর্থ : বলুন (হে নবি!) তিনি আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয় (সূরা আল-ইখলাস, আয়াত ১)। অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন-

﴿لَيْسَ كَمِثْلَهُ شَيْءٌ﴾

অর্থ : কোনো কিছুই তার সদৃশ নয় (সূরা আশ-শুরা, আয়াত ১১)। আল-কুরআনে আরও বলা হয়েছে-

﴿لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهٌ مِّثْلُهُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾

অর্থ : যদি সেখানে (আসমান ও জমিনে) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ থাকত তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত (সূরা আল-আমিয়া, আয়াত ২২)।

আল-কুরআনের এসব আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে আল্লাহ তায়ালার সন্তা ও গুণে অতুলনীয়তার বিষয়টি বোঝা যায়। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা নিঃসন্দেহে শিরক ও জঘন্য অপরাধ।

আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরক চার ধরনের হতে পারে। যথা-

১. আল্লাহ তায়ালার সন্তা ও অঙ্গিতে শিরক করা। যেমন- ঈসা (আ.) কিংবা উয়ায়ের (আ:) -কে আল্লাহর পুত্র অথবা মরিয়ম (আ:) কে আল্লাহর স্তৰী মনে করা।
২. আল্লাহ তায়ালার গুণাবলিতে শিরক করা। যেমন- আল্লাহ তায়ালার পাশাপাশি অন্য কাউকে পালনকর্তা মনে করা।
৩. সৃষ্টি জগতের পরিচালনায় কাউকে আল্লাহর অংশীদার বানানো। যেমন- ফেরেশতাদের জগৎ পরিচালনাকারী হিসেবে মনে করা।
৪. ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে শিরক করা। যেমন- আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদাহ করা, কারও নামে পশু জবাই করা মৃত্তিপূজা করা ইত্যাদি।

শিরকের কুফল ও প্রতিকার

শিরক অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। পৃথিবীর সকল থকার জুলুমের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো শিরক। আল্লাহ তায়ালা বলেন- ۝
إِنَّالشَّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

অর্থ : নিচয়ই শিরক চরম জুলুম (সূরা লুকমান, আয়াত ১৩)।

বন্ধন আল্লাহ তায়ালাই আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তার প্রদত্ত নিয়ামতই আমরা ভোগ করি। এরপরও কেউ যদি আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করে তবে তা অপেক্ষা বড় জুলুম আর কি হতে পারে?

আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট। তিনি অপার ক্ষমাশীল ও অসীম দয়াময় হওয়া সত্ত্বেও শিরকের অপরাধ ক্ষমা করেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنِ يَشَاءُ

অর্থ : নিচয়ই আল্লাহ তার সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এতদ্ব্যতীত যেকোনো পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৪৮)।

বন্ধন আল্লাহ তায়ালার দয়া, ক্ষমা ও রহমত ব্যতীত দুনিয়া ও আধিরাতের কল্যাণ লাভ করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। পরকালে মুশরিকদের জন্য রয়েছে যত্রণাদায়ক শাস্তি। আল-কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে-

إِنَّمَنِ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقْدُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَرَاهُ النَّارُ

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে আল্লাহ তার জন্য অবশ্যই জাহান হারাম করে দেবেন। এবং তার আবাস জাহান্নাম (সূরা আল-মায়দা, আয়াত ৭২)।

প্রকৃতপক্ষে শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এরূপ কাজ থেকে সকলেরই সদাসর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। ভুগ্রমে আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরক করে ফেললে সাথে সাথে পুনরায় ইমান আনতে হবে। অতঃপর বিশুদ্ধ অন্তরে তওবা করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। সাথে সাথে ভবিষ্যতে এরূপ পাপ না করার শপথ গ্রহণ করতে হবে। তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা স্মীয় দয়া ও করণের মাধ্যমে পাপ ক্ষমা করে দিতে পারেন।

আমরা অবশ্যই শিরক থেকে বেঁচে থাকব এবং আল্লাহর উপর সুন্দর ইমান এনে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হব। তাহলেই আমাদের ইহকাল ও পরকাল মঙ্গলময় হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত শিরকের পর্যায়ভুক্ত উদাহরণ ব্যতীত বাস্তব জীবনে যেসব কথা ও কাজ শিরকের শামিল হতে পারে- তা দলগত আলোচনা করে শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক উপস্থাপন করবে।

পাঠ-৮ নিফাক (النِّفَاقُ)

পরিচয়

নিফাক শব্দের আভিধানিক অর্থ ভণামি, কপটতা, দিমুখিতা, ধোকাবাজি, প্রতারণা ইত্যাদি। এর ব্যবহারিক অর্থ হলো অন্তরে একরকম ভাব রেখে বাইরে এর বিপরীত অবস্থা প্রকাশ করা। অর্থাৎ অন্তরে বিরোধিতা গোপন রেখে বাইরে আনুগত্য প্রদর্শন করা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, অন্তরে কুফর ও অবাধ্যতা গোপন করে মুখে ইসলামকে স্বীকার করার নাম হলো নিফাক। যে এরূপ কাজ করে তাকে বলা হয় মুনাফিক। মুনাফিকরা অন্তরের দিক থেকে কাফির ও অবাধ্য। কিন্তু বাহ্যিকভাবে তারা ইসলাম ও ইমান স্বীকার করে এবং মুসলিমদের ন্যায় ইবাদত পালন করে। এক কথায়, মুনাফিক হলো ছদ্মবেশী কাফির।

রাসুলুল্লাহ (স.) মুনাফিকদের চিহ্ন বর্ণনা করে বলেছেন-

أَيْةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ- إِذَا حَدَّثَ كَذَبٌ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُتْمِنَ خَانَ.

অর্থ : মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, আর যখন কোনো কিছু তার নিকট আমানত রাখা হয় তার খিয়ানত করে (বুখারি)।

নিফাকের কুফল ও প্রতিকার

নিফাক একটি মারাত্মক পাপ। এটি মানুষের চরিত্র ও নৈতিকতা ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে মানুষ মিথ্যাচারে অভ্যন্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّ الْمُنَفِّقِينَ لَكُلُّ بُؤْنٍ

অর্থ : আর আল্লাহ সাক্ষ দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী (সূরা আল-মুনাফিকুন, আয়াত ১)।

মিথ্যার পাশাপাশি মুনাফিকরা অন্যান্য খারাপ ও অনৈতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। পার্থিব লোভ-লালসা ও স্বার্থ রক্ষায় তারা মানুষের অকল্যাণ করতেও পিছপা হয় না। তারা পরনিন্দা ও পরচর্চা করে। ফলে

সমাজে সন্দেহ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। মুনাফিকরা ভেতরে এক আর বাইরে অন্য রকম হওয়ায় লোকজন তাদের বিশ্বাস করে না। বরং সন্দেহ ও ঘৃণার চোখে দেখে। সমাজের মানুষের নিকট তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জীবন কঠায়।

ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য মুনাফিকরা খুবই ক্ষতিকর। কেননা তারা মুসলমানদের সাথে মিশে ইসলামের শক্তির সাহায্য করে। মুসলমানদের গোপন তথ্য ও দুর্বলতার কথা শক্তদের জানিয়ে দেয়। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর যুগেও মদিনাতে মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্ণনে লিপ্ত ছিল। তাই কাফিরের চেয়ে মুনাফিকরা অধিকতর ভয়াবহ।

তারা ইসলাম ও মুসলমানগণের সাথে থেকেও আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য ছিল। পরকালীন জীবনে মুনাফিকদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। তাদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدُّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّاسِ

অর্থ : নিচয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৪৫)।

আমরা নিফাক থেকে বেঁচে থাকব। আমাদের আত্মায়-স্বজন, বক্তু-বাক্তব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের নিকট নিফাকের কুফল ও পরিণতির কথা তুলে ধরব ও তাদের সতর্ক করব। রাসুলুল্লাহ (স.) মুনাফিকদের যে তিনটি চিহ্ন বা নির্দর্শনের কথা বলেছেন এগুলো থেকে আমরা অবশ্যই বেঁচে থাকব এবং নিজ জীবনে উন্নত চরিত্র অনুশীলন করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা নিফাক থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য ব্যক্তি, পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজ জীবনে যেসব ভালো কাজ করবে এবং যেসব খারাপ কাজ পরিহার করবে- তার একটি তালিকা প্রস্তুত করবে।

পাঠ ৯

রিসালাত (الرسالة)

পরিচয়

রিসালাত শব্দের আভিধানিক অর্থ বার্তা, চিঠি পৌছানো, পয়গাম, সংবাদ বা কোনো ভালো কাজের দায়িত্ব বহন করা। ইসলামি পরিভাষায়, নবি-রাসূলগণ কর্তৃক মহান আল্লাহ তায়ালার পবিত্র বাণী মানুষের নিকট পৌছে দেওয়ার দায়িত্বকে রিসালাত বলা হয়। আর যিনি এ দায়িত্ব পালন করেন তাঁকে বলা হয় রাসূল। রাসূল শব্দের বহুবচন রাসূল।

রিসালাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

ইসলামি জীবনদর্শনে রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করা ইমানের জন্য অপরিহার্য। তাওহিদে বিশ্বাসের সাথে প্রত্যেক মুমিন ও মুসলিমকেই রিসালাতে বিশ্বাস করতে হয়। ইসলামের মূলবাণী কালিমা তায়িবাতে এ বিষয়টি

সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। এ কালিমার প্রথমাংশ **إِلَهٌ لَا إِلَهٌ مِّنْ دُوْنِهِ** (লা ইলাহা ইল্লাহাহ; অর্থ- আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ বা মারুদ নেই) দ্বারা তাওহিদের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আর সাথে সাথে দ্বিতীয়াংশ **مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ** [মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ: অর্থ- মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসুল] দ্বারা রিসালাতের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তাওহিদে বিশ্বাস স্থাপনের ন্যায় রিসালাতেও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

বস্তুত রিসালাতে বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন হতে পারে না। কেননা মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। এ স্বত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা অনন্ত, অসীম আল্লাহ তায়ালার পূর্ণ পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। তাই নবি-রাসুলগণ মানুষের নিকট আল্লাহ তায়ালার পরিচয় তুলে ধরেছেন। তাঁর পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা ও গুণাবলির বর্ণনা প্রদান করেছেন। তাঁরা ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্য আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জীবনবিধান ও দিকনির্দেশনা নিয়ে এসেছেন। হ্যরত মুহাম্মদ (স.) না আসলে নবি ও রাসুল সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারতাম না। এমনকি আল্লাহ তায়ালার সন্তা ও সিফাতের পরিচয়ও লাভ করতে পারতাম না। মূলত নবি-রাসুলগণের আনীত বাণী ও বর্ণনার ফলেই মানুষের পক্ষে তা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং নবি-রাসুলগণের এ সমস্ত সংবাদ বা রিসালাতকে বিশ্বাস করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, রিসালাতকে অঙ্গীকার করলে প্রকারান্তরে মহান আল্লাহকেই অঙ্গীকার করা হয়। অতএব, মানবজীবনে রিসালাতে বিশ্বাস করা ইমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে নির্ধারিত।

নবি-রাসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য

আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য-অগণিত নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্যইনভাবে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়নি বরং তাঁরা নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁদের বেশ কিছু কাজ করতে হতো। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় কাজ হলো-

- তাঁরা মানুষের নিকট আল্লাহ তায়ালার পরিচয় তুলে ধরতেন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার জাত-সিফাত, ক্ষমতা, নিয়ামত ইত্যাদি বিষয়ের কথা মানুষের নিকট প্রকাশ করতেন।
- সত্য ও সুন্দর জীবনের দিকে আহবান জানাতেন।
- আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ও ধর্মীয় নানা বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন।
- পরকাল সম্পর্কে ধারণা প্রদান করতেন।
- পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান বাস্তবায়নের জন্য হাতে-কলমে শিক্ষা দিতেন।

নবি-রাসুলগণের গুণাবলি

নবি-রাসুলগণ ছিলেন আল্লাহ তায়ালার মনোনীত বান্দা। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাঁদের নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

۶ ﴿اللَّهُ يَصُطْفِنِي مِنَ الْمُلْكِ كَمَا رُسِّلَ وَمِنَ النَّاسِ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بِصَوْتِهِ﴾

অর্থ : আল্লাহ তায়ালাই ফেরেশতাদের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকেও রাসূল মনোনীত করেন; আল্লাহ তো সর্বশ্রেষ্ঠ, সম্যক দ্রষ্টা (সুরা আল-হাজ, আয়াত ৭৫)।

সুতরাং মনোনীত বান্দা ছিলেনে নবি-রাসূলগণ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। প্রথমত, তাঁরা ছিলেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাসী। সবধরনের কথায় ও কাজে তাঁরা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের অনুসরণ করতেন। আল্লাহ তায়ালার পূর্ণ আনুগত্যই ছিল তাঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

নবি-রাসূলগণ ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, সুবিবেচক ও বিচক্ষণ। তাঁরা ছিলেন নিষ্পাপ। তাঁরা সবধরনের পাপ-পঞ্চিলতা থেকে পবিত্র ছিলেন। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁদের সকল প্রকার অন্যায় ও অশীলতা থেকে বঁচিয়ে রাখতেন। হ্যরত ইউসুফ (আ.) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ নবি। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, “আমি তাঁকে মন্দ কাজ ও অশীলতা থেকে বিরত রাখার জন্য এভাবে নির্দেশ দেখিয়েছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।” (সুরা ইউসুফ, আয়াত ২৪)

নবি-রাসূলগণ ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। সকল সৎগুণ তাঁরা অনুশীলন করতেন। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত সৎ, সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ। দয়া, ক্ষমা, ধৈর্য ইত্যাদি সব ধরনের মানবিক গুণ তাঁদের চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। মিথ্যা, অতারণা, পরনিন্দা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি খারাপ স্বভাবের লেশমাত্র তাঁদের চরিত্রে কখনোই ছিল না। বরং তাঁরা ছিলেন সৎস্বভাবের জন্য মানবজাতির অনুপম আদর্শ।

কর্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্বপালনে নবি-রাসূলগণ ছিলেন অতুলনীয়। নবৃত্ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁরা বিন্দুমাত্র অলসতা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করেননি। বরং এজন্য কাফিরদের বহু অত্যাচার ও নিপীড়ন ধৈর্যসহকারে সহ্য করেছেন। কিন্তু তারপরও তাঁরা যথাযথভাবে মানুষের নিকট আল্লাহ তায়ালার বাণী পৌছিয়েছেন। তাঁরা ছিলেন নির্লিপি ও নিঃস্বার্থ। পার্থিব কোনো লাভের আশায় তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব থেকে কখনো পিছগা হননি। কাফিররা ইসলামের দাওয়াত প্রচার বন্ধ করার জন্য তাঁদের নানা প্রলোভন দেখাত। কিন্তু তাঁরা পার্থিব স্বার্থের কাছে মাথা নত করেননি।

দ্বীন প্রচারে নবি-রাসূলগণ ছিলেন ত্যাগের মূর্ত প্রতীক। বিনা দ্বিধায় পার্থিব আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ তাঁরা আল্লাহর নির্দেশে ত্যাগ করতেন। দ্বীন প্রচারের স্বার্থে দ্বিয়নবি (স.) বাড়ি-ঘর, আত্মীয়-স্বজন, এমনকি নিজ দেশ মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। নবি-রাসূলগণের জীবনীতে ত্যাগের এরকম আরও অসংখ্য উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়।

নবৃত্তের ধারা

আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসূল প্রেরণ করেছেন। সর্বপ্রথম নবি ছিলেন হ্যরত আদম (আ.), আর সর্বশেষ নবি ও রাসূল হলেন হ্যরত মুহাম্মদ (স.)। এঁদের মাঝখানে আল্লাহ তায়ালা আরও বহু নবি-রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবি-রাসূলদের আগমনের এই ধারাবাহিকতাকেই নবৃত্তের ক্রমধারা বলা হয়। দুনিয়াতে আগত সকল গোষ্ঠী বা জাতির জন্যই আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসূল বা পথপ্রদর্শনকারী পাঠিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاذِهِ

অর্থ : আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই পথপ্রদর্শক রয়েছে (সূরা আর-রাদ, আয়াত ৭)।

তাঁরা মানুষকে এক আল্লাহ তায়ালার দিকে ডাকতেন। সত্য ও সুন্দর জীবনবিধান তথা আল্লাহর দ্বীন অনুসরণের নির্দেশ দিতেন।

সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত শরিয়ত তথা দীনের বিধি-বিধান এক রকম ছিল না। বরং মানবজাতির পরিবেশ, পরিস্থিতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন শরিয়ত দেওয়া হতো। নবি-রাসূলগণ তা মানবসমাজে বাস্তবায়ন করতেন। তবে সব নবি-রাসূলের দ্বীনের মৌলিক কাঠামো ছিল এক ও অভিন্ন। আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ বা তাওহিদ ছিল সবারই প্রচারিত দ্বীনের মূলকথা। হ্যরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে আগত সকল নবি-রাসূলই এ দ্বীন প্রচার করেছেন। হ্যরত নূহ (আ.), হ্যরত ইবরাহিম (আ.), হ্যরত মুসা (আ.), হ্যরত দাউদ (আ.), হ্যরত ইস্সা (আ.) সকলেই এই একই দ্বীন ও শিক্ষা প্রচার করেছেন। আমাদের প্রিয়নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন নবুয়াতের ধারার সর্বশেষ নবি। তাঁর পরে আর কোনো নবি আসেননি, আসবেনও না। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাধ্যমে দীনের পূর্ণতা প্রদান করেন।

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন—

الْيَوْمَ أَكْتُلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَمْبَثْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا

অর্থ : আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে জীবনবিধান হিসেবে মনোনীত করলাম (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৩)।

এভাবে দ্বীনের বিধি-বিধান পূর্ণতা প্রাপ্তির ফলে নবি-রাসূলগণের আগমনের ধারাও বদ্ধ হয়ে যায়। ফলে নবুয়াতের ধারাও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। মানুষের হিদায়াতের জন্য আগমনকারী এসব নবি-রাসূল সকলেই ছিলেন আল্লাহ তায়ালার মনোনীত বান্দা। তাঁদের সকলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ طَكْلٌ أَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلِئَكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفِقُ بَيْنَ أَخْلِقِ مِنْ رَسِيلِهِ

অর্থ : রাসূল, তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ইমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। তাদের সবাই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণে ইমান এনেছেন। তাঁরা বলে, আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৮৫)।

নবুয়াতের ধারায় আগমনকারী সব নবি-রাসূলকে বিশ্বাস করা ইমানের অপরিহার্য শর্ত। এঁদের কাউকে বিশ্বাস এবং কাউকে অবিশ্বাস করা যাবে না। বরং সকলকেই আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত নবি-রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে। নবি-রাসূল হিসেবে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে। কারও প্রতিই কোনোরূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ বা কটাক্ষ করা যাবে না।

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি

নবুয়তের ধারার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ছিলেন আমাদের প্রিয়নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)। তিনি ছিলেন অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। দুনিয়াতে আগমনকারী সব নবি-রাসূলই কোনো বিশেষ গোত্র, বিশেষ দেশ, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু হ্যরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সারা বিশ্বের সকল স্থানের সকল মানুষের নবি। তিনি বিশ্বনবি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قُلْ كَيَأْتِيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ بِجِئِيْعًا

অর্থ : (হে নবি!) আপনি বলুন, হে মানবমণ্ডলি! আমি তোমাদের সকলের জন্যই আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত (সূরা আল-আরাফ, আয়াত ১৫৮)।

রাসূলুল্লাহ (স.) ছিলেন সর্বকালের নবি। কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আগমন করবে সকলের নবি তিনিই। তাঁর শিক্ষা, আদর্শ ও আনীত কিতাব আল-কুরআন সকলকেই অনুসরণ করতে হবে। তিনি রহমতের নবি। মানবজাতির জন্য তিনি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নিয়ামত ও অনুগ্রহস্বরূপ। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ۝

অর্থ : আর (হে নবি!) আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতকপেই প্রেরণ করেছি (সূরা আল-আবিয়া, আয়াত ১০৭)।

অতএব, আমাদের প্রিয় নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি। হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-কে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হিসেবে বিশ্বাস করা প্রত্যেক মুসলমানের ইমানি কর্তব্য।

খতমে নবুয়তের অর্থ ও এতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

হ্যরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বশেষ নবি। তাঁর মাধ্যমে দীনের পূর্ণতা ঘোষিত হয় এবং নবুয়তের ধারা সমাপ্ত হয়। তিনি নবি-রাসূলগণের ধারায় সর্বশেষে আগমন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাঁকে ‘খাতামুন নাবিয়িন’ তথা সর্বশেষ নবি বলে অভিহিত করেছেন।

খাতামুন অর্থ শেষ, সমাপ্তি। আর নবুয়ত হলো নবিগণের দায়িত্ব। সুতরাং খতমে নবুয়তের অর্থ নবুয়তের সমাপ্তি। আর যার মাধ্যমে নবুয়তের ধারার সমাপ্তি ঘটে তিনি হলেন খাতামুন নাবিয়িন বা সর্বশেষ নবি।

আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসূল প্রেরণ করেছেন। এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন হ্যরত আদম (আ.)। আর সর্বশেষ ছিলেন হ্যরত মুহাম্মদ (স.)। হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর মাধ্যমে নবি-রাসূলগণের আগমনের ধারা শেষ বা বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং তিনিই সর্বশেষ নবি বা খাতামুন নাবিয়িন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلِكُنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ

অর্থ : মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবি (সুরা আল-আহ্যাব, আয়াত ৪০)।

খাতামুন শব্দের আরেকটি অর্থ সিলমোহর। কোনো কিছুতে সিলমোহর তখন অঙ্গিত করা হয় যখন তা পূর্ণ হয়ে যায়। সিলমোহর লাগানোর পর তাতে কোনো কিছু প্রবেশ করানো যায় না। নবুয়তের সিলমোহর হলো নবুয়তের পরিসমাপ্তির ঘোষণা। নবুয়তের দায়িত্বের পরিসমাপ্তি ঘোষণা। অর্থাৎ নতুনভাবে কোনো ব্যক্তি নবি হতে পারবে না এবং নবুয়তের ধারায় প্রবেশ করতে পারবে না। এটাই হলো খতমে নবুয়তের মূল কথা। আমাদের প্রিয় নবি (স.) হলেন খাতামুন নাবিয়িন। তিনি সর্বশেষ নবি। তাঁর পরে আর কোনো নবি নেই। তাঁর পরে আজ পর্যন্ত কোনো নবি আসেননি। কিয়ামত পর্যন্ত আসবেনও না। তাঁর পরবর্তীতে যারা নবুয়ত দাবি করেছে তারা সবাই ভঙ্গ, মিথ্যাবাদী ও প্রতারক। কেননা মহানবি (স.) বলেছেন —

اَكَ حَاتُّمُ النَّبِيِّنَ لَا نَبِيٌّ بَعْدِيٍّ

অর্থ : আমি শেষ নবি। আমার পরে কোনো নবি নেই (মুসলিম)।

অন্য একটি হাদিসে মহানবি (স.) বলেছেন- “অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে। তারা প্রত্যেকেই নবি হওয়ার দাবি করবে। অথচ আমিই সর্বশেষ নবি। আমার পর আর কোনো নবি আসবে না” (আবু দাউদ)।

হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-কে খাতামুন নাবিয়িন হিসেবে বিশ্বাস করা ইমানের অন্যতম অঙ্গ। তাঁর পরবর্তীতে যারা নবি বলে দাবি করেছে সবাই মিথ্যাবাদী। আমরা এসব মিথ্যাবাদীকে নবি হিসেবে বিশ্বাস করব না। তাদের শিক্ষা, আদর্শ বর্জন করব।

আমরা জীবনের সর্বাবস্থায় মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণ করে চলব।

কাজ : নবি-রাসূলের আগমন না হলে মানুষের জীবনব্যবস্থা কেমন হতো? এ বিষয়ে শিক্ষার্থীরা গরেন্ট
আকারে লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১০

নেতৃত্ব মূল্যবোধ বিকাশে রিসালাত ও নবুয়ত

ইসলাম নীতি-নেতৃত্বকার ধর্ম। ইসলামের সমস্ত আকিদা-বিশ্বাস, বিধি-বিধান, শিক্ষা-আদর্শ নেতৃত্বকার ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ইসলামি জীবনদর্শনে রিসালাত ও নবুয়ত অপরিহার্য বিষয়। নবুয়ত ও রিসালাত হলো নবি-রাসূলগণের দায়িত্ব। আল্লাহ তায়ালার বাণী ও শিক্ষা মানুষের নিকট পৌছে দেওয়াকে নবুয়ত ও রিসালাত বলা হয়। মানবজীবনে নেতৃত্ব মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসারে নবুয়ত ও রিসালাত প্রধানত দুই ভাবে ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রথমত, নবুয়ত ও রিসালাতের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব, পরিচয় ও গুণবলি সম্পর্কে জ্ঞান দান করা। মানুষকে সত্য ও সুন্দরের দিকে পরিচালনা করা। সর্বোগৱি ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ ও সফলতার দিকনির্দেশনা প্রদান করা। নবুয়ত ও রিসালাতের শিক্ষা মানুষকে শান্তি ও শৃঙ্খলার দিকে পরিচালনা করে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের সকল কাজকর্ম আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত পথে পরিচালনা করতে সাহায্য করে। এভাবে দেখা যায়, যে ব্যক্তি নবুয়ত ও রিসালাতের শিক্ষানুসারে জীবনযাপন করে সেই পরিপূর্ণ মানুষ। এরূপ ব্যক্তি সমস্ত মানবিক গুণের অধিকারী হয়। পশ্চত্ত্বের অভ্যাস ত্যাগ করে মনুষ্যত্বের অভ্যাস অনুশীলন করে। নবুয়ত ও রিসালাতের চেতনা মানুষের মধ্যকার সমস্ত খারাপ অভ্যাস, অশ্রীলতা ও মন্দকর্মের চর্চা দূর করে দেয়। মানুষ সৎ ও সুন্দর জীবনযাপনে উৎসাহিত হয়। উত্তম চরিত্র ও নৈতিক আচার-আচরণে উন্নুন হয়। এভাবে নবুয়ত ও রিসালাতের শিক্ষায় মানুষ নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়।

দ্বিতীয়ত, নবুয়ত ও রিসালাত মানুষকে নবি-রাসূলগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে। নবি-রাসূলগণ ছিলেন নিষ্পাপ। তাঁরা ছিলেন সকল সৎগুণের অধিকারী। উত্তম চরিত্রের নমুনা ছিল তাঁদের জীবনচরিত। কোনোরূপ অন্যায়, অনৈতিক ও অশ্রীল কাজকর্ম তাঁদের চরিত্রে কখনোই ছিল না। বরং সর্বাবহায় নীতি ও নৈতিকতার আদর্শ রক্ষা করাই ছিল তাঁদের অন্যতম দায়িত্ব। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

لَقَدْ كَانَ لِكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ : অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ (সূরা আল-আহ্যাব, আয়াত ২১)।

ব্রহ্মত নবি-রাসূলগণ ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁদের জীবনী ও শিক্ষা আমাদের জন্য আদর্শ। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আমি শিক্ষকরণে প্রেরিত হয়েছি। (ইবনে মাজাহ)

রাসূলুল্লাহ (স.) ছিলেন মানবতার মহান শিক্ষক। তিনি মানুষকে মানবতা ও নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য, আত্ম, সাহায্য-সহযোগিতা ইত্যাদির নির্দেশনা থদান করেছেন। অত্যাচার, অবিচার ও অনৈতিকতার বদলে সত্য, ন্যায় ও মানবিকতার কথা বলেছেন। মানুষকে উত্তম চরিত্রবান হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। নিজ জীবনে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ অনুশীলনের মাধ্যমে হাতে কলমে মানুষকে নৈতিকতা সমৃদ্ধ রাখতে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি স্বয়ং বলেছেন-

إِنَّمَا بَعْثَتُ لِأَنْوَمَةَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

অর্থ : উত্তম গুণবলির পরিপূর্ণতা দানের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি (বায়হাকি)।

ব্রহ্মত নবি-রাসূলগণ সকলেই ছিলেন উত্তম আদর্শের নমুনা। আর আমাদের প্রিয়নবি (স.) ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম। তাঁর চরিত্রে মানবিক সবগুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

নবুয়ত ও রিসালাতে বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা ইসলামি জীবনদর্শনে প্রবেশ করি। অতঃপর নবি-রাসূলগণের জীবনী ও আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ কামনা করি। এভাবে আমাদের জীবন ও চরিত্র উত্তম হয়। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়। মানবসমাজে পশ্চত্ত্বের পরিবর্তে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা নেতৃত্ব মূল্যবোধ বিকাশে রিসালাত ও নবুয়াতের গুরুত্ব সম্পর্কে ১৫টি বাক্য নিজ খাতায় বাড়ি থেকে লিখে এনে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১১

(الْكُتُبُ السَّمَاءِيَّةُ) আসমানি কিতাব

পরিচয়

কিতাব শব্দের অর্থ লিপিবদ্ধ বা লিখিত বস্তু। এর প্রতিশব্দ হলো গ্রন্থ, পুস্তক, বই ইত্যাদি। আসমানি কিতাব হলো এমন গ্রন্থ যা আল্লাহ তায়ালা থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

ইসলামি পরিভাষায়, যেসব কিতাব আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য দিকনির্দেশনা স্বরূপ নাজিল করেছেন তাকে আসমানি কিতাব বলে। অন্যকথায় আল্লাহ তায়ালার বাণী সম্বলিত গ্রন্থাবলিকে আসমানি কিতাব বলা হয়। সুতরাং আসমানি কিতাব হলো আল্লাহর বাণীসমষ্টি। আল্লাহ তায়ালা জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে তাঁর বাণী রাসূলগণের নিকট প্রেরণ করেছেন। অতঃপর নবি-রাসূলগণ তা মানুষের নিকট পৌছে দিয়েছেন।

আসমানি কিতাবের বিষয়বস্তু

আল্লাহ তায়ালা আসমানি কিতাবসমূহে নানা বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। যেমন-

ক. আল্লাহ তায়ালার সত্ত্বাগত পরিচয়।

খ. আল্লাহ তায়ালার গুণাবলির বর্ণনা।

গ. নবি-রাসূলগণের বর্ণনা।

ঘ. পূর্ববর্তী জাতিসমূহের বিবরণ।

ঙ. অবাধ্য ও কাফিরদের পরিগতির বিবরণ।

চ. হালাল-হারামের বর্ণনা।

ছ. বিধি-বিধান সংক্রান্ত বিবরণ।

জ. শান্তি ও সতকীকরণ বিষয়ে আলোচনা।

ঝ. উপদেশ ও সুসংবাদ সম্পর্কে বিবরণ।

ঝঃ. আকিদা সংক্রান্ত বিষয়সমূহের বিবরণ।

ঝঃ. পরকাল সংক্রান্ত বিষয়সমূহের বিবরণ ইত্যাদি।

প্রসিদ্ধ আসমানি কিতাবসমূহ

আসমানি কিতাবগুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধ কিতাব চারখানা। এ চারখানা কিতাব চারজন প্রসিদ্ধ রাসুলের উপর নাজিল হয়। এগুলো হলো—

১. তাওরাত - হযরত মুসা (আ.)-এর উপর নাজিল হয়েছে।
২. যাবুর - হযরত দাউদ (আ.)-এর উপর নাজিল হয়েছে।
৩. ইঞ্জিল - হযরত ইস্রাইল (আ.)-এর উপর নাজিল হয়েছে।
৪. কুরআন - বিশ্ববি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর নাজিল হয়েছে।

ছোট কিতাবগুলোকে সহিফা বলা হয়।

আসমানি কিতাবে বিশ্বাসের গুরুত্ব

আসমানি কিতাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করা ইমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আসমানি কিতাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপন না করলে ইমানের মূল বিষয়ই নড়বড়ে হয়ে যায়। কেননা আসমানি কিতাবগুলোর মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ তায়ালা, নবি-রাসুল, ফেরেশতা, পরকাল ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পেরেছে। এসব বিষয় সম্পর্কে পবিত্র আল-কুরআনের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি। যদি কেউ আসমানি কিতাবসমূহ ও তাতে বর্ণিত বিষয়সমূহে অবিশ্বাস করে তবে স্বভাবতই সে ইমানের অন্যান্য বিষয়গুলোও অস্বীকার করে। সুতরাং ইমান আনার জন্য আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। অন্যথায় পূর্ণ মুমিন হওয়া যায় না।

আসমানি কিতাবসমূহ হলো সকল জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস। এর মাধ্যমেই আমরা সৃষ্টিজগৎ, মানবসৃষ্টি, পরকাল ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারি। মানব জীবনে চলার পথ সম্পর্কে সঠিক দিকনির্দেশনা আসমানি কিতাবসমূহেই পাওয়া যায়। আসমানি কিতাবসমূহে বিশ্বাসই এসব বিষয়কে আমাদের বাস্তবজীবনে অনুশীলনের অনুপ্রেরণা দেয়।

সর্বশেষ আসমানি কিতাব ‘আল-কুরআন’

আল-কুরআন আল্লাহ তায়ালার বাণী। মানবজাতির হিদায়াতের লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর এ কিতাব নাজিল করেন। আল-কুরআনই হলো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব।

নবি করিম (স.)-এর ৪০ বছর বয়সে হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন থাকাবস্থায় সর্বপ্রথম সুরা আলাকের প্রথম ৫টি আয়াত নাজিল হয়। এভাবে পবিত্র কুরআন নাজিল শুরু হয়। অতঃপর রাসুল (স.)-এর নবুয়তের ২৩ বছরে অল্প অল্প করে প্রয়োজন মাফিক সম্পূর্ণ কুরআন নাজিল হয়।

আল-কুরআন ৩০টি খণ্ডে বিভক্ত। এগুলোর প্রত্যেকটিকে এক একটি পারা বলা হয়। এর সূরা সংখ্যা ১১৪টি এবং কুরু সংখ্যা ৫৮৮টি।

কুরআনের নামকরণ

কুরআন অর্থ পঠিত। আল-কুরআন পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পঠিত গ্রন্থ। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায়ে বাধ্যতামূলকভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ মহাগ্রন্থকে কুরআন বলা হয়।

কুরআনের অন্য অর্থ একত্র করা বা জন্ম করা। আল-কুরআনে পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের শিক্ষা ও মূলনীতি একত্র করা হয়েছে বিধায় একে কুরআন বলা হয়।

আল-কুরআনের বেশকিছু নাম রয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধ নাম—

১. আল-কিতাব (**الْكِتَبُ**)- গ্রন্থ;
২. আল-ফুরকান (**الْفُرْقَانُ**)- (সত্য-মিথ্যার) পার্থক্যকারী;
৩. আল-হিকমা (**الْحِكْمَةُ**)- জ্ঞান, প্রজ্ঞা;
৪. আল-বুরহান (**الْبُرْهَانُ**)- সুস্পষ্ট প্রমাণ;
৫. আল-হক (**الْحَكْ**) - সত্য;
৬. আল-নুর (**النُّورُ**)- জ্যোতি;
৭. আল-হুদা (**الْهُدَا**)- পথনির্দেশ;
৮. আয়-বিকর (**الْيُّكْرُ**)- উপদেশ;
৯. আশ-শিফা (**الشِّفَاءُ**)- নিরাময়;
১০. আল-মজিদ (**الْمَجِيدُ**)- সম্মানিত, মহিমান্বিত;
১১. আল-মাওয়িয়া (**الْمَوْعِظَةُ**)- সদুপদেশ;
১২. আর-রাহমান (**الرَّحْمَةُ**)- অনুগ্রহ, দয়া ইত্যাদি।

কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য

আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মর্যাদাবান গ্রন্থ। এটি দুনিয়ার সকল গ্রন্থ, এমনকি অন্যান্য আসমানি কিতাবের তুলনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এর সমকক্ষ আর কোনো কিতাব নেই।

আল-কুরআন পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব। এ গ্রন্থ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার। সব বিষয়ের মূলনীতি এ গ্রন্থে বিদ্যমান। আঙ্গুহ তায়ালা বলেন—

مَا فَرَّطَنَا فِي الْكِتَبِ مِنْ شَيْءٍ

অর্থ : আমি এই কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেইনি (সূরা আল-আনআম, আয়াত ৩৮)।

সুতরাং আল-কুরআন হলো পূর্ণসং গ্রন্থ। মানবজীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের যথাযথ নির্দেশনা এ কিতাবে বিদ্যমান।

আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানি কিতাব। আল্লাহ তায়ালা মহানবি (স.)-এর মাধ্যমে ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ফলে পৃথিবীতে আর কোনো নবি-রাসূল আসবেন না। কোনো আসমানি কিতাবও নাজিল হবে না। কুরআনের শিক্ষাই কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ ধাকবে। তাছাড়া পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের সার-নির্যাসও কুরআনে রয়েছে। সুতরাং এটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব।

আল-কুরআন সদ্বেহমুক্ত কিতাব। দুনিয়ার কোনো গ্রন্থই নির্ভুল বা অকাট্য নয়। কিন্তু কুরআন নির্ভুল এবং এটি সদ্বেহেরও বাইরে। সদ্বেহের উদ্দেশ্য হতে পারে এমন কোনো বিষয়ই এতে নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

ذلِكُ الْكِتَبُ لَا رَبَّ يَنْهَا

অর্থ : এটি (কুরআন) সেই কিতাব, যাতে কোনো সদ্বেহ নেই (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২)।

সর্বজনীন কিতাব হিসেবেও আল-কুরআনের মর্যাদা অনন্য। এটি কোনো দেশ, কাল বা জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং সকল যুগের সব মানুষের জন্য এটি উপদেশ ও পথনির্দেশক। সুতরাং এটি সর্বজনীন কিতাব। আল-কুরআন একমাত্র অবিকৃত গ্রন্থ। নাজিলের পর থেকে আজ পর্যন্ত এর একটি হৃকত বা নুকতাও পরিবর্তিত হয়নি। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এর রক্ষক। তিনি বলেন—

إِنَّمَا نَزَّلْنَا إِلَيْكُمْ وَآتَنَا لَكُمْ قُرْآنًا كَفِيلًا

অর্থ : আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই এর সংরক্ষক (সূরা আল-হিজর, আয়াত ৯)।

বন্তত আল-কুরআন অবিকৃত ও অপরিবর্তিত গ্রন্থ। আজ পর্যন্ত এতে কোনোরূপ সংযোজন, সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন বা বিয়োজন হয়নি, আর ভবিষ্যতেও হবে না।

কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও মর্যাদাপূর্ণ কিতাব। এতে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য, ইতিহাস, ভবিষ্যত্বাণী, বিজ্ঞান, সৃষ্টি রহস্য ইত্যাদি বিষয় খুব সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এটি যেহেতু আল্লাহ তায়ালার বাণী সুতরাং এর মর্যাদাও তারই ন্যায় অতুলনীয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

كُلُّ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّفْعُولٍ

অর্থ : বন্তত এটি সম্মানিত কুরআন। সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ (সূরা আল-বুরুজ, আয়াত ২১-২২)।

আল-কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। এটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও মহিমায় ভাস্বর। এটি পরিবর্তন, বিকৃতি, সংযোজন-বিয়োজন থেকে মুক্ত ও পবিত্র। এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব।

আমরা পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য অনুধাবন করব। ভঙ্গি ও সম্মান সহকারে আমরা কুরআন পাঠ করব এবং এর শিক্ষা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করে তা আমাদের বাস্তব জীবনে কার্যকর করব। কুরআনই হবে আমাদের জীবন চলার পাথেয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা লটারির মাধ্যমে কুরআনের নামসমূহের একেকজনে একটি করে অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবে।

পাঠ ১২

নৈতিক জীবন গঠনে আসমানি কিতাবের ভূমিকা

পথচারী মানুষের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসুলগণের মাধ্যমে যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তাই আসমানি কিতাব। আসমানি কিতাব হলো আল্লাহ তায়ালার বাণী ও বিধি-নিষেধের সমষ্টিত গ্রন্থ। মানব জীবনকে নৈতিক ও আদর্শিক পথে পরিচালনা করতে আসমানি কিতাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আসমানি কিতাবগুলো মানুষকে আল্লাহ তায়ালার সত্ত্ব, গুণাবলি, ক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। তাছাড়া মানুষ আসমানি কিতাবের বর্ণনা দ্বারা পরিকাল, জাহাত-জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান ও পরিচয় জানতে পারে। এসব বিষয়ের জ্ঞান মানুষকে সত্য ও সুন্দর জীবন গঠনে অনুপ্রাণিত করে।

আল্লাহ তায়ালা আসমানি কিতাবসমূহে বহু নবি-রাসুলের ঘটনাও বর্ণনা করেছেন। পাশাপাশি তাঁদের অনুসারী পুণ্যবান ও মুমিনদের সফলতার কাহিনীও তুলে ধরেছেন। আসমানি কিতাবের মাধ্যমে মানুষ এসব কাহিনী ও ঘটনা জানতে পারে। তাঁদের সফলতা ও সম্মানের মূল চাবিকাটি হিসেবে নৈতিকতার গুরুত্ব বুঝতে পারে। ফলে মানুষ নৈতিক জীবন গঠনে উৎসাহিত হয়। নবি-রাসুলগণের ঘটনার পাশাপাশি আসমানি কিতাবসমূহে কাফির, মুশরিক ও পাপাচারীদের ঘটনাও বর্ণনা করা হয়েছে। এরপে করা হয়েছে এজন্য যে, মানুষ যেন এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ করে। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব আল-কুরআনে ফিরআউন, নমরাদ, কারুন প্রমুখ নাফরমানের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আদ, ছামুদ ইত্যাদি পাপাচারী জাতিসমূহের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও আল্লাহ তায়ালার প্রতি অকৃতজ্ঞতা, অবাধ্যতা, গর্ব-অহংকার, পাপাচার, মিথ্যাচার, অনৈতিক ও অশ্রীল কার্যকলাপের দরুণ তাঁদের শোচনীয় পরিণতির কথা আমরা আসমানি কিতাবের মাধ্যমেই জানতে পারি। এসব ঘটনা আমাদের অনৈতিক ও অন্যায় কার্যাবলি থেকে বিরত থাকতে এবং সৎ ও মানবিক জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করে।

জ্ঞান বা শিক্ষা হলো এক প্রকার আলো। এটি মানুষের অন্তর চক্ষুকে খুলে দেয়। শিক্ষিত মানুষ ব্যর্থতার কারণ ও সফলতার সোপান সম্পর্কে অবগত থাকে। সুশিক্ষিত মানুষ নৈতিক ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হয় এবং ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে শান্তি ও সফলতা লাভ করে থাকে। আসমানি কিতাব মূলত জ্ঞানের সর্বোত্তম উৎস। আসমানি কিতাব মানুষকে সবধরনের কল্যাণের পথনির্দেশ করে। আল-কুরআন

প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

ذِلِكَ الْكِتَابُ لَا رَبِّ يَرْبِّيهُ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

অর্থ : এটি সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই। এটি মুওকিদের জন্য পথনির্দেশক (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ০২)।

আল-কুরআন হলো সকল জ্ঞানের আধার। মানবজীবনের প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূলনীতি ও সারকথা এ গ্রন্থে নির্ভুলভাবে বর্ণিত হয়েছে। এভাবে আল-কুরআনের শিক্ষা মানুষকে সুশিক্ষিত করে তোলে ও নৈতিকতা বিকাশে সহায়তা করে।

আসমানি কিতাবসমূহে মানুষকে নীতি-নৈতিকতার আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসব গ্রন্থে উন্নত আদর্শ ও সংগৃহাবলির নানা বিষয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। পাশাপাশি যেসব কাজ ও অভ্যাসের দ্বারা নৈতিক জীবনাচরণ লভিত হয় সে সম্পর্কে সতর্ক ও নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। তাওরাত, ঘাবুর, ইঞ্জিল ইত্যাদি কিতাব পাঠ করলেও মানবিকতার বহু দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার পর থেকে অন্য কিতাবগুলোর কার্যকারিতা রাহিত করা হয়েছে। সর্বোপরি আল-কুরআনে নীতি-নৈতিকতার পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা রয়েছে। এ কিতাব অনুসরণে জীবন পরিচালনা করলে মানব জীবন নীতি-নৈতিকতামণ্ডিত সুন্দর ও শান্তিময় হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা নৈতিক জীবন গঠনে আসমানি কিতাবের ভূমিকা সম্পর্কে ১০টি বাক্য খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৩

আখিরাত (آخرة)

পরিচয়

আখিরাত অর্থ পরকাল। মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলা হয়। মানবজীবনের দুটি পর্যায় রয়েছে। ইহকাল ও পরকাল। ইহকাল হলো দুনিয়ার জীবন। আর মৃত্যুর পরে মানুষের যে নতুন জীবন শুরু হয় তার নাম পরকাল বা আখিরাত।

আখিরাত অনন্তকালের জীবন। এ জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। এটি মানুষের চিরস্থায়ী আবাস। আখিরাতে মানুষের দুনিয়ার কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। অতঃপর ভালো কাজের পুরক্ষার স্বরূপ জালাত এবং মন্দ কাজের জন্য জাহানামের শান্তি দেওয়া হবে।

আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

আখিরাত ইমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামি জীবনদর্শনে আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন অপরিহার্য। এ বিশ্বাসের গুরুত্ব ও অপরিসীম। আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া মুমিন ও মুওকি হওয়া যায় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَبِالْأُخْرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ ٦

অর্থ : আর তারা (মুত্তাকিগণ) আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৪)।

তাওহিদ ও রিসালাতে বিশ্বাসের পাশাপাশি আখিরাতেও বিশ্বাস করা অত্যাবশ্যক। আখিরাতে বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন বা মুসলিম হতে পারে না। পরকালীন জীবনের সফলতা ও জালাত লাভ করার জন্যও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আখিরাতে বিশ্বাস না করলে মানুষ সত্যপথ থেকে দূরে সরে যায়, পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَمَنْ يَكُفُرْ بِاللَّهِ وَمَلِئَكَتِهِ وَكُنْتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ بَعْدًا ۝

অর্থ : আর কেউ আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ, তার কিতাবসমূহ, তার রাসূলগণ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি অবিশ্বাস করলে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৩৬)।

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখে এবং পুণ্য কাজ করতে উৎসাহ যোগায়। কেননা আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি জানে যে, পরকালে তাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, দুনিয়ার সব কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। ফলে বিশ্বাসী ব্যক্তি দুনিয়াতে সৎকাজে উৎসাহিত হয় এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকে। এভাবে মানুষ অসচ্চরিত্ব বর্জন করে চরিত্রবান হয়ে ওঠে। অপরদিকে আখিরাতে যে অবিশ্বাস করে সে সুযোগ পেলেই পাপাচার ও অশ্লীল কাজে লিঙ্গ হয়ে পড়ে। কেননা সে পরকালীন জীবাদিহিতে বিশ্বাসী নয়। এভাবে আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাস মানবসমাজে অত্যাচার ও পাপাচার বৃদ্ধি করে। আখিরাতে বিশ্বাসী মানুষ কখনো পাপাচার ও অশ্লীল কাজে লিঙ্গ হতে পারে না।

অন্যদিকে, আখিরাতে বিশ্বাস মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি মানবজীবনকে কল্যামুক্ত, পবিত্র ও সুন্দর করে তোলে।

অতএব, আমরা আখিরাতের প্রতি দৃঢ় ইমান আনব এবং আখিরাতে মুক্তির জন্য সৎ ও সুন্দর কাজ করব এবং ইসলামের বিধি-বিধান অনুসরণ করে জীবন-যাপন করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা আখিরাতে বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তি উগ্রাগ্ন করবে।

পাঠ ১৪

আখিরাতের কয়েকটি স্তর

আখিরাত হলো পরকাল। মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলে। এ জীবন চিরস্থায়ী ও অনন্ত। আখিরাত বা পরকালের কয়েকটি স্তর বা পর্যায় রয়েছে। এ পাঠে আমরা সংক্ষেপে আখিরাতের বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় সম্পর্কে জানব।

ক. মৃত্যু (الموت)

আখিরাত বা পরকালীন জীবনের শুরু হয় মৃত্যুর মাধ্যমে। সুতরাং মৃত্যু হলো পরকালের প্রবেশদ্বার।

আল্লাহ তায়ালা সকল ধার্মীয় মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনি বলেন—

كُلُّ نَفِسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

অর্থ : প্রত্যেক ধার্মীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮৫)।

দুনিয়ার কোনো ধার্মীই মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবে না। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, সুস্থ-অসুস্থ, শাসক-শাসিত কেউই মৃত্যুকে এড়াতে পারবে না। যত বড় ক্ষমতাধারীই হোক আর যত সুরক্ষিত হালে বসবাস করুক সবার নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যু হবেই। এছাড়াও অন্যান্য ধার্মীরও মৃত্যু অনিবার্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

أَيَّمَا تَكُونُوا إِنَّ رَبَّ الْمَوْتِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ

অর্থ : তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৭৮)।

মৃত্যুর সাথে সাথে আধিরাতের জীবন শুরু হয়। পুণ্যবান মানুষের মৃত্যু হয় আল্লাহ তায়ালার রহমতের সাথে। আর পাপীদের মৃত্যু খুব কঠিক হয়।

খ. কবর (القبر)

মৃত্যুর পর থেকে পুনরুদ্ধান পর্যন্ত সময়কে কবরের জীবন বলা হয়। এর অপর নাম বারযাখ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَمَنْ وَرَأَهُمْ بَرَزَخٌ إِلَيْهِمْ يُنَعِّثُونَ

অর্থ : আর তাদের সামনে বারযাখ থাকবে পুনরুদ্ধান দিবস পর্যন্ত (সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত ১০০)।

দুনিয়াতে মানুষকে মৃত্যুর পর কবরস্থ করা হয়। এসময় মুনকার-নাকির নামক দুজন ফেরেশতা কবরে আসেন। তাঁরা মৃত ব্যক্তিকে তিনটি প্রশ্ন করেন। এগুলো হলো—

১। منْ رَبِّكَ ? - তোমার রব কে?

২। وَمَا دِينُكَ ? - তোমার দীন কী?

৩। وَمَنْ تَبِيَّنَكَ ؟ - তোমার নবি কে? অথবা, ? অথবা, ? (রাসুল (স.) এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়) এই ব্যক্তি কে?

যাদের কবর দেওয়া হয় না তাদেরও এ প্রশ্ন করা হবে। দুনিয়াতে যারা ইসলাম অনুসারে জীবন পরিচালনা করবে তারা এ প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে পারবে। তাদের জন্য কবরের জীবন হবে শান্তিময়। আর যারা ইসলাম অনুসরণ করবে না তারা এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না। তারা বলবে, ‘আফসোস! আমি জানি না।’ কবরের জীবনে তারা কঠোর শান্তি ভোগ করবে।

গ. কিয়ামত (الْقِيَامَةُ)

আকাইদ শাস্ত্রে কিয়ামত বলতে দুটি অবস্থাকে বোঝানো হয়।

প্রথমত : কিয়ামত অর্থ মহাপ্রলয়। আল্লাহ তায়ালা এ গোটা বিশ্ব মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষকে তার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এমন একদিন আসবে যখন গোটা বিশ্বে মহান আল্লাহর ইবাদত করার মতো কেউ থাকবে না। এমনকি আল্লাহ নাম নেওয়ার মতোও কাউকে পাওয়া যাবে না। সকল মানুষ গোমরাহি ও নাফরমানিতে লিঙ্গ হয়ে পড়বে। সেসময় আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবী ধ্বংস করে দেবেন। তাঁর নির্দেশে হ্যরত ইসরাফিল (আ.) শিঙায় ফুঁক দেবেন। ফলে চন্দ্ৰ-সূর্য ও তারকারাজি খসে পড়বে, পাহাড় পর্বত তুলার ন্যায় উড়তে থাকবে, ভূগর্ভস্থ সবকিছু বের হয়ে যাবে, সকল প্রাণী মৃত্যু বরণ করবে এবং গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এ সময় শুধু আল্লাহ তায়ালা থাকবেন। আর কেউ বিদ্যমান থাকবে না। পৃথিবী ধ্বংসের এ মহাপ্রলয়ের নাম কিয়ামত।

দ্বিতীয়ত : কিয়ামতের অন্য অর্থ দাঁড়ানো। পৃথিবী ধ্বংসের বছদিন পর আল্লাহ তায়ালা আবার সকল প্রাণীকে জীবিত করবেন। আল্লাহর নির্দেশে ইসরাফিল (আ.) পুনরায় শিঙায় ফুঁক দেবেন। তখন মানুষ পুনরায় জীবিত হয়ে কবর থেকে উঠে হাশরের ময়দানে হিসাব নিকাশের জন্য সমবেত হবে। ঐ সময়ে কবর থেকে উঠে দাঁড়ানোকে বলা হয় কিয়ামত। একে 'ইয়াওমুল বা'আছ' বা পুনর্জ্ঞান দিবসও বলা হয়।

কিয়ামতের এ উভয়বিধি অবস্থা প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَنُفَخَ فِي الصُّورِ فَصَعَقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى نُفَخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ

○ يَنْظَرُونَ

অর্থ : আর শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে। ফলে যাদের আল্লাহ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীর সকলেই মৃর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখনই তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে (সূরা আঘ-বুমার, আয়াত ৬৮)।

ঘ. হাশর (الْحَشْرُ)

হাশর হলো মহাসমাবেশ। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে সকল মানুষ ও প্রাণিকূল মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবে। সকলেই সেদিন একজন আহবানকারী ফেরেশতার ডাকে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। এ ময়দান বিশাল ও সুবিন্যস্ত। পৃথিবীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষই সেদিন এ মাঠে একত্রিত হবে। মানুষের এ মহাসমাবেশকেই হাশর বলা হয়।

হাশরের ময়দান হলো হিসাব নিকাশের দিন, জবাবদিহির দিন। এদিন আল্লাহ তায়ালা হবেন একমাত্র বিচারক। আল্লাহ তায়ালা বলেন- ১٥
مِلِلِيٍّ يَوْمُ الدِّينِ

অর্থ : তিনি (আল্লাহ) বিচার দিবসের মালিক (সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত ৩)।

সেদিন সকল মানুষের সমস্ত কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। হাশরের ময়দানে মানুষের আমলনামা দেওয়া হবে। যাঁরা পুণ্যবান তাঁরা ডান হাতে আমলনামা লাভ করবেন। আর পাপীরা বাম হাতে আমলনামা পাবে।

হাশরের ময়দান ভীষণ কঠের স্থান। সেদিন সূর্য মাথার উপর একেবারে নিকটে থাকবে। মানুষ প্রচণ্ড তাপে ঘামতে থাকবে। সেদিন আল্লাহর তায়ালার আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না।

সাত শ্রেণির লোক সেদিন আরশের ছায়াতলে স্থান পাবে। এদের মধ্যে একশ্রেণি হলো সেসব ব্যক্তি যে যৌবনকালে আল্লাহর ইবাদত করেছে। হাশরের ময়দানে পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা থাকবে না। একমাত্র হাউজে কাউছারের পানি থাকবে। আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) সেদিন তাঁর খাঁটি উন্মাতগণকে হাউজে কাউছার থেকে পানি পান করবেন। পাপীরা সেদিন ত্রুণায় নিদারণ কষ্ট ভোগ করবে।

বস্তুত পুণ্যবানগণ হাশরের ময়দানে নানাবিধ সুবিধাজনক স্থান লাভে ধন্য হবেন। পক্ষান্তরে পাপীরা হাশরের ময়দানেই কঠোর শাস্তি ভোগ করবে।

ঙ. মিয়ান (الْمِيَانُ)

মিয়ান অর্থ পরিমাপক যন্ত্র বা দাঁড়িগালা। হাশরের ময়দানে মানুষের আমলসমূহ ওজন করার জন্য আল্লাহর তায়ালা যে পাল্লা প্রতিষ্ঠা করবেন তাকে মিয়ান বলা হয়। আল্লাহর তায়ালা বলেন—

وَنَصْعَدُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَلِيَّةَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ

অর্থ : আর আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব (সূরা আল-আবিয়া, আয়াত ৪৭)।

মিয়ানের পাল্লায় মানুষের পাপ পুণ্য ওজন করা হবে। যার পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে সে জাহানাতে প্রবেশ করবে। আর যার পাপের পাল্লা ভারী হবে সে হবে জাহানানি।

চ. সিরাত (الصِّرَاطُ)

সিরাত এর শাব্দিক অর্থ পথ, রাস্তা, পুল, সেতু ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের ভাষায় সিরাত হলো হাশরের ময়দান হতে জাহানাতে পর্যন্ত জাহানামের উপর দিয়ে চলমান একটি উড়াল সেতু। (তিরমিয়ি)। এ সেতু পার হয়ে নেক আমলকারী বান্দা জাহানাতে প্রবেশ করবেন। আখিরাতে সকল মানুষকেই এ সেতুতে আরোহণ করে তা অতিক্রম করতে হবে। সিরাত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহর বলেন, “এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে, এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।” (সূরা মারহিয়াম, আয়াত ৭১)

এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন, **يُؤَضِّحُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهَرٍ وَجَهَنَّمَ**

অর্থ : জাহানামের উপর সিরাত স্থাপিত হবে (মুসনাদে আহমাদ)।

নেক আমলকারী বান্দাগণকে মহান আল্লাহ জাহানে যাওয়ার অনুমতি দেবেন। জাহানাতিগণ সিরাতের উপর দিয়ে জাহানাতে প্রবেশ করবেন। নেককারদের জন্য তাঁদের আমল অনুসারে সিরাত প্রশস্ত হবে। ইমানদারগণ নিজ নিজ আমল অনুযায়ী সিরাত অতিক্রম করবেন। কেউ বিদ্যুৎগতিতে, কেউ ঝড়ের গতিতে, কেউ ঘোড়ার গতিতে, কেউবা দৌড়ের গতিতে, কেউ হেঁটে হেঁটে আবার কেউ কেউ হামাঞ্জড়ি দিয়ে সিরাত পার হবেন।

সিরাত হলো অন্ধকার পুল। সেখানে মুমিন ও নেক আমলকারী ব্যক্তির জন্য আলোর ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু যারা ইমানদার নয় এবং পাপী তাদের জন্য কোনো আলোর ব্যবস্থা থাকবে না। সুতরাং দুনিয়ায় যে দৃঢ় ইমান ও বেশি নেক আমলের অধিকারী সিরাত তাঁর জন্য সবচেয়ে বেশি আলোকিত হবে। ইমানের আলোতে সে সহজেই সিরাত অতিক্রম করবে।

অন্যদিকে যারা ইমানদার নয় এবং পাপী মহান আল্লাহ তাদের জাহানামে যাওয়ার নির্দেশ দেবেন। জাহানামদের জন্য সিরাত অত্যন্ত ভয়াবহ স্থান। তাদের জন্য সিরাত হবে চুলের চাইতেও সূক্ষ্ম এবং তরবারি অপেক্ষা ধারালো। এ অবস্থায় সিরাতে আরোহণ করে তারা কিছুতেই তা অতিক্রম করতে পারবে না। বরং তারা কর্ণভাবে জাহানামে পতিত হবে।

অতএব, আমরা সিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করব। সহজে সিরাত অতিক্রম করার জন্য প্রকৃত ইমানদার হব এবং সকল প্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ বর্জন করে অধিক পরিমাণে নেক আমল করব। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী দৈনন্দিন জীবন পরিচালনা করব।

ছ. শাফাআত (*الشفاعة*)

শাফাআত শব্দের অর্থ সুপারিশ করা, অনুরোধ করা ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় কল্যাণ ও ক্ষমার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট নবি-রাসূল ও নেক বান্দাগণের সুপারিশ করাকে শাফাআত বলে।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা মানুষের সকল কাজকর্মের হিসাব নেবেন। তারপর আমল অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য জাহান বা জাহানাম নির্ধারণ করবেন। তখন মহান আল্লাহ পুণ্যবানগণকে জাহানে ও পাপীদের জাহানামে যাওয়ার নির্দেশ দেবেন। নবি-রাসূল ও পুণ্যবান বান্দাগণ এ সময় আল্লাহর দরবারে শাফাআত করবেন। ফলে অনেক পাপীকে মাফ করা হবে। এরপর তাদেরকে জাহানাম থেকে জাহানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।

আবার অনেক পুণ্যবানের জন্যও এদিন শাফাআত করা হবে। ফলে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে।

কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে এক বিশাল ময়দানে সমবেত করা হবে। সেদিন সূর্য খুব নিকটবর্তী হবে। মানুষ অসহমৌয় দুঃখ-কষ্টে নিপত্তি থাকবে। এ সময় তারা হ্যরত আদম (আ.), হ্যরত নূহ (আ.), হ্যরত ইবরাহিম (আ.), হ্যরত মুসা (আ.) ও হ্যরত সিসা (আ.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে হিসাব-নিকাশ শুরু করার জন্য আল্লাহর নিকট শাফাআত করতে অনুরোধ করবে। তাঁরা সকলেই অপারগতা প্রকাশ করবেন। এ অবস্থায় সকল মানুষ মহানবি (স.)-এর নিকট উপস্থিত হবে। তখন মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপারিশ করবেন।

অন্যদিকে কিয়ামতের দিন পাপীদের ক্ষমা ও পুণ্যবানদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শাফাআত করা হবে। নবি-রাসূল, ফেরেশতা, শহিদ, আলেম, হাফিয এ শাফাআতের সুযোগ পাবেন। আল-কুরআন ও সিয়াম (রোয়া) কিয়ামতের দিন শাফাআত করবে বলেও হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিয়ামতের দিন নবি-রাসূল ও নেক বান্দাগণ আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন। আল্লাহ তায়ালা এসব শাফাআত করবেন এবং বহু মানুষকে জাহান দান করবেন। তবে শাফাআতের সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা থাকবে আমাদের প্রিয়নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর অধিকারে। তিনি নিজেই বলেছেন- **أَعْطِيَتِ الْشُفَاعَةُ**

অর্থ : আমাকে শাফাআত (করার অধিকার) দেওয়া হয়েছে (বুখারি, মুসলিম)।

অন্য একটি হাদিসে রাসুল (স.) বলেছেন, “পৃথিবীতে যত ইট ও পাথর আছে, আমি তার চেয়েও বেশি লোকের জন্য কিয়ামতের দিন শাফাআত করব” (মুসনাদে আহমাদ)।

শাফাআত একটি বিরাট নিয়ামত। মহানবি (স.)-এর শাফাআত ব্যতীত কিয়ামতের দিন সফলতা, কল্যাণ ও জাহাত লাভ করা সম্ভব হবে না।

অতএব, আমরা শাফাআতে বিশ্বাস স্থাপন করব। আল্লাহ ও তার রাসুল (স.)-কে ভালোবাসব। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.)-এর আদেশ-নিমেধ অনুযায়ী আমাদের জীবন পরিচালনা করব। তাহলে পরকালে আমরা প্রিয়নবি (স.)-এর শাফাআত লাভে ধন্য হয়ে জাহাতে প্রবেশ করতে পারব।

জ. জাহাত (جہات)

জাহাত অর্থ উদ্যান, বাগান, সুশোভিত কানন। ইসলামি পরিভাষায় পরকালীন জীবনে পুণ্যবানগণের জন্য পূরক্ষার স্বরূপ যে আরামদায়ক স্থান তৈরি করে রাখা হয়েছে তাকে বলা হয় জাহাত।

জাহাতে সবধরনের নিয়ামত বিদ্যমান। মুমিনগণ সেখানে চিরকাল অবস্থান করবেন। তাঁরা সেখানে তাঁদের পুণ্যবান মাতা-পিতা, জ্ঞানী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মিলিত হবেন। তাঁরা যা চাইবেন তাই সাথে সাথে লাভ করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “সেখানে (জাহাতে) তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েশ কর। এটি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়ন” (সূরা হা-মিম আস-সাজদা, আয়াত ৩১-৩২)।

বস্তুত জাহাতের সূর্খ-শান্তি ও নিয়ামত অফুরন্ত। এর বর্ণনা শেষ করা যায় না। একটি হাদিসে কুদসিতে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, “আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য (জাহাতে) এমন সব নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান কোনোদিন তা শুনেনি এবং কোনো মানব হৃদয় কখনো কল্পনাও করতে পারেনি” (বুখারি)।

আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্য আটটি জাহাত তৈরি করে রেখেছেন। এগুলো হলো- (১) জাহাতুল ফিরদাউস, (২) দারুল মাকাম, (৩) দারুল কারার, (৪) দারুস্সালাম, (৫) জাহাতুল মাওয়া, (৬) জাহাতুল আদন, (৭) দারুল নাইম ও (৮) দারুল খুলদ।

জাহাত চরম সুখের আবাস। দুনিয়াতে যারা ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করে চলবে তারা পরকালে জাহাত লাভ করবে। সকল কাজকর্মে আল্লাহ তায়ালার আদেশ ও রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করলে জাহাত লাভ করা সম্ভব হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَامَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى فَإِنَّ أَجْنَةَ هُنَّ الْمَأْوَى

অর্থ : আর যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে জাহাতই হবে তার আবাস (সূরা আন-নাফিআত, আয়াত ৪০-৪১)।

সুতরাং আমরা ও জাহান্নাত লাভের জন্য সদা সর্বদা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করব, তার আদেশ নিষেধ মেনে চলব, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করে উত্তম চরিত্র গঠন করব। তাহলে মহান আল্লাহ আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন, আমরা পরকালে জাহান্নাত লাভ করব।

৩. জাহান্নাম (جَهَنَّمْ)

জাহান্নাম হলো শান্তির স্থান। পরকালে মুমিনগণের জন্য যেমন জাহান্নাতের ব্যবস্থা রয়েছে তেমনি পাপীদের জন্য রয়েছে শান্তির স্থান। আর জাহান্নামই হলো সে শান্তির জায়গা। জাহান্নামকে ‘’ট্ৰি’’ (নার) বা আগুনও বলা হয়।

জাহান্নাম চির শান্তির স্থান। এর শান্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। মানুষের পাপের পরিমাণ অনুসারে শান্তির পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। জাহান্নামের আগুন অত্যন্ত উত্তম। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন—

تَأْكُرْ كُحْ جُزٌّ مِّنْ سَبْعِينَ جُزًّا مِّنْ تَأْكُرْ جَهَنَّمْ

অর্থ : তোমাদের এ পৃথিবীর আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্ত্বর ভাগের এক ভাগ মাত্র (বুখারি)।

এ আগুনে মানুষের হাড়, চামড়া, গোশত সবকিছুই পুড়ে যাবে। কিন্তু তাতে তার মৃত্যু হবে না। বরং আল্লাহ তায়ালাকের নির্দেশে পুনরায় তার দেহ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে। পুনরায় তা পুড়ে দক্ষ হবে। এভাবে পুনঃপুন চলতে থাকবে।

জাহান্নাম বিষাক্ত সাপ, বিচুর আবাসস্থল। সেখানকার খাদ্য হলো বড় বড় কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ। উত্তম রক্ত ও পুঁজ হবে জাহান্নামদের পানীয়। মোটকথা জাহান্নাম অতি যন্ত্রণাদায়ক স্থান। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “যারা কুফর করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে ফুট্ট পানি, ফলে তাতে তাদের গেটে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলত হয়ে যাবে, আর তাদের জন্য থাকবে লোহার হাতুড়ি। যখনই তারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আর তাদের বলা হবে, আস্তাদেন কর দহন-যন্ত্রণা।” (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত ১৯-২২)

পাপীদের শান্তিদানের জন্য আল্লাহ তায়ালা ৭টি দোষখ তৈরি করে রেখেছেন। এগুলো হলো- (১) জাহান্নাম, (২) হাবিয়া, (৩) জাহিম, (৪) সাকার, (৫) সাইর, (৬) হতামাহ এবং (৭) লায়া।

জাহান্নাম হলো ভীষণ শান্তির স্থান। কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকরা তথায় চিরকাল শান্তি ভোগ করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فَمَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَأَثْرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝ فَإِنَّ الْجَنَّمَ هِيَ الْمُأْوَىٰ ۝

অর্থ : অনন্তর যে সীমালঞ্চন করে এবং দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয় জাহান্নামই হবে তার আবাস (সূরা আন- নাফিঅত, আয়াত ৩৭-৩৯)।

যাদের ইমান রয়েছে কিন্তু পাপের পরিমাণ বেশি এমন মুমিনরাও জাহান্নামের শান্তি ভোগ করবে। তবে তাদের পাপের শান্তি শেষ হওয়ার পর তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।

আমরা সব রকম পাপ থেকে মুক্তি থাকব। খাটি ইমানদার হব। আল্লাহ ও তার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আনুগত্য করব। তাহলেই জাহান্নামের আগুন ও শান্তি থেকে আমরা রেহাই পাব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জাহান লাভের জন্য তাদের যেসব বিশ্বাস ও কাজ পরিবর্তন করতে হবে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করবে।

পাঠ ১৫

সৎ ও নৈতিকজীবন গঠনে আধিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা

আধিরাত হলো পরকাল। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আধিরাত বলা হয়। আধিরাত হলো মানুষের অনন্ত জীবন। এটি চিরহ্যায়ী। পক্ষান্তরে দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। বস্তুত দুনিয়ার জীবন হলো আধিরাতের প্রত্তি গ্রহণের ক্ষেত্র। বলা হয়েছে দুনিয়া: আধিরাতের শস্যক্ষেত্র (আরবি প্রবাদ)।

মানুষ শস্যক্ষেত্রে যেরূপ চাষাবাদ করে, বীজ বপন করে, যেভাবে পরিচর্যা করে; ঠিক সেরূপই ফল লাভ করে। যদি কোনো ব্যক্তি তার শস্যক্ষেত্রে পরিচর্যা না করে তবে সে ভালো ফসল লাভ করে না। তদ্রপ দুনিয়ার কাজকর্মের প্রতিদান আধিরাতে দেওয়া হবে। দুনিয়াতে ভালো কাজ করলে আধিরাতে মানুষ পুরস্কৃত হবে। আর মন্দ কাজ করলে শান্তি ভোগ করবে।

কবর, হাশর, মিয়ান, সিরাত, জাহান-জাহান্নাম ইত্যাদি আধিরাত জীবনের এক একটি পর্যায়। ইসলামি বিশ্বাস মৌতাবেক, যে ব্যক্তি ইমান আনে, সংকর্ম করে সে আধিরাতে শান্তিময় জীবন লাভ করবে। কবর থেকে শুরু করে আধিরাতের প্রতিটি পর্যায়ে সে সুখ, শান্তি ও সফলতা লাভ করবে। অন্যদিকে দুনিয়াতে যে ব্যক্তি অবাধ্য হবে, পাপাচার করবে সে আধিরাতের সকল পর্যায়ে কষ্ট ভোগ করবে। তার হাত হবে জাহান্নাম।

মানবজীবন গঠনের জন্য আধিরাতে বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আধিরাতে বিশ্বাস মানুষকে জীবন পরিচালনায় নীতি ও আদর্শের অনুসরণ করতে বাধ্য করে। যে ব্যক্তি আধিরাতে বিশ্বাস করে সে প্রত্যহ তার প্রতিটি কাজের হিসাব নিজেই নিয়ে থাকে। এভাবে দৈনন্দিন আত্মসমালোচনার মাধ্যমে মানুষ তার ভুল-ক্রটি শুধরে সচ্চরিত্বান হিসেবে গড়ে উঠে।

আখিরাতে পুণ্যবানকে জাহাতে প্রবিষ্ট করানো হবে। জাহাত হলো চিরশাস্তির স্থান। জাহাত লাভের আশা মানুষকে দুনিয়ার জীবনে সৎকর্মশীল করে তোলে। মানুষ জাহাত ও তার নিয়ামত প্রাপ্তির আশায় নেক আমল করে, ভালো কাজ করতে উৎসাহিত হয়। কেননা আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস, ভালোবাসা ও সৎকর্ম ব্যতীত জাহাত লাভ করা যায় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَاحٌ كُلُّهُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَمْرُ هُوَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ

অর্থ : নিচয়ই যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে জাহাত যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। এটাই মহাসাফল্য (সূরা আল-বুরজ, আয়াত ১১)।

এভাবে পরকালীন জীবনে জাহাত লাভের আশা মানুষকে সৎকর্মশীল হতে সাহায্য করে।

জাহান্নাম অতি কঠোর স্থান। এতে রয়েছে সাপ, বিচু ও আগুনের যত্নগাদায়ক শাস্তি। দুনিয়ার জীবনের পাপী, অবাধ্য ও মন্দ আচরণের লোকদের পরকালে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فَمَمَّا مَنَّ طَغَىٰ وَأَثْرَ أَخْيُوَةَ الدُّنْيَاٰ فِيَنَّ الْجَنَّمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

অর্থ : অনন্তর যে সীমালঞ্চন করে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয় জাহান্নামই হবে তার আবাস (সূরা আল- নাফিআত, আয়াত ৩৭-৩৯)।

জাহান্নামের শাস্তির ভয়ও মানুষকে অন্যায় ও পাপ থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করে। দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার আদেশ না মানা, পার্থিব লোভ লালসার বশবর্তী হয়ে অন্যায় অনৈতিক কাজ করা ইত্যাদি জাহান্নামদের কাজ। সুতরাং জাহান্নামের ভয়ে মানুষ এসব কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে।

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে বড় বড় অন্যায় এবং অনৈতিক কাজের পাশাপাশি ছোট ছোট পাপ ও অসৎ কাজ থেকেও বিরত রাখে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

অর্থ : অতঃপর কেউ অগু পরিমাণ সৎকর্ম করলেও তা সে দেখতে পাবে। আর কেউ অগু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখবে (সূরা আল-যিলায়াল, আয়াত ৭-৮)।

আল্লাহ তায়ালা পরকালে মানুষের সামান্যতম ভালো বা মন্দ কাজ সবই প্রদর্শন করবেন। অতঃপর এগুলোর পুরস্কার বা শান্তি দেওয়া হবে। সুতরাং আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে ছোট-বড়, প্রকাশ্য-অথকাশ্য সব ধরনের অন্যায় থেকে বিরত রাখে এবং পাপমুক্ত, সৎকর্মশীল ও নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বৃদ্ধ করে।

আমরা আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস হ্রাপন করব এবং এ বিশ্বাসের আলোকে ইহকালে আমাদের জীবনকে পাপমুক্ত রাখব, সৎকর্মশীল হব এবং নৈতিক জীবনযাপনে অভ্যন্ত হব।

কাজ : আখিরাতে বিশ্বাস না করার ফলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে কী প্রভাব ফেলে- শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে একটি ভালিকা তৈরি করবে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি

১. ইমানের সর্বপ্রধান বিষয় কোনটি?

- ক. তাকদিরে বিশ্বাস
- খ. আখিরাতে বিশ্বাস
- গ. রিসালাতে বিশ্বাস
- ঘ. তাওহিদে বিশ্বাস

২. আসমানি কিতাবে বিশ্বাস -

- i. সমাজে সম্মান অর্জনে সহায়ক
- ii. মহানবি (স.)- এর আদর্শ অনুসরণে সহায়ক
- iii. মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

নিচের উন্নীপুক্তি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

জনাব 'ক' ও 'খ' দুইজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। চার বছর আগে জনাব 'ক' বিয়ে করে। বাচ্চা না হবার জন্য তার স্ত্রীকে শুশ্রে বাড়িতে অনেক কটুকথা শুনতে হয়। তাই 'ক' স্ত্রীসহ সন্তান লাভের আশায় এক কথিত পীরের কাছে সিন্নি মানত করে। অন্যদিকে জনাব 'খ'-এর দুটি দোকান আগুনে পুড়ে গেলে সে ব্যবসায়িক ক্ষতির সন্তুষ্টীন হয়। বিপদ থেকে রক্ষা পেতে 'ক' তাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে আল্লাহর সাহায্য চাইতে বলেন। উত্তরে 'খ' বলেন ব্যবসায় উন্নতির জন্য কারো নিকট দোয়া বা সাহায্যের প্রয়োজন নেই। আমি নিজেই আমার ব্যবসা দাঁড় করাব।

৩. 'ক' দম্পতির কাজে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে ?

- ক. কুফর
- খ. শিরক
- গ. নিফাক
- ঘ. ফিতনা

৪. 'খ' কর্মকাণ্ডে আকাইদের যে বিষয়টি প্রতিফলিত হয়, তার পরিণামে

- i. সে সমাজে অপমানিত হবে
- ii. সামাজিক অনাচার বৃদ্ধি পাবে
- iii. জাহানামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

(১)

দৃশ্যপট-১ : জনাব 'ক' একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। সে বিভিন্ন মসলার সাথে ইটের গুড়া এবং চালের সাথে কংকর মিশিয়ে বিক্রি করে। তার দোকান থেকে এক কেজি ওজনের কোনো দ্রব্য কিনে নিয়ে বাড়িতে নিয়ে মাপলে নয়শত গ্রাম পাওয়া যায়। পরবর্তীতে এলাকাবাসী তার দোকান বন্ধ করে দেয়।

দৃশ্যপট-২ : জনাব 'খ' একটি কথিত মাজারে যান এবং সেখানে সিজদা করেন। মাঝে মাঝে তিনি নামাযও পড়েন। এক বন্দুর পরামর্শে জনাব 'খ' সুরা ইখলাস ব্যাখ্যাসহ বাংলা অনুবাদ পড়েন। পরবর্তীতে জনাব 'খ' কথিত মাজারে যাওয়া বন্ধ করে দেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে আদায় শুরু করেন।

দৃশ্যপট-৩ : রাফিদ এর বাবা জীবিকার তাগিদে সৌদি আরব থাকেন। তাই প্রতি মাসেই ডাকপিয়ন তাদের বাসায় বাবার চিঠি নিয়ে আসেন। ডাকপিয়নের কার্যক্রম দেখে রাফিদ বলেন, যুগে যুগে মানুষের কল্যাণের জন্য বার্তা নিয়ে মহামানবরা পৃথিবীতে এসেছেন। তাঁরা মানুষকে সত্য ও সুন্দর জীবনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার বিধিবিধান মানুষকে হাতে কলমে শিখিয়েছেন।

- ক. আসমানি কিতাব কী ?
- খ. ইমান ও ইসলাম একটি অপরটির পরিপূরক। ব্যাখ্যা কর।
- গ. দৃশ্যপট-১ 'ক' এর কর্মকাণ্ডে আকাইদ ও নেতৃত্ব জীবনের পরিপন্থী কোন বিষয়টি ফুটে হয়েছে ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. দৃশ্যপট-২-এ জনাব 'খ' পরিবর্তিত জীবন ও দৃশ্যপট-৩ এ আকাইদের যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে তা চিহ্নিত করে মানুষের নেতৃত্ব জীবন গঠনে উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কি? উভরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. 'নিচয়ই আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত দীন।' ব্যাখ্যা কর।
২. 'ইসলাম যদি হয় দেহ, তবে ইমান তার আত্মা' ব্যাখ্যা কর।
৩. আল্লাহ তায়ালার পরিচয় জানা জরুরি কেন?
৪. 'কুফর সমাজে অনেকিক্তার প্রসার ঘটায়।' ব্যাখ্যা কর।
৫. খতমে নবুয়াতে বিশ্বাস করা অত্যাবশ্যক কেন?
৬. 'আর তারা (মুন্তাকিগণ) আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।' ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামি শরিয়তের উৎস (مَصْدُرُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ)

ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এটি সর্বজনীন ও সর্বকালীন বিধি-বিধানের সমষ্টি। বিশ্বাসগত বিষয়গুলোর পাশাপাশি মানবজীবনের আচরণগত সমস্ত দিকও ইসলামে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মানবজীবনের সার্বিক কল্যাণের জন্য নানা বিধি-বিধান ও আচার-আচরণগত দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। মহান আল্লাহ প্রদত্ত এসব বিধি-বিধানকেই শরিয়ত বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা ও মহানবি হয়রত মুহাম্মদ (স.)-এর আদেশ-নির্দেশ মেনে চলা, সকল কাজে তাঁদের আনুগত্য করা, শরিয়তের অন্যতম দাবি। এগুলোর পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের মাধ্যমে দুনিয়া ও আধিরাতের সার্বিক সফলতা লাভ করা যায়। এ অধ্যায়ে আমরা ইসলামি শরিয়তের পরিচয় ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানব। পাশাপাশি শরিয়তের উৎসগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- শরিয়ত ও শরিয়তের উৎসের ধারণা এবং প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব;
- কুরআন ও হাদিসের সংরক্ষণ ও সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করতে পারব;
- মাক্কি ও মাদানি সুরার সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব;
- কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারব;
- নির্বাচিত সূরাগুলো শুন্দরভাবে মুখ্য বলতে পারব;
- নির্বাচিত সূরাগুলোর অর্থ ও পটভূমিসহ (শানে নুযুল) শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব;
- কুরআনের নির্বাচিত সূরাগুলোর শিক্ষা নিজ জীবনে প্রয়োগে উদ্বৃদ্ধ হব;
- নির্বাচিত দশটি হাদিসের অর্থ ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব;
- ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অর্জনের ক্ষেত্রে হাদিসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নির্বাচিত হাদিসসমূহের শিক্ষার আলোকে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পর্ক জীবন গঠনে অনুপ্রাণিত হব;
- ইজমা এর পরিচয় ও উৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- কিয়াস এর ধরন বর্ণনা করতে পারব;
- শরিয়তের বিভিন্ন পরিভাষা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারব।

পাঠ ১

শরিয়ত (الشَّرِيعَةُ)

পরিচয়

শরিয়ত আরবি শব্দ। এর অর্থ পথ, রাস্তা। এটি জীবনপদ্ধতি, আইন-কানুন, বিধি-বিধান অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে শরিয়ত হলো এমন সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট পথ, যা অনুসরণ করলে মানুষ সুস্থি ও সুন্দরভাবে নিজ

গন্তব্যে পৌছতে পারে। ইসলামি পরিভাষায়, ইসলামি কার্যনীতি বা জীবনপদ্ধতিকে শরিয়ত বলা হয়। অন্যকথায়, ইসলামি আইন-কানুন বা বিধি-বিধানকে একত্রে শরিয়ত বলা হয়। অর্থাৎ মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) যেসব আদেশ-নিষেধ ও পথনির্দেশনা মানুষকে জীবন পরিচালনার জন্য প্রদান করেছেন তাকে শরিয়ত বলে।

শরিয়ত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

○ نُّمْ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّن الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থ : অতঃপর আমি আপনাকে শরিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং আপনি তার অনুসরণ করুন। আর আপনি অজ্ঞদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবেন না (সূরা আল-জাসিয়া, আয়াত ১৮)।

শরিয়তের বিষয়বস্তু ও পরিধি

শরিয়তের বিষয়বস্তু ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। এটি হলো মানবজাতির জন্য সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানব জীবনের সকল বিষয়ের বিধি-বিধান ও নির্দেশনা এতে বিদ্যমান। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

الْيَوْمَ أَكْبَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا

অর্থ : আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করলাম (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৩)।

সুতরাং বোঝা গেল যে, ইসলামি শরিয়তের বিষয়বস্তু ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। মুসলিম মনীষীগণ শরিয়তের বিষয়বস্তুকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

ক. আকিদা বা বিশ্বাসগত বিধি-বিধান।

খ. নৈতিকতা ও চরিত্র সংক্রান্ত রীতি-নীতি।

গ. বাস্তব কাজকর্ম সংক্রান্ত নিয়মকানুন।

বস্তুত মানুষের সবধরনের আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা উপরিউভ তিনটি বিষয়ের আওতাভুক্ত। ফলে মানুষের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় সকল কাজই শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত। শরিয়তের নির্দেশনার বাইরে কোনো কাজই নেই।

শরিয়তের গুরুত্ব

মানবজীবনে শরিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম। শরিয়ত হলো মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রদত্ত আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান। সুতরাং শরিয়ত মেনে চললে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল খুশি হন। অন্যদিকে, শরিয়ত অঙ্গীকার করা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলকে অঙ্গীকার করার নামাত্মর। কোনো মুসলমান একেপ কাজ করতে পারে না। এমনকি শরিয়তের এক অংশ পালন করা আর অন্য অংশ অঙ্গীকার করাও মারাত্মক

পাপ (কুফর)। যে ব্যক্তি একুপ করে তার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর, আর কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান কর? তোমাদের যারা একুপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল হলো পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। আর কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিষ্কিঞ্চ হবে” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৮৫)।

শরিয়ত হলো জীবন পরিচালনার দিকনির্দেশনা। এর দ্বারা জীবনের নানা ক্ষেত্রে ইসলামি বিধি-নিষেধ জানা যায়।

কোনটি হালাল, কোনটি হারাম ইত্যাদি জানা যায়। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞানও শরিয়তের শিক্ষার মাধ্যমেই লাভ করা যায়। উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতার নানা শিক্ষাও শরিয়তে বিবৃত রয়েছে। সুতরাং সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনার জন্য শরিয়ত অপরিহার্য।

তাছাড়া শরিয়ত আমাদের ইবাদতের পদ্ধতি ও নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেয়। সালাত, যাকাত, সাওম, হজ ইত্যাদি কীভাবে, কোথায়, কোন সময়ে আদায় করতে হয় তাও শরিয়তের বর্ণনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। আত্মিক পরিশুল্কি অর্জনের উপায়, পারিবারিক ও সামাজিক সম্প্রীতি ইত্যাদিও শরিয়তের আওতাভুক্ত। অতএব, মানুষের সার্বিক জীবনাচরণে শরিয়তের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শরিয়তের উৎসসমূহ

শরিয়ত হলো ইসলামি জীবনপদ্ধতি। এটি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ ও দিকনির্দেশনার সমষ্টি। অতএব, শরিয়ত এর প্রধান উৎস দুটি। যথা- আল-কুরআন ও আল-হাদিস বা সুন্নাহ।

প্রবর্তীতে কুরআন ও সুন্নাহ এর স্থীরতি ও নির্দেশনার ভিত্তিতে শরিয়তের আরও দুটি উৎস নির্ধারণ করা হয়। এগুলো হলো ইজমা ও কিয়াস। সুতরাং আমরা বলতে পারি- শরিয়ত এর উৎস চারটি। যথা-

১. আল-কুরআন (*الْقُرْآن*)

২. সুন্নাহ (*السُّنَّة*)

৩. ইজমা (*الْإِجْمَاعُ*)

৪. কিয়াস (*الْقِيَاسُ*)

আমরা পর্যায়ক্রমে শরিয়তের এ চারটি উৎস সম্পর্কে জানব।

কাজ : ইসলামি শরিয়ত কেন প্রয়োজন? এতে কী কী কল্যাণ আছে? শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে একটি পরিচেদ রচনা করবে।

পাঠ ২

শরিয়তের প্রথম উৎস : আল-কুরআন (الْمُصَدْرُ الْأَوَّلُ لِلشَّرِيعَةِ: الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ)

শরিয়তের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উৎস হলো আল-কুরআন। ইসলামি শরিয়তের সকল বিধি-বিধানের মূল উৎসই আল- কুরআন। এর উপরই ইসলামি শরিয়তের ভিত্তি ও কাঠামো অতিষ্ঠিত। আল-কুরআন শরিয়তের অকাট্য ও প্রামাণ্য দলিল। মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের সমাধানসূচক মূলনীতি ও ইঙ্গিত আল-কুরআনে বিদ্যমান। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

অর্থ : আর আমি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ (সূরা আন-নাহল, আয়াত : ৮৯)।

আল-কুরআন আল্লাহ তায়ালার পরিত্র বাণী। এটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। আল্লাহ তায়ালা হ্যরত জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর এ কিতাব নাজিল করেন। এ কিতাব আরবি ভাষায় নাজিলকৃত। ইসলামি শরিয়তের প্রধান উৎস হিসেবে আল-কুরআনে মানবজাতির জীবন পরিচালনার সুস্পষ্ট মূলনীতি ও নির্দেশনা বিদ্যমান। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَقَدْ حَرَفْنَا لِلّئَاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

অর্থ : আর অবশ্যই আমি মানুষের জন্য এ কুরআনে বিভিন্ন উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৮৯)।

কুরআন মজিদ সহজ ও সাবলীল ভাষায় নাজিলকৃত। এতে কোনোরূপ অস্পষ্টতা, বক্রতা, কিংবা জটিলতা নেই। বরং এতে খুবই সুন্দর ও সরল ভাষায় নানা বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে। অতি সাধারণ মানুষও এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَإِنَّمَا يَسِّرُنَا بِإِلْسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

অর্থ : আর আমি তো কুরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে (সূরা আদ-দুখান, আয়াত ৫৮)।

অবতরণ

আল-কুরআন আল্লাহ তায়ালার কালাম। এটি 'লাওহে মাহফুজ' বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ حَفَظٌ

অর্থ : বস্তুত এটি সম্মানিত কুরআন। সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ (সূরা আল-বুরজ, আয়াত ২১-২২)।

আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম কদরের রাতে গোটা কুরআন মজিদ লাওহে মাহফুজ থেকে ‘বায়তুল ইয়াহ’ নামক স্থানে নাজিল করেন। বায়তুল ইয়াহ হলো প্রথম আসমানের একটি বিশেষ স্থান।

মহানবি (স.) হেরো গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় মহান আল্লাহর নির্দেশে জিবরাইল (আ.) আল-কুরআনের সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নিয়ে তথায় মহানবি (স.)-এর নিকট অবতরণ করেন। এটাই ছিল দুনিয়াতে আল-কুরআনের প্রথম নাজিলের ঘটনা। এরপর বিভিন্ন সময় ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মহানবি (স.)-এর প্রতি কুরআন নাজিল হয়।

এভাবে মহানবি (স.)-এর জীবদ্ধায় মোট ২৩ বছরে সম্পূর্ণ কুরআন নাজিল হয়। এটি একসাথে নাজিল হয়নি। বরং অল্প অল্প করে প্রয়োজনানুসারে নাজিল হতো। কখনো ৫ আয়াত, কখনো ১০ আয়াত, কখনো আয়াতের অংশবিশেষ, আবার কখনো একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা একসাথে নাজিল হতো। আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেন-

وَقُرْآنًا فَرِقْنَا لِتَقْرَأَهُ عَلَىٰ مُكْثٍ وَّنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

অর্থ : আর আমি খণ্ড-খণ্ডভাবে কুরআন নাজিল করেছি যাতে আপনি তা মানুষের নিকট ক্রমে ক্রমে পাঠ করতে পারেন আর আমি তা ক্রমশ নাজিল করেছি (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ১০৬)।

অন্যান্য আসমানি কিতাবের ন্যায় আল-কুরআন একসাথে নাজিল করা হয়নি। তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ইত্যাদি একসাথে পূর্ণাঙ্গ আকারে নাজিল করা হয়েছিল। কিন্তু আল-কুরআন এর ব্যতিক্রম। এটি আল-কুরআনের বিশেষ মর্যাদার পরিচায়ক। মক্কার কাফিররা এ সম্পর্কে রাসূল (স.)-কে প্রশ্ন করলে আল্লাহ তায়ালা বলেন, “কাফিররা বলে, তাঁর উপর সমগ্র কুরআন একবারে অবতীর্ণ হলো না কেন? আমি এভাবেই অবতীর্ণ করেছি আপনার হৃদয়কে তার দ্বারা মজবুত করার জন্য এবং আমি তা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি” (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত ৩২)।

আল-কুরআন আল্লাহ তায়ালার বাণী। জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা অল্প অল্প করে মহানবি (স.)-এর ২৩ বছরের নবুওয়াতি জীবনে পূর্ণরূপে নাজিল করেন।

কাজ : কুরআন একত্রে নাজিল হলে কী হতো, শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৩

আল-কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলন

(حفظُ القرآنِ الْكَرِيمِ وَجَمْعُهُ)

আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের সার্বিক জীবনবিধান ও দিকনির্দেশনা এতে বিদ্যমান। সুতরাং এর সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহান আল্লাহ স্বয়ং এর সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করেছেন। তিনি ঘোষণা করেন-

إِنَّمَا نَزَّلْنَا الِّذِي كُرِّرَ وَإِنَّمَا لَهُ حَفْظُونَ

অর্থ : আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই এর সংরক্ষক (সূরা আল-হিজর, আয়াত ৯)।

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং আল-কুরআনের সংরক্ষক। তিনি তাঁর অত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ কিতাব সংরক্ষণ করেন। এজন্যই আজ পর্যন্ত এ কিতাবের একটি হরফ (অক্ষর), হরকত বা নুকতারও পরিবর্তন হয়নি। এটি যেভাবে নাজিল হয়েছিল আজও ঠিক সেভাবেই বিদ্যমান। আর কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে।

আল-কুরআন সংরক্ষণ

আল-কুরআন আরব দেশে মহানবি (স.)-এর উপর নাজিল হয়। এ সময় মহানবি (স.) সাথে সাথে নাজিলকৃত আয়াত মুখস্থ করে নিতেন। এরপর বারবার তিলাওয়াতের মাধ্যমে তা স্মৃতিতে ধরে রাখতে চেষ্টা করতেন। আল-কুরআন মুখস্থকরণে রাসুল (স.)-এর দ্রুতপাঠ ও ব্যাকুলতা দেখে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সান্ত্বনা দেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لَا تُحِرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمِيعَهُ وَقُر'أَنَّهُ

অর্থ : তাড়াতড়ি ওহি আয়াত করার জন্য আপনি দ্রুত আপনার জিহ্বা তাঁর সাথে সঞ্চালন করবেন না। এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই (সুরা আল-কিয়ামাহ, আয়াত ১৬-১৭)।

এরপর রাসুলুল্লাহ (স.)-এর ব্যাকুলতা দূরীভূত হয় এবং তিনি সহজেই কুরআনের আয়াতগুলো মুখস্থ করে সংরক্ষণ করতে লাগলেন।

আল-কুরআন নাজিল হলে রাসুলুল্লাহ (স.) সাহাবিগণকেও তা মুখস্থ করতে বলতেন। সাহাবিগণ তা মুখস্থ করতেন, দিনরাত তিলাওয়াত করতেন, নামাযে পাঠ করতেন এবং পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-সন্তান ও বন্ধু-বন্ধবদেরও মুখস্থ করাতেন। গভীর রাতে তাঁদের ঘর থেকে কুরআন তিলাওয়াতের শুনগুল আওয়াজ শোনা যেত। অনেক সময় রাসুলুল্লাহ (স.) স্বয়ং তাঁদের গৃহপার্শ্বে গিয়ে তিলাওয়াত শুনতেন।

কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দেওয়ার জন্য নবি করিম (স.) সাহাবিগণকে নানা স্থানে প্রেরণ করতেন। যেমন হিজরতের পূর্বে তিনি হযরত মুসআব ইবনে উমায়ার (রা.) ও আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-কে কুরআন শিক্ষাদানের জন্য মদিনায় প্রেরণ করেন।

এভাবে মুখস্থ করার মাধ্যমে আল-কুরআন সর্বপ্রথম সংরক্ষণ করা হয়। উল্লেখ্য, তৎকালীন আরবদের স্মৃতিশক্তি ছিল খুবই তীক্ষ্ণ। তারা কোনো জিনিস শিখলে তা আর কখনো ভুলত না। ফলে এ অসাধারণ স্মরণশক্তির কারণে পরিত্র কুরআন সহজেই তাদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়।

এছাড়া সেসময় লিখিতভাবেও আল-কুরআন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। আরবদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লোকই ছিল শিক্ষিত। তা ছাড়া সেসময় লেখার উপকরণও ছিল দুর্লভ। এজন্য সেসময় আল-কুরআন একেত্রে গ্রাহকারে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়নি। তবে আল-কুরআনের কোনো অংশ বা আয়াত নাজিল হলে সাথে সাথেই লিখে রাখা হতো। খেজুর গাছের ডাল, পশুর চামড়া ও হাড়, পাথর, গাছের পাতা ইত্যাদি ছিল তখনকার লেখার উপকরণ। সাহাবিগণ এগুলোতেই আল-কুরআনের আয়াত লিখে তা সংরক্ষণ করতেন।

যেসব সাহাবি লেখাপড়া জানতেন তাঁরা প্রায় সকলেই কুরআন লিখার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। আল-কুরআন লিপিবদ্ধকারী সাহাবিগণকে বলা হয় কাতিবে ওহি বা ওহি লেখক। তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় মোট

৪২ জন। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.)। এছাড়াও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.), হযরত উমর ফারুক (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলি (রা.), হযরত মুআবিয়া (রা.), হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.), হযরত মুগিরা ইবনে শ'বা (রা.), হযরত আমর ইবনে আস (রা.), হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ (রা.) থমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এঁদের কেউ না কেউ সদা সর্বদা রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সঙ্গে থাকতেন এবং কুরআনের কোনো অংশ বা আয়াত নাজিল হলে সাথে সাথে তা লিখে নিতেন। এভাবে লেখার মাধ্যমে আল-কুরআনকে সংরক্ষণ করা হয়।

আল-কুরআন সংকলন

মহানবি (স.)-এর সময়ে আল-কুরআন মুখ্য ও লেখার মাধ্যমে পুরোপুরি সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু সে সময় তা একত্রে গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়নি। বরং তাঁর তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ টুকরোগুলো নানাজনের নিকট সংরক্ষিত ছিল। হযরত আবু বকর (রা.)-ই সর্বপ্রথম কুরআন সংকলনের উদ্যোগ নেন।

হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা। তাঁর সময়ে নবৃত্তের কতিপয় মিথ্যা দাবিদার বা ভগ্ন নবি ও যাকাত অস্তীকারকারীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এরপরই একটি যুদ্ধ ছিল ইয়ামামার যুদ্ধ। এটি মুসায়লিমা কায়বাব নামক ভঙ্গ নবির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। এ যুদ্ধে বহুসংখ্যক কুরআনের হাফিয় সাহাবি শাহাদাত বরণ করেন। এতে হযরত উমর (রা.) উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি ভাবলেন যে, এভাবে হাফিয় সাহাবিগণ শাহাদাত বরণ করতে থাকলে একসময় কুরআন মুখ্যস্থকারী লোকই খুজে পাওয়া যাবে না। ফলে কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দেবে। সুতরাং তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে কুরআন সংকলন করে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার পরামর্শ দান করেন। পরামর্শ শ্রবণে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে উমর! রাসুলুল্লাহ (স.) যে কাজ করে যাননি তা আপনি কীভাবে করতে চাচ্ছেন? হযরত উমর (রা.) বললেন, আল্লাহর শপথ! এতে কল্প্যাণ রয়েছে। এভাবে হযরত উমর (রা.) বারবার অনুরোধ করায় হযরত আবু বকর (রা.) কুরআন সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি প্রধান ওহি লেখক সাহাবি হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.)-কে এ গুরুত্বায়িত অর্পণ করেন। হযরত যায়দ (রা.) কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নিম্নোক্ত চারটি পন্থা অবলম্বন করেন:

ক. হাফিয় সাহাবিদের তিলাওয়াতের মাধ্যমে প্রতিটি আয়াতের বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতা যাচাইকরণ।

খ. হযরত উমর (রা.)-এর হিফয়ের সাথে মিলিয়ে আয়াতের বিশুদ্ধতা যাচাইকরণ।

গ. রাসুলুল্লাহ (স.)-এর উপস্থিতিতে লিখিত হওয়ার ব্যাপারে ন্যূনতম দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ।

ঘ. চূড়ান্তভাবে লিখিত আয়াতগুলো অন্যান্য সাহাবির সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির সাথে তুলনা ও যাচাইকরণ।

এভাবে চরম সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.) পরিত্র কুরআন সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে সংকলন করেন। এটাই ছিল সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ আল-কুরআন। কুরআনের এ কপিটি হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ইস্তিকালের পর এটি হযরত উমর (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত ছিল। হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদাতের পর পরিত্র কুরআনের এ পাণ্ডুলিপিটি তাঁর কন্যা, উম্মুল মুমিনিন হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল।

ত্রুটীয় খলিফা হয়রত উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে নানা মতানৈক্য দেখা দেয়। এর মূল কারণ ছিল বিভিন্ন গোত্রীয় রীতিতে কুরআন পাঠ। মহানবি (স.) সহজ করণার্থে আরবদের ৭টি রীতিতে কুরআন পাঠ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। আরবগণ এ ৭টি রীতিতে পাঠের বিষয়টি জানতেন বলে প্রথমদিকে কোনো অসুবিধা হয়নি। কিন্তু ইসলামি খেলাফতের ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে অন্যারবগণ মুসলমান হতে লাগল। তারা আরবি ভাষার এসব আঞ্চলিক রীতিসমূহ সম্পর্কে সচেতন ছিল না। ফলে ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে কুরআন পাঠে তাদের মধ্যে বিভাস্তির সৃষ্টি হয়। এমনই এক ঘটনা ঘটে আর্মেনিয়া-আজারবাইজান অঞ্চলে জিহাদের সময়। এ সময় ভিন্ন রীতিতে কুরআন পাঠে মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত ঘটে। হয়রত হ্যায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.) ঘটনাটি খলিফা হয়রত উসমান (রা.)-কে অবহিত করেন। এমতাবস্থায় হয়রত উসমান (রা.) প্রধান সাহাবিগণের পরামর্শক্রমে কুরআন সংকলনের জন্য চারজন সাহাবির একটি বোর্ড গঠন করেন। এরা ছিলেন হয়রত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.), আবুলুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.), সাইদ ইবনে আস (রা.) এবং আব্দুর রহমান ইবনে হারিস (রা.)। এ বোর্ডের নেতৃত্ব হয়রত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.) এর উপর ন্যস্ত করা হয়।

হয়রত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.) সর্বপ্রথম হয়রত হাফসা (রা.)-এর নিকট থেকে কুরআনের প্রথম পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে আসেন এবং এ থেকে আরও সাতটি কপি তৈরি করেন। অনুলিপি তৈরিতে সাহাবিগণ হাফিয়গণের কেরাতের সাথে মিলিয়ে পুনরায় এর নির্ভুলতা যাচাই করতেন। অতঃপর মূল কপিটি হয়রত হাফসার (রা.) নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তৈরি অনুলিপিগুলোর একটি খলিফার নিকট কেন্দ্র সংরক্ষণ করা হয় আর বাকিগুলো বিভিন্ন শাসনকেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ফলে আল-কুরআন বিকৃতি ও গরমিলের হাত থেকে রক্ষা পায়। এরপর বিক্ষিপ্তভাবে রক্ষিত কপিগুলো একত্র করে তা পুড়িয়ে বিনষ্ট করে ফেলা হয়। এভাবে হয়রত উসমান (রা.)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্ববধানে আল-কুরআন সংকলিত হয়। এ মহান কাজের জন্য তাঁকে 'জামিউল কুরআন' বা কুরআন একত্রিকারী (সংকলক) বলা হয়।

কুরআনের এ সংকলনসমূহে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর নির্দেশনার কোনোরূপ পরিবর্তন করা হয়নি। বরং রাসুলুল্লাহ (স.) যেভাবে কোন আয়াতের পর কোন আয়াত হবে বলে গেছেন সেভাবেই সংকলন করা হয়। এভাবে সূরাসমূহেও রাসুলুল্লাহ (স.) বর্ণিত ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সাজানো হয়। বস্তুত আল্লাহ তায়ালাই রাসুলুল্লাহ (স.)-কে একুশ ধারাবাহিকতা শিখা দিয়েছিলেন। জিবরাইল (আ.) যখনই কোনো আয়াত নিয়ে আসতেন তখনই ঐ আয়াত কোন সূরার কোথায় স্থাপন করতে হবে তা বলে দিতেন। সে অনুযায়ী রাসুলুল্লাহ (স.) ও সাহাবিগণের দ্বারা লিখিয়ে নিতেন। পবিত্র কুরআনের পাণ্ডুলিপি তৈরিতে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। ফলে লাওহে মাহফুজে যেভাবে কুরআন বিন্যস্ত রয়েছে বর্তমান কুরআন মজিদও ঠিক সে বিন্যাসেই বিদ্যমান রয়েছে।

হয়রত উসমান (রা.)-এর সময়ে তৈরিকৃত কুরআনের পাণ্ডুলিপিতে হরকত বা প্রচারিত ছিল না। ফলে অন্যারব মুসলমানগণ কুরআন তিলাওয়াতে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হন। ইরাকের উমাইয়া বংশীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ পবিত্র কুরআনে হরকত সংযোজন করে এ অসুবিধা দূর করেন। বস্তুত এটা কুরআনে কোনো নতুন সংযোজন নয়। বরং আগে হরকতসহ পড়া হলেও তা লিখা হতো না। কেননা আরবগণ এমনিই তা বুবাতে পারতেন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ উচ্চারিত এসব হরকতসমূহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করে দেখিয়ে দেন মাত্র। ফলে অন্যারবগণের জন্যও কুরআন তিলাওয়াতের বাধা অপসারিত হয়।

উল্লেখ্য, পরবর্তী সময়ে পরিত্র কুরআন আরও নবতর ও সহজ উপায়ে সংকলন করা হয়। মুদ্রণ যত্ন আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত হাতের লিখার মাধ্যমেই আল-কুরআন সংকলন করা হতো। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পরবর্তীতে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আল-কুরআনের লক্ষ লক্ষ কপি মুদ্রণ করা হতে থাকে। এমনকি বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ভাষায় এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-গ্রন্থও প্রকাশিত হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা প্রমাণ করবে যে আল-কুরআনে ভুল, বিকৃতি ও সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

পাঠ ৪

মাকি ও মাদানি সূরা

(السُّورَ الْمَكِيَّةُ وَالْمَدِينَيَّةُ)

আল-কুরআন সর্বমোট ৩০টি অংশে বিভক্ত। এ অংশগুলোকে পারা বলা হয়। কুরআন মজিদে রয়েছে ১১৪টি সূরা এবং ৬২৩৬টি মতান্তরে ৬৬৬টি আয়াত। অবতরণের সময় বিবেচনায় কুরআন মজিদের সূরাসমূহ ২ ভাগে বিভক্ত। যথা-মাকি ও মাদানি। নিম্নে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো।

মাকি সূরা

সাধারণভাবে বলা যায়, পরিত্র মাকি নগরীতে আল-কুরআনের যেসব সূরা নাজিল হয়েছে সেগুলো মাকি সূরা। অসিদ্ধ মতানুযায়ী, মহানবি (স.)-এর মকা থেকে মদিনায় হিজরতের পূর্বে নাজিল হওয়া সূরাসমূহকে মাকি সূরা বলা হয়।

এ প্রসঙ্গে ইয়াহইয়া ইবনে সালাম বলেন, “মহানবি (স.)-এর হিজরত কালে মদিনায় গমনের পথে মদিনায় পৌছার পূর্বপর্যন্ত যা নাজিল হয় তাও মাকি সূরা।”

আল-কুরআনে মাকি সূরার সংখ্যা মোট ৮৬টি।

মাকি সূরার বৈশিষ্ট্য

১. মাকি সূরাসমূহে তাওহিদ ও রিসালাতের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।
২. মৃত্যুর পরবর্তী জীবন কিয়ামত, জাল্লাত-জাহানাম তথা আখিরাতের বর্ণনা এসব সূরায় প্রাধান্য লাভ করেছে।
৩. শিরক-কুফরের পরিচয় বর্ণনা করে এগুলোর অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে।
৪. মুশরিক ও কাফিরদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।
৫. এতে পূর্ববর্তী মুশরিক ও কাফিরদের হত্যায়জ্ঞের কাহিনী, ইয়াতিমদের সম্পদ হরণ করা, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত করে দেওয়া ইত্যাদি কৃপথা ও কু-আচরণের বিবরণ রয়েছে।

৬. পূর্ববর্তী নবি-রাসুলগণের সফলতা ও তাঁদের অবাধ্যদের শোচনীয় পরিপতির বর্ণনা রয়েছে।
৭. এ সূরাগুলোতে শরিয়তের সাধারণ নীতিমালার উল্লেখ রয়েছে।
৮. এতে উভয় চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করা হয়েছে।
৯. এ সূরাসমূহ সাধারণত আকারে ছোট এবং আয়াতগুলোও তুলনামূলকভাবে ছোট।
১০. এর শব্দমালা শক্তিশালী, ভাবগভীর ও অন্তরে প্রকম্পন সৃষ্টিকারী।
১১. এতে প্রসিদ্ধ বিষয়সমূহ শপথের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।
১২. মাকি সূরা সমূহে **يَهُ أَنْتَ** (অর্থ-'হে মানবজাতি') কথাটি উল্লেখ আছে।

মাদানি সূরা

সাধারণ ভাষায় বলা যায়, মদিনাতে নাজিল হওয়া সূরাগুলো মাদানি সূরা। তবে প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী, মহানবি (স.)-এর মদিনায় হিজরতের পর নাজিল হওয়া সকল সূরাকে মাদানি সূরা নামে আখ্যায়িত করা হয়।

ইয়াহইয়া ইবনে সালাম বলেন, “মহানবি (স.)-এর মদিনায় হিজরতের পর মদিনার বাইরে সফরে থাকাবস্থায় নাজিল হওয়া সূরাসমূহও মাদানি সূরা।” অর্থাৎ হিজরতের পর নাজিল হওয়া সকল সূরাই মাদানি সূরা। মাদানি সূরা মোট ২৮টি।

মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্য

১. মাদানি সূরাসমূহে আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রতি ইসলামের আহ্বান জানানো হয়েছে।
২. এতে আহলে কিতাবের পথভ্রষ্টতা ও তাদের কিতাব বিকৃতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে।
৩. এ সূরাসমূহে নিফাকের পরিচয় ও মুনাফিকদের ঘড়বংশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
৪. ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে।
৫. পারস্পরিক লেনদেন, উত্তরাধিকার আইন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়সহ যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিধান বর্ণিত হয়েছে।
৬. বিচার ব্যবস্থা, দণ্ডবিধি, জিহাদ, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।
৭. ইবাদতের রীতিনীতি, সালাত, যাকাত, হজ, সাওম ইত্যাদি বিষয় বিরূত হয়েছে।
৮. শরিয়তের বিধি-বিধান, ফরজ, ওয়াজিব, হালাল-হারাম ইত্যাদির সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।
৯. এ সূরাগুলো ও এর আয়াতসমূহ তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ।
১০. মাদানি সূরা সমূহে **أَنْتَ يَهُ أَلَّذِينَ أَمْنُوا** (অর্থ-'হে ইমানদারগণ') কথাটি উল্লেখ আছে।

কাজ: শিক্ষার্থীরা সূরা ইখলাসে মাকি কিংবা মাদানি সূরার যেসব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তা চিহ্নিত করবে।

পাঠ ৫

তিলাওয়াত : গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

(الْتَّلَوَةُ : الْأَهْمِيَّةُ وَالْفَضْيَلَةُ)

তিলাওয়াত শব্দের অর্থ পাঠ করা, আবৃত্তি করা, পড়া, অনুসরণ করা ইত্যাদি। আল-কুরআন পাঠ করাকে ইসলামি পরিভাষায় কুরআন তিলাওয়াত বলা হয়।

কুরআন মজিদ মুখস্থ পড়া যায়, আবার দেখেও তিলাওয়াত করা যায়। আল-কুরআন দেখে পড়াকে নাযিরা তিলাওয়াত বলা হয়।

কুরআন মজিদ শিখতে হলে প্রথমে দেখে দেখে তা পাঠ করতে হয়। অতঃপর হরকত, হরফ ইত্যাদি চিনে তাজবিদ সহকারে পাঠ করতে হয়। আমরা অনেকেই পুরো কুরআন মজিদ মুখস্থ করতে পারিনি। সুতরাং আমরা নিয়মিত দেখে দেখে তাজবিদসহ আল-কুরআন তিলাওয়াত করব। এভাবে দেখে দেখে কুরআন তিলাওয়াত করাও উত্তম কাজ। এতে অনেক নেকি বা সাওয়াব পাওয়া যায়।

আল-কুরআন মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী। এটি মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ নিয়ামত। এটি হলো পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান-ভাণ্ডার। এতে যেমন তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, ইবাদত ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে, তেমনি পার্থিব জীবনের প্রয়োজনীয় নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ও নির্দেশনা রয়েছে। এজন্য একজন ফরাসি পণ্ডিত যথার্থই বলেছেন, “কুরআন বিজ্ঞানীদের জন্য একটি বিজ্ঞান সংস্থা, ভাষাবিদদের জন্য শব্দকোষ, বৈয়াকরণের জন্য ব্যাকরণ গ্রন্থ এবং বিধানের জন্য একটি বিশ্বকোষ।”

সুতরাং হালকাভাবে আল-কুরআন পাঠ করলেই চলবে না। বরং একে খুবই গুরুত্বের সাথে তিলাওয়াত করতে হবে। এর মর্মার্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে। এতে বর্ণিত বিষয়াদি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে। তাহলে আমরা আল-কুরআনের জ্ঞান ও শিক্ষা আয়ত্ত করতে পারব। আল্লাহ তায়ালাও চিন্তা-গবেষণা সহকারে কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, “তবে কি তারা কুরআন সবচেয়ে একান্ত সহকারে চিন্তা করে না, না তাদের অস্তর তালাবক্তু? ” (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ২৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, “এটি কল্যাণময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ (এ থেকে) উপদেশ গ্রহণ করে” (সূরা সাদ, আয়াত ২৯)।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন— ○ وَلَقَدْ يَسِّرَنَا الْقُرْآنَ لِلّٰهِ كُرْفَهْلُ مِنْ مُلْكٍ كِرْ

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি, অতএব কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? (সূরা আল-কামার, আয়াত ২২)

অতএব বুঝেশুনে ও চিন্তা-গবেষণা সহকারে কুরআন পড়া উচিত। এভাবে তিলাওয়াত করলে আল-কুরআনের শিক্ষা ও উপদেশ অনুধাবন করা যায়।

চিন্তা-গবেষণার পাশাপাশি আল-কুরআন সহিত-শুন্দ ও সুন্দরভাবে পাঠ করাও অত্যাবশ্যক। কুরআন মজিদ ভূল ও অসুন্দর সুরে তিলাওয়াত করলে গুনাহ হয়। অশুন্দ ও অসুন্দররূপে কুরআন তিলাওয়াত করলে নামায শুন্দ হয় না। শুন্দ ও সুন্দররূপে কুরআন তিলাওয়াত করার নিয়মকে তাজবিদ বলা হয়। পূর্ববর্তী শ্রেণিসমূহে আমরা তাজবিদের নানা নিরামকানুন জেনে এসেছি। তাজবিদসহ কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ রয়েছে। তিনি বলেন-

وَرَتِيلُ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلًا

অর্থ : আর আপনি কুরআন আবৃত্তি করুন ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে (সূরা আল-মুয়ামিল, আয়াত ৪)।

সুন্দর সুরে কুরআন তিলাওয়াত প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন—

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ -

অর্থ : যে ব্যক্তি সুলিলত কঢ়ে কুরআন তিলাওয়াত করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। অর্থাৎ সে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (স.)-এর নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় (বুখারি)।

বক্তৃত রাসুলুল্লাহ (স.) অত্যন্ত সুন্দর সুমধুর স্বরে তাজবিদ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আমরাও শুন্দ ও সুন্দররূপে কুরআন তিলাওয়াত করতে চেষ্টা করব।

কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত অত্যন্ত বেশি। এর প্রতিটি হরফ তিলাওয়াতেই নেকি পাওয়া যায়। নবি করিম (স.) বলেন—

مَنْ قَرَأَ حَزْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بَعْشَرِ أَمْثَالِهَا -

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি হরফও পাঠ করবে সে একটি নেকি লাভ করবে। আর এ নেকির পরিমাণ হলো দশ গুণ (তিরমিয়ি)।

বক্তৃত, কুরআন তিলাওয়াত উভয় ইবাদত। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন—

أَفْضُلُ عِبَادَةٍ أَمْنِيَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ -

অর্থ : আমার উম্মতের উভয় ইবাদত হলো কুরআন তিলাওয়াত (বায়হাকি)।

কুরআন হলো নূর বা জ্যোতি। এটি তিলাওয়াতকারীর মর্যাদা সমুদ্দর করে। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। এর মাধ্যমে মানুষের অন্তর পরিশুন্দ হয়। মানুষ নেতৃত্ব ও মানবিক গুণাবলিতে উন্নতিসিত হয়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “এই অন্তরসমূহে মরিচা ধরে যেভাবে লোহায় পানি লাগলে মরিচা ধরে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো : হে আল্লাহর রাসুল (স.), এর পরিশোধক কী? তিনি বললেন, মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করা এবং কুরআন তিলাওয়াত করা।” (বায়হাকি)

প্রকৃতপক্ষে, যথাযথভাবে কুরআন তিলাওয়াত করার দ্বারা মানুষ দুনিয়া ও আধিরাতে সফলতা লাভ করতে পারে। শুন্দি ও সুন্দরজগৎ কুরআন তিলাওয়াত করলে এবং এর মর্মার্থ বুঝে সে অনুযায়ী আমল করলে মানুষ প্রভৃতি সশ্রান্ত ও মর্যাদার অধিকারী হয়। হাদিসে এসেছে, “যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে, কিয়ামতের দিন তার পিতামাতাকে সূর্যের চাইতেও উজ্জ্বল মুকুট পরানো হবে।” (আহমাদ ও আবু দাউদ)। অতএব, আমরা কুরআন তিলাওয়াতে যত্নবান হব।

শানে নুয়ুল

‘শান’ শব্দের অর্থ অবস্থা, মর্যাদা, কারণ, ঘটনা, পটভূমি। আর নুয়ুল অর্থ অবতরণ। অতএব, শানে নুয়ুল অর্থ অবতরণের কারণ বা পটভূমি। ইসলামি পরিভাষায়, আল-কুরআনের সূরা বা আয়াত নাজিলের কারণ বা পটভূমিকে ‘শানে নুয়ুল’ বলা হয়। একে ‘সববে নুয়ুল’ও বলা হয়।

আল-কুরআন মহানবি (স.)-এর প্রতি একসাথে নাজিল হয়নি। বরং নানা প্রয়োজন উপলক্ষে সুন্দীর্ঘ ২৩ বছরে অল্প অল্প করে নাজিল হয়েছে। কোনো ঘটনার বিধান বর্ণনায় কিংবা কোনো সমস্যার সমাধানে কুরআনের অংশবিশেষ নাজিল হতো। যে ঘটনা বা অবস্থাকে কেন্দ্র করে আল-কুরআনের আয়াত বা সূরা নাজিল হতো সে ঘটনা বা অবস্থাকে ঐ সূরা বা আয়াতের শানে নুয়ুল বলা হয়। যেমন : রাসূলুল্লাহ (স.)-এর শিশুপুত্র ইন্দ্রেকাল করলে কাফিররা তাঁকে আবতার বা নির্বৎস বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা মহানবি (স.)-কে সাত্ত্বনা দিয়ে সূরা আল-কাওসার নাজিল করেন। অতএব, মহানবি (স.)-এর প্রতি কাফিরদের উপহাস করার ঘটনাটি সূরা আল-কাওসারের শানে নুয়ুল হিসেবে পরিচিত।

শানে নুয়ুল জ্ঞানের উপকারিতা অনেক। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

ক. এর দ্বারা শরিয়তের বিধান প্রবর্তনের রহস্য জানা যায়।

খ. আয়াতের অর্থ, উদ্দেশ্য ও সঠিক মর্মার্থ অবগত হওয়া যায়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কুরআন তিলাওয়াতের মাহাত্ম্য সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসের উদ্ভৃতি অর্থসহ উল্লেখ করবে।

অর্থ ও পটভূমিসহ আল-কুরআনের কতিপয় সূরা (بعْضُ آيَاتِ الْقُرْآنِ مَعَ الْمَعَانِي وَالسِّيَاقِ)

পাঠ ৬

সূরা আশ-শামস (سُورَةُ الشَّمْسِ)

পরিচয়

সূরা আশ-শামস যাকি সূরার অন্তর্গত। এর আয়াত সংখ্যা ১৫টি। এ সূরার প্রথম শব্দ শামস থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে আশ-শামস। এটি আল-কুরআনের ৯১তম সূরা।

শব্দার্থ

وَالشَّمْسُ	- শপথ, কসম
صُحَبًا	- সূর্য
الْقَمَرِ	- তার কিরণ
تَهَا	- চন্দ্ৰ
النَّهَارُ	- তার পশ্চাতে আসে
جَلَّهَا	- দিন, দিবস
اللَّيْلِ	- তাকে ধূকাশ করে
يَعْشَهَا	- রাত, রাত্রি
السَّيَاءُ	- তাকে আচ্ছাদিত করে, ঢেকে ফেলে
مَا	- আকাশ, আসমান
بَنْهَا	- যিনি, যা
أَلْأَرْضُ	- তৈরি করেছেন, নির্মাণ করেছেন
ظَاهِرًا	- জমিন, পৃথিবী
نَفْسٌ	- তা বিস্তৃত করেছেন
سَوْهًا	- থ্রাণ, আত্মা, মানুষ
فُجُورَهَا	- তাকে সুস্থাম করেছেন, সুবিলাস্ত করেছেন
تَقْوَهَا	- তার পাপকর্ম, অসংকর্ম
أَفْلَحَ	- তার সৎকর্ম
	- সফলকাম হবে, সফলতা লাভ করবে।

زَكْهًا	- নিজেকে পৰিত্ব করবে
خَابَ	- ব্যর্থ হবে
دَسْهَا	- নিজেকে কল্পিত করবে
كَذَبَتْ	- মিথ্যা প্রতিপন্থ করেছিল, অস্থীকার করেছিল
ثَمُودُ	- ছামুদ জাতি
بِطَغُوهَا	- তাদের অবাধ্যতা দ্বারা
إِذْ	- যখন
إِنْبَغَتْ	- তৎপর হয়ে উঠল
أَشْقَهَا	- তাদের সবচেয়ে হতভাগ্য ব্যক্তি
فَقَالَ	- অতৎপর বললেন
رَسُولُ اللَّهِ	- আল্লাহর রাসূল
نَاقَةٌ	- উদ্ধী
سُقْنَيْهَا	- তাকে পানি পান করানো
فَعَقَرَوْهَا	- অতৎপর তারা তাকে কেটে ফেলল
فَرَمَدَهُ	- অতৎপর ধ্বংস করে দিলেন
بِذَنْبِهِمْ	- তাদের পাপের কারণে
لَا يَعْفَافُ	- তিনি ভয় করেন না
عَقْبَهَا	- তার পরিণাম

অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

প্রম করণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

وَالشَّمْسِ وَصَحْبَهَا ۝

১. শপথ সূর্যের ও তার কিরণের।

وَالنَّمَاءُ إِذَا نَلَهَا

وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَهَا

وَالْأَيَّلُ إِذَا يَعْلَمُهَا

وَالسَّاعَةُ وَمَا بَيْنَهَا

وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَّهَا

وَنَفَّيْتُ وَمَا سُوِّيَّهَا

فَإِلَهُمْ هَا فِجُورُهَا وَنَقْوَهَا

فَذَلِكُلُّ حُكْمٌ مِّنْ رَّبِّكُهَا

وَقُدْخَابٌ مِّنْ دَشَهَا

كَذَبَتْ قَمُودٌ بَطَعُونَهَا

إِذَا نَبَغَتْ أَشْفَهَا

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ

وَسَقِيَهَا

فَكَذَبُوا هُوَ فَعَقَرُوهَا فَقَدْ مَدَمٌ عَلَيْهِمْ

رَبِّهِمْ يَدْنِيهِمْ فَنَوْهَا

وَلَا يَخَافُ غَبَّهَا

২. শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়।
৩. শপথ দিনের যখন সে তাকে (সূর্যকে) প্রকাশ করে।
৪. শপথ রাতের যখন সে তাকে আচ্ছাদিত করে।
৫. শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন, তাঁর।
৬. শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন, তাঁর।
৭. শপথ মানুষের এবং যিনি তাকে সুস্থাম করেছেন, তাঁর।
৮. অতঃপর তিনি তাকে তার অসংকর্ম ও সংকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।
৯. সে-ই সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র করবে।
১০. আর সে-ই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কল্পিত করবে।
১১. ছামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত অস্থীকার করেছিল।
১২. যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠল।
১৩. তখন আল্লাহর রাসূল তাদের বললেন, আল্লাহর উল্ল্লি ও তাকে পানি পান করানোর বিষয়ে (তোমরা সাবধান হও)।
১৪. কিন্তু তারা তাঁকে (রাসূলকে) অস্থীকার করল ও তাকে (উল্ল্লিকে) কেটে ফেলল। ফলে তাদের পাপের জন্য তাদের প্রতিপালক তাদের সমূলে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন।
১৫. আর তিনি (আল্লাহ তায়ালা) এর পরিণাম সম্পর্কে ডয় করেন না।

বাখ্য

সূরা আশ-শামস-এ বর্ণিত আয়াতসমূহ তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ হলো সূরার প্রথম সাত আয়াত। এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কতিপয় সৃষ্টিবস্তু, এদের অবস্থা ও এদের স্তুষ্টা সম্পর্কে শপথ করেছেন। মানুষের শপথ করেছেন। এসব জিনিসের শপথ করার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা প্রবর্তী

আয়াতগুলোতে বর্ণিত বিষয়ের তাগিদ করেছেন। সূরার দ্বিতীয় ভাগে আল্লাহ তায়ালা মানুষের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে সৎকর্ম ও অসৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। এতদসত্ত্বেও যে ব্যক্তি নিজেকে পাপের দ্বারা কল্পিত করে তার জন্য ধর্মস অনিবার্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজেকে পরিশুম্বন্দ করে, সৎকর্ম করে তার জন্য রয়েছে সফলতা।

সূরার শেষভাগে আল্লাহ তায়ালা ছামুদ সম্প্রদায়ের উদাহরণের মাধ্যমে মানুষের ব্যর্থতার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। ছামুদ সম্প্রদায় ছিল খুবই উন্নত-সমৃদ্ধ একটি জাতি। কিন্তু তারা আল্লাহর প্রেরিত রাসূলকে অবিশ্বাস করে এবং তাঁর নির্দেশ অমান্য করে। তাদের এ অবাধ্যতার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাদের শান্তি প্রদান করেন এবং তাদের ধর্মস করে দেন।

শিক্ষা

১. আল্লাহ তায়ালাই আসমান, জমিন ও মানুষের স্থাটা।
২. তিনিই সূর্য, চন্দ্র, রাত, দিনের আবর্তন ঘটান।
৩. তিনিই মানুষের ভালো-মন্দ, সৎকর্ম-অসৎকর্মের জ্ঞান দান করেন।
৪. যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে সে সার্বিক সফলতা লাভ করবে।
৫. আর যে ব্যক্তি নিজেকে পাপ পংকিলতায় জড়িয়ে ফেলবে সে ব্যর্থ ও ধর্মস হবে।
৬. আমদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে যারা অবাধ্য ছিল আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতেই তাদের শান্তি প্রদান করেন। বস্তুত আল্লাহ তায়ালার শান্তি অত্যন্ত কঠোর।

সুতরাং আমরা আল্লাহ তায়ালার শান্তি সম্পর্কে সচেতন থাকব। তাঁর আদেশ-নিয়েথ মেনে চলব। সৎ ও পুণ্যকর্মের মাধ্যমে আমরা নিজেদের পুত-পবিত্র রাখব। তাহলেই আমরা ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা লাভ করতে পারব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সূরা আশ-শামসের আলোকে মানব জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবে।

পাঠ ৭

সূরা আদ-দুহা(الضحى) (سُورَةُ الْضَّحْيٍ)

পরিচয়

সূরা আদ-দুহা আল-কুরআনের ৯৩তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ১১। এটি পবিত্র মুক্ত নগরীতে নাজিল হয়। সূরাটির প্রথম শব্দ দুহা থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে আদ-দুহা।

শানে নুয়ুল

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ (স.) অসুস্থ থাকার কারণে দুই-তিন রাত তাহাজুদের সালাত আদায় করতে পারেননি। এ সময় জিবরাইল (আ.) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর নিকট ওহি নিয়ে

আগমন করেননি। এতে মক্কার কাফির-মুশরিকরা বলতে লাগল যে, মুহাম্মদ (স.)-কে তাঁর প্রতিপালক পরিত্যাগ করেছে এবং তাঁর প্রতি বিরূপ হয়েছে।

অন্যদিকে আবু লাহাবের স্তৰী উম্মে জামিল মহানবি (স.)-এর নিকট এসে বলতে লাগল, “হে মুহাম্মদ! আমার মনে হয় তোমার নিকট যে শয়তান আসত সে তোমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। দুই-তিন রাত যাবৎ আমি তাকে তোমার নিকট আসতে দেখছি না।” কাফিরদের এসব কথায় ও ঠাট্টা-বিদ্রূপে মহানবি (স.) মর্মাহত হন। তখন আল্লাহ তায়ালা প্রিয়নবি (স.)-কে সাস্ত্রণা থদান করে এ সূরা নাজিল করেন। এ সূরার মাধ্যমে কাফিরদের প্রচারিত গুজবের প্রতিবাদও জানানো হয়।

শব্দার্থ

وَ	- শপথ
الْصُّبْحُ	- পূর্বাহ্ন, দিনের প্রথম ভাগ
اللَّيْلِ	- রাত
إِذَا	- যখন
سَجْنٍ	- অঙ্ককারাছন্ন হয়, নিরুম হয়
مَا وَدَعَكَ	- তিনি আপনাকে পরিত্যাগ করেননি; ছেড়ে যাননি
مَا قَلَى	- তিনি অসম্ভব হননি, বিরূপ হননি
الْآخِرَةُ	- পরকাল, আখিরাত, পরবর্তী সময়, পরজীবন
خَيْرٌ	- উত্তম, ভালো
كَ	- আপনার জন্য, তোমার জন্য
الْأُولَى	- প্রথম, ইহকাল, দুনিয়ার জীবন, পূর্ববর্তী সময়
سُوفَ	- অতি শীত্র, অচিরেই
يُعَطِّيكَ	- তিনি আপনাকে দান করবেন
تُرْضِي	- আপনি সম্ভষ্ট হবেন

الْمَبِينُ	- তিনি কি আপনাকে পাননি?
يَتِيمًا	- ইয়াতীম, অনাথ, আশ্রয়হীন
فَاؤِي	- অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন
وَجَدَ	- তিনি পেয়েছেন
ضَالًا	- পথ সম্পর্কে অনবিহিত
فَهَدَى	- অতঃপর তিনি পথ প্রদর্শন করলেন
عَائِلًا	- অভাবঘন্ট, নিঃস্ত
فَاغْنَى	- অতঃপর ধনী বানালেন, অতঃপর তিনি অভাব দূর করলেন
فَلَأَتَقْهُرْ	- অতএব আপনি কঠোর হবেন না
السَّائِلُ	- প্রার্থী, ভিক্ষুক, অভাবী
لَا تَهْرُ	- আপনি ধর্মক দেবেন না
نِعْمَةً	- নিয়ামত, অবদান, ধনদৌলত, অনুগ্রহ
حَلِيلٌ	- আপনি বর্ণনা করুন, প্রচার করুন, প্রকাশ করুন, জানিয়ে দিন

অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ

وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَدَ

مَا وَدَعَكَ رَبِّكَ وَمَا قَلَىٰ

وَلِلآخرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ

وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبِّكَ فَقْرَضَىٰ

الْمَرِيدِكَ يَتَّسِعَا فَاوِىٰ

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ

وَوَجَدَكَ عَابِلاً فَاعْغَنَىٰ

فَأَمَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَنْقِرْهُ

وَأَمَّا الْأَشْهَدُ فَلَا شَهِرُ

وَأَمَّا بِنْعَمَةِ رَبِّكَ فَخَلَقْتَ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

১. শপথ পূর্বান্ত্রে।
২. শপথ রাতের, যখন তা নিবুম হয়।
৩. আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং আপনার থতি বিরূপও হলনি।
৪. নিশ্চয়ই আপনার জন্য পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়।
৫. অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে অনুগ্রহ দান করবেন, আর আপনি সন্তুষ্ট হবেন।
৬. তিনি কি আপনাকে ইয়াতীয় অবস্থায় পালনি? অতঃপর তিনি আপনাকে আশ্রয় দান করেছেন।
৭. তিনি আপনাকে পথ সম্পর্কে অনবহিত পেয়েছেন, তারপর তিনি পথের নির্দেশ দিয়েছেন।
৮. তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃশ্ব অবস্থায়, অতঃপর তিনি অভাবমুক্ত করেছেন।
৯. সুতরাং আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না।
১০. এবং যাচনাকারীকে ধর্মক দেবেন না।
১১. আর আপনি আপনার প্রতিপালকের নিয়ামতের কথা থ্রকাশ করুন।

ব্যাখ্যা

এ সুরায় আল্লাহ তায়ালা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে প্রদত্ত নানা নিয়ামতের কথা বর্ণনা করেছেন। নবি-রাসূলগণ আল্লাহ তায়ালার মনোনীত ব্যক্তি। তাঁরা আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা। মহান আল্লাহ তাঁদের অজস্য নিয়ামত দান করেন। তাঁদের সকল বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন। আমাদের প্রিয়নবি (স.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসূল। তিনি ছিলেন আল্লাহ তায়ালার হাবিব অর্থাৎ প্রিয়তম বা বন্ধু। আল্লাহ তাঁকে সর্বাবস্থায় সাহায্য ও নিয়ামত দান করেন।

আমরা জানি, হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা ইস্তিকাল করেন। এরপর তাঁর ছয় বছর বয়সে তাঁর মাতা ইস্তিকাল করেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা স্থির অসীম রহমতে তাঁকে সুন্দরভাবে লালনপালন করেন। রাসুলুল্লাহ (স.) মানবজাতির দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য ও পরকালীন মুক্তির জন্য চিন্তাক্রিট হয়ে হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে হিদায়াত দান করেন, সত্য ও সুন্দর পথের নির্দেশনা প্রদান করেন। মহানবি (স.) দরিদ্র ছিলেন। আল্লাহ তায়ালাহ তাঁকে অভাবমুক্ত করেন। সচ্ছলতা দান করেন। এভাবে রাসুলুল্লাহ (স.)-কে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ তায়ালা বহু নিয়ামত দান করেন।

পাশাপাশি পরকালেও আল্লাহ তায়ালা রাসুল (স.)-কে নানা নিয়ামত দান করার সুসংবাদ দান করেছেন এ সূরায়। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন যে, মহানবি (স.)-এর আখিরাতের জীবন দুনিয়ার জীবন অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম হবে। সেখানে তিনি উত্তম প্রতিদান লাভ করবেন এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন।

এ সমস্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা রাসুল (স.)-কে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দেন। রাসুল (স.)-কে ইয়াতীম ও ভিক্ষুকদের সাথে কঠোর ব্যবহার না করার আদেশ দেন। পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও প্রচার করার দায়িত্ব প্রদান করেন।

শিক্ষা

এ সূরা থেকে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শিক্ষা লাভ করি। যেমন :

১. আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদের কখনোই পরিত্যাগ করেন না।
২. তিনিই তাদের সকল বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন।
৩. পরকালে তিনি তাদের কল্যাণময় জীবন দান করবেন।
৪. ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তিদের উচিত গরিব-দুঃখী, ইয়াতীম ও ভিক্ষুকদের কল্যাণ করা।
৫. অভাবী, সাহায্যপ্রার্থী, ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর হওয়া যাবে না, তাদের গালমন্দ কিংবা মারধর করা যাবে না এবং তাদের ধর্মকও দেওয়া যাবে না। বরং তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে।
৬. দুনিয়ার সকল কল্যাণ ও নিয়ামত আল্লাহ তায়ালার দান। এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সকলের কর্তব্য। যেমন আল্লাহ তায়ালা আমাদের ইয়ান, কুরআন, ধন-দৌলত, জ্ঞান-বুদ্ধি ইত্যাদি নিয়ামত দান করেছেন। সুতরাং এসবের জন্য আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। এসব নিয়ামতের কথা মানুষের মাঝে প্রচার করতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সূরা আদ-দুহা শুন্দভাবে মুখস্থ শোনাবে।

سُورَةُ الْأَنْشَرِ (۷)

পরিচয়

সূরা আল-ইনশিরাহ মক্কি সূরাসমূহের অন্যতম। এর আয়াত সংখ্যা মোট ৮টি। এটি আল-কুরআনের ১৪তম সূরা। সূরার প্রথম আয়াতে নাশরাহ (خَسْرَى) শব্দের ক্রিয়ামূল বিবেচনায় এ সূরার নাম রাখা হয়েছে আল-ইনশিরাহ।

শানে নুয়ুল

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) নবৃত্ত লাভের পূর্বেও মক্কা নগরীর অত্যন্ত সম্মানিত মানুষ ছিলেন। সারা আরবের লোক তাঁকে ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত, সম্মান দেখাত। তাঁকে আল-আমিন বলে ডাকত। নির্ধিধায় তাঁর নিকট মূল্যবান ধন-সম্পদ গাছিত রাখত। সর্বোপরি মহানবি (স.) ছিলেন সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু নবৃত্ত লাভের পর রাসুলপ্রভাু (স.) ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলে মক্কাবাসীরা তার বিরোধিতা শুরু করে। তারা তাঁকে নানাভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করতে থাকে। তাঁকে কবি, গণক, যাদুকর, পাগল ইত্যাদি বলে কষ্ট দিতে থাকে। মহানবি (স.) ও নওমুসলিম সাহাবিগণের উপর নানাভাবে অত্যাচার-নির্যাতন চালাতে থাকে। এমনকি নামাযরত অবস্থায় মহানবি (স.)-এর উপর উটের নাড়ি ভুঁড়ি চাপিয়ে দিত, তাঁর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত, তাঁর কথা না শোনার জন্য কানে আঙ্গুল দিত। এরকম নানাভাবে কাফিররা মহানবি (স.)-কে কষ্ট দিচ্ছিল। কাফিরদের একপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অন্যায় অত্যাচারে রাসুলপ্রভাু (স.) উদ্বিগ্ন ও হতাশ হয়ে পড়েন। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা এ সূরা নাজিল করে মহানবি (স.)-কে সাম্মত প্রদান করেন।

শব্দার্থ

لَمْ نَشَرْخ - আমি প্রশ্ন করিনি বা উন্মুক্ত করিনি?

صَدَرَكَ - আপনার বক্ষ

وَضَعْنَا - আমি অপসারণ করেছি, সরিয়ে দিয়েছি

وِزْرَكَ - আপনার বোৰা

الَّذِي - যা

أَنْفَضَ - ভেঙে দিয়েছিল, নুইয়ে দিয়েছিল

ظَهْرَكَ - আপনার পিঠ বা পৃষ্ঠদেশ

رَفَقَنَا - আমি উচ্চ করেছি, তুলে ধরেছি

ذَرْكَ - আপনার খ্যাতি, আলোচনা

إِنْ - নিশ্চয়ই, অবশ্যই

مَعَ - সাথে, সঙ্গে

عْسَرْ - কষ্ট, বিপদ, অমঙ্গল

يُشَرِّ - স্বত্তি, শাস্তি

فَرَغْتَ - আপনি অবসর লাভ করেন, অবকাশ পান

فَانْصَبَ - অতঃপর পরিশ্রম করুন,

ইবাদতে আত্মনিয়োগ করুন,
একান্তে ইবাদত করুন

فَازْغَبَ - অন্তর মনোনিবেশ করুন

অনুবাদ

- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْغَنَّاْرُخْ لَكَ صَدَّرَكُ
وَصَنَاعَتْكُ وَزَرَكُ
الَّذِي أَنْقَضَ خَلْفَرَكُ
وَرَفَعَتْكُ ذِكْرَكُ
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُرَا
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُرَا
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصِبْ
وَإِلَى زَيْكَ فَارْجِعْ
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।
১. আমি কি আপনার বক্ষ আপনার কল্পাণে প্রশংস্ত করে দেইনি?
 ২. এবং আমি আপনার বোৰা অপসারণ করেছি।
 ৩. যা আপনার পৃষ্ঠদেশকে নুইয়ে দিয়েছিল। (যা ছিল আপনার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক)।
 ৪. আর আমি আপনার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।
 ৫. নিচয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।
 ৬. অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।
 ৭. অতএব যখনই আপনি অবসর পান, একান্তে ইবাদত করুন।
 ৮. এবং আপনার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করুন।

ব্যাখ্যা

এই সুরায় আল্লাহ তায়ালা মহানবি (স.)-এর প্রতি তার নিয়ামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করেছেন। আমাদের প্রিয়নবি (স.) মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় আরবদের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। তারা নানা প্রকার অন্যায়-অত্যাচার ও অশ্রীল কাজে লিপ্ত ছিল। তারা আল্লাহ তায়ালার সাথে কুফরি করত, তাঁকে মানত না এবং তারা মুর্তিপূজায় নিমজ্জিত ছিল। রাসুলুল্লাহ (স.) এসব পছন্দ করতেন না। আরবদের মারামারি, হানাহানি তাঁকে ভীষণভাবে কষ্ট দিত। তাদের এসব অন্যায় অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য তিনি সর্বদা চিন্তাক্রিট থাকতেন। হেরো গুহায় ধ্যানময় থাকতেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এ কষ্ট থেকে মুক্তি দান করেন। তিনি তাঁকে নবুয়ত দান করেন। সত্য পথের দিশা প্রদান করেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির পথ সম্পর্কে নির্দেশনা দান করেন। তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি-রাসুল হিসেবে ঘোষণা করেন। নবুয়ত প্রদানের মাধ্যমে তাঁর মর্যাদা সম্মত করেন।

নবুয়ত লাভের পর রাসুলুল্লাহ (স.) আরবদের মাঝে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। এতে মক্কার কাফিররা তাঁর বিরোধিতা শুরু করে। তারা নানাভাবে তাঁকে বাধা দিতে চেষ্টা করে। তারা মহানবি (স.) ও নও মুসলিম সাহাবিদের প্রতি অত্যাচার নির্যাতন করতে থাকে। ফলে মুসলমানগণ তাদের অকথ্য জুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। আল্লাহ তায়ালা এ সময় মহানবি (স.)-কে সান্ত্বনা প্রদান করেন। তিনি

বলেন যে, দুঃখের পরই সুখ আসে। কাফিরদের এসব অত্যাচার নির্যাতন দীর্ঘস্থায়ী হবে না। বরং তিনি মুসলমানদের বিজয় দান করবেন। এসব দুঃখকষ্টের পর তারা শান্তি ও স্বষ্টি লাভ করবে। এরপর আল্লাহ তায়ালা মহানবি (স.)-কে বিশেষ নির্দেশ দিয়ে বলেন যে, যখনই ইসলাম প্রচার, সাথিদের প্রশিক্ষণ, পারিবারিক দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি থেকে তিনি অবসর হন তখনই তিনি যেন আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেন।

শিক্ষা

১. যে ব্যক্তি সত্য ও ন্যায়ের জন্য চেষ্টা-সাধনা করে আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরকে খুলে দেন। তাকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন।
২. আল্লাহ তায়ালাই মানুষের কষ্ট-যাতনা দূর করেন।
৩. মানুষের মান-সম্মান, খ্যাতি-মর্যাদা সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান মর্যাদা দান করেন।
৪. মানব জীবনে সুখ-দুঃখ থাকবেই। সুতরাং দুঃখ ও কষ্টে হতাশ হওয়া চলবে না। বরং ধৈর্যসহকারে এর মোকাবিলা করতে হবে।
৫. জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান। অতএব, এ সময়কে কাজে লাগাতে হবে। দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে হবে।
৬. পার্থিব প্রয়োজনীয় কাজ সমাধানের পর আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ও স্মরণে আত্মনিয়োগ করতে হবে। সকল কিছুতেই আল্লাহ তায়ালার প্রতি মনোনিবেশ করা তাঁর প্রিয় বান্দার বৈশিষ্ট্য।

কাজ : ক. শিক্ষার্থীরা সূরা আল-ইনশিরাহ শুন্দভাবে মুখস্থ শোনাবে।

খ. শিক্ষার্থীরা সূরা আল-ইনশিরাহ-এর শিক্ষা সম্পর্কে ৫টি বাক্য শ্রেণিকক্ষে দাঁড়িয়ে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৯

সূরা আত-তীন (سُورَةُ الْتَّيْمَنْ)

পরিচয়

সূরা আত-তীন আল-কুরআনের ৯৫তম সূরা। এটি মুক্তায় অবর্তীণ এবং এর আয়াত সংখ্যা ৮। সূরার প্রথম শব্দ তীন থেকে এ সূরার নাম আত-তীন রাখা হয়েছে।

শানে নুয়ুল

বিশেষ কোনো ঘটনা বা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরাটি নাজিল করা হয়নি। বরং মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ সফলতা লাভের দিকনির্দেশনা ও পরকালের জবাবদিহির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা এ সূরা নাজিল করেন। মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত কতিপয় নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা এতে মানবজাতির উৎপত্তি ও পরিগতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এ সূরা নাজিল করেন।

শব্দার্থ

وَ	- শপথ
الْتَّيْنِ	- আঞ্জির বা ডুমুর জাতীয় ফল
أَلْزَيْتُونِ	- যায়তুন, জলপাই জাতীয় ফল
طُورِ	- তুর পর্বত
سِينِينِينِ	- সিনাই প্রান্তর
هُذَا	- এই
الْبَلَدِ	- শহর, নগর
الْآمِينِ	- নিরাপদ
خَلَقْنَا	- আমি সৃষ্টি করেছি
الْإِنْسَانَ	- মানুষ, মানবজাতি
أَحْسَنِ	- অতি সুন্দর
تَقْوِيْمِ	- আকৃতি, গঠন, অবয়ব
ثُمَّ	- অতঃপর, পুনরায়, অনন্তর

رَدَدْنَاهُ	- আমি তাকে নামিয়ে দিয়েছি-
أَسْفَلَ	- সর্বনিম্ন
إِلَّا	- ব্যতীত, তবে, ছাড়া
الَّذِينَ	- যারা
أَمْنُوا	- তারা ইমান এনেছে
عَلُوا	- তারা আমল করেছে
الصَّلِحَتِ	- সৎকর্মসমূহ
أَجْرٌ	- প্রতিদান
غَيْرُ كَفِيلُونِ	- অশেষ, অবারিত
مَا يُكَذِّبُكَ	- কিসে তোমাকে অবিশ্বাসী করে?
الَّذِينَ	- কর্মফল দিবস, বিচার দিবস, কিয়ামত দিবস, জীবন-বিধান
أَحْكَمَ	- শ্রেষ্ঠতম বিচারক
الْحَكِيمُونِ	- বিচারকগণ

অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

প্রম করণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

وَالثَّيْنِ وَالرَّيْتُونِ ۝

১. শপথ আঞ্জির ও যায়তুনের।

وَطُورِ سِينِينِ ۝

২. আর শপথ সিনাই প্রান্তরস্থ তুর পর্বতের।

وَهَذَا الْبَلَدُ الْآمِينِ ۝

৩. এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর (মক্কা নগরীর)।

لَقَدْ خَلَقْنَا إِلَيْنَا فِي

৪. নিশ্চয় আমি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছি।

آخِرَ تَقْوِيْمِ ۝

৫. এরপর আমি তাকে নামিয়ে দিয়েছি সর্বনিম্ন স্তরে।

أَلَا الَّذِينَ أَفْتَأُوا وَعَبَلُوا الصَّلَحَاتِ
فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مُسْتَوْنٌ
فَتَابَكُلُّكُمْ بَعْدَ إِلَيْنَا
أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَخْيَرِ الْحَكَمِينَ

৬. কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে।
তাদের জন্য তো রয়েছে অশেষ পুরস্কার।
৭. সুতরাং (হে মানুষ!) কিসে তোমাকে বিচার দিবস সম্বন্ধে
অবিশ্বাসী করে?
৮. আল্লাহ কি বিচারকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন?

ব্যাখ্যা

সূরা আত-তীনের প্রথম তিন আয়াতে আল্লাহ তায়ালা চারটি বস্তুর শপথ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম দুটি হলো আঞ্জির (ডুমুর জাতীয় ফল) ও যায়তুন। আঞ্জির হলো একটি উপাদেয় ফল। আর যায়তুনের ফল অত্যন্ত বরকতময় ও এর তৈল খুবই উপকারী। এ দুটি বৃক্ষ সিরিয়া ও ফিলিস্তিন অঞ্চলে বেশ উৎপন্ন হয়। আর সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে অগণিত নবি-রাসূল আগমন করেছিলেন। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তুর পর্বতের শপথ করেছেন। এ পর্বত অত্যন্ত বরকতময় স্থান। এ পর্বতে হযরত মুসা (আ.) মহান আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথন করেন। আর সেখানেই তাওরাত কিতাব নাজিল হয়। তৃতীয় আয়াতে নিরাপদ নগরীর শপথ করা হয়েছে। আর এটা হলো মক্কা নগরী। এ নগরীতে মহানবি (স.) জন্মাহণ করেন। এতে পবিত্র বায়তুল্লাহ বা কাবা শরিফ অবস্থিত, সেখানে রক্তপাত ও মারামারি নিষিদ্ধ।

এ সূরায় প্রথম তিনটি আয়াতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শপথ করে আল্লাহ তায়ালা মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর সৃষ্টি হিসেবে ঘোষণা করেন। সৃষ্টিজগতের মধ্যে মানুষের আকৃতিই সবচেয়ে সুন্দর। তবে মানুষ যদি ভালো কাজ না করে অসৎ কাজে লিপ্ত হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে লাঢ়িত-অপমানিত করেন। তাকে শাস্তি প্রদান করেন।

এ সূরার শেষাংশে আল্লাহ তায়ালা পরকাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এ সূরায় সৎকর্মশীল ও পুণ্যবানগণের জন্য পরকালে জালাতের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, পরকালে আল্লাহ তায়ালা মানুষের সকল কাজের হিসাব নেওয়ার জন্য একত্র করবেন। এদিন হবে প্রতিফল দিবস বা শেষ বিচারের দিন। আল্লাহ তায়ালা হবেন সেদিনের একমাত্র বিচারক। তিনিই সর্বোত্তম ন্যায়বিচারক। মানুষের দুনিয়ার কৃতকর্মের জন্য তিনি পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন।

শিক্ষা

১. মানুষ সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম সৃষ্টি।
২. মানুষের সম্মান ও মর্যাদা সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল। অসৎকর্ম করলে মানুষ মনুষ্যত্বের স্তর থেকে পশ্চত্ত্বের স্তরে নেমে যায়।
৩. সৎকর্মশীলগণ পরকালে অশেষ ও অফুরন্ত পুরস্কার লাভ করবেন।
৪. আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। শেষ বিচারের দিন তিনি সকল মানুষের কৃতকর্মের হিসাব নেবেন।

৫. মহান আল্লাহ আখিরাত সম্পর্কে আমাদের পুরোপুরি সাবধান ও সতর্ক করেছেন। সুতরাং কোনো সুষ্ঠু বিবেকবান মানুষের এটি অবিশ্বাস করা উচিত নয়।

কাজ : ক. শিক্ষার্থীরা সূরা আত্-তীন শুন্দভাবে এক সাথে তেলাওয়াত করবে।

খ. শিক্ষার্থীরা সূরা আত্-তীন-এর অনুবাদ নিজ খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১০

সূরা আল-মাউন (سُورَةُ الْمَاعُون)

পরিচয়

সূরা আল-মাউন আল-কুরআনের ১০৭তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ৭টি। এটি মাঝি সূরাগুলোর অন্তর্গত। সূরার শেষ শব্দ মাউন থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

أَرْعَيْتَ	- আপনি কি দেখেছেন?	الْبِسْكِينُ	- মিসকিন, নিঃশ্ব, অভাবগ্রস্ত
الَّذِي	- যে	فَوَيْلٌ	- অতঃপর ধ্বংস, দুর্ভোগ
يُكَذِّبُ	- অশ্বিকার করে, মিথ্যারোপ করে	لِلْمُصْلِيلِينَ	- সালাত আদায়কারীগণ
الَّذِينَ	- কর্মফল দিবস, বিচার দিবস, ধর্ম	سَاهُونَ	- উদাসীন, অবহেলাকারী
يَدْعُ	- তাড়িয়ে দেয়	يُرَاءُونَ	- তারা দেখায়
الْيَتَيمَ	- ইয়াতীম, অনাথ	يَمْنَعُونَ	- তারা দেয় না
لَا يَحْضُضُ	- উৎসাহ দেয় না	الْمَاعُونَ	- গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটখাটো বস্তু, নিত্যব্যবহার্য বস্তু।
طَعَامٍ	- খাদ্য, আহার		

অনুবাদ

إِسْرَارُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

أَرْعَيْتَ النَّى يُكَذِّبُ بِالِّدِينِ ۖ

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ بِالْيَتَيمِ ۖ

وَلَا يَحْضُضُ عَلَى طَعَامِ الْبِسْكِينِ ۖ

প্রথম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

১. আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে বিচার দিবসকে অশ্বিকার করে?
২. সে তো ঐ ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে কৃতভাবে তাড়িয়ে দেয়।
৩. আর সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না।

فَوْيَلٌ لِّلْمُصْلِنِينَ
 الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاةٍ هُمْ سَاهُونَ
 الَّذِينَ هُمْ يُرَأَءُونَ
 وَيَسْتَغْوِنُونَ الْمَاغُونَ

৪. সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের।
৫. যারা তাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন।
৬. যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে।
৭. এবং গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছেটখাটো বস্ত অন্যকে দেয় না।

ব্যাখ্যা

এই সুরায় কাফির ও মুনাফিকদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও কাজের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা সুরার প্রথম আয়াতে কিয়ামত দিবস ও বিচার দিবস অস্বীকারকারীদের কথা বলেছেন। আর কাফির মুনাফিকরাই মূলত বিচার দিবসের অস্বীকারকারী। তারা তাওহিদ, রিসালাত ও আধিরাতকে অস্বীকার করে।

অতঃপর সুরার শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। যেমন, তারা ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর, ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ তারা জোর করে দখল করে। ইয়াতীমদের কোনোরপ সাহায্য-সহযোগিতার পরিবর্তে তাদের রূঢ় ও নিষ্ঠুরভাবে তাড়িয়ে দেয়। এমনকি ইয়াতীম, দুঃস্থ, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তকে নিজেরা তো সাহায্য করেই না বরং অন্যকেও একাজে উৎসাহ দেয় না।

মুনাফিকদের আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তারা ঠিকমতো সালাত আদায় করে না। বরং তারা সালাত সম্পর্কে উদাসীন। শুধু মুসলমানদের দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে। সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে তারা কোনো খবর রাখে না। অথচ সালাতে অবহেলার জন্য দুনিয়া ও আধিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাধ্বংস।

শিক্ষা

১. বিচার দিবসকে অস্বীকার করা খুবই জঘন্য কাজ। এটি কাফির-মুনাফিকদের কাজ।
২. ইয়াতীম ও দুঃস্থদের তাড়িয়ে দেওয়া নয়, বরং তাদের যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে।
৩. ইয়াতীম, নিঃস্বদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বাঙ্গব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে উৎসাহ দিতে হবে।
৪. কোনোক্রমেই সালাতে অবহেলা করা চলবে না। লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করা যাবে না। বরং বিশুদ্ধ নিয়তে সঠিকভাবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সালাত আদায় করতে হবে।
৫. সালাতে উদাসীন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে মহাধ্বংস।

কাজ : ক. শিক্ষার্থীরা সুরা আল-মাউন শুন্দভাবে এক সাথে তেলাওয়াত করবে।

খ. শিক্ষার্থীরা সুরা আল-মাউন এর শিক্ষা একটি পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১১

শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস : সুন্নাহ (المَصْدَرُ الثَّانِي لِلتَّشْرِيعِ: السُّنْنَةُ)

শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস হলো সুন্নাহ। সুন্নাহ অর্থ পথ, পদ্ধতি, রীতিনীতি। ইসলামি পরিভাষায়, মহানবি (স.)-এর বাণী, কর্ম ও তাঁর সমর্থিত রীতিনীতিকে সুন্নাহ বলে। সুন্নাহকে হাদিস নামেও অভিহিত করা হয়। সুন্নাহ হলো আল-কুরআনের ব্যাখ্যা ঘৰ্ম।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে বিভিন্ন বিষয়ের সংক্ষিপ্ত মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। আর মহানবি (স.) তাঁর সুন্নাহর মাধ্যমে এসব বিধি-বিধান ও বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْبَيِّنَاتِ لِتَبْيَّنَ مَا تُرْكِلُ إِلَيْهِمْ

অর্থ : আর আমি আপনার প্রতি কুরআন নাজিল করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যা তাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে (সূরা আন-নাহল, আয়াত ৪৪)।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে এ বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে। যেমন আল-কুরআনে বলা হয়েছে- **أَقِيمُوا الصَّلَاةَ**

অর্থ : তোমরা সালাত কায়েম কর (সূরা আল-আনআম, আয়াত ৭২)।

কিন্তু কোথায়, কীভাবে, কোন সময়ে সালাত আদায় করতে হবে এর কোনো পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা আল-কুরআনে পাওয়া যায় না। বরং রাসুলুল্লাহ (স.) এর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সালাতের সমস্ত নিয়মকানুন তাঁর হাদিস বা সুন্নাহ এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছেন। এভাবে আল-কুরআনের নির্দেশ ও সুন্নাহর বর্ণনার মাধ্যমে সালাত প্রতিষ্ঠা হয়।

মূলত সুন্নাহ বা হাদিস হলো আল-কুরআনের ব্যাখ্যা। আল-কুরআনে একে শরিয়তের দলিল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَعَلُوْهُ وَمَا نَهِكُمْ عَنْهُ فَإِنْتُمْ هُوَا

অর্থ : “আর রাসুল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর আর তোমাদের যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।” (সূরা আল-হাশর, আয়াত ৭)

সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, সুন্নাহ বা হাদিস শরিয়তের অন্যতম দলিল ও উৎস। আল-কুরআনের পরই এর স্থান।

আল-হাদিস

হাদিস অর্থ কথা বা বাণী। ইসলামি পরিভাষায়, হাদিস বলতে মহানবি হয়রত মুহাম্মদ (স.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতিকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ (স.) যা বলেছেন, যা করেছেন, যা অনুমোদন দিয়েছেন এবং সাহাবিদের যে সমস্ত কাজ ও কথার প্রতি সমর্থন দিয়েছেন, তা সবই হাদিস। হাদিসের দুটি অংশ: একটি সনদ (**سَنَد**) ও অপরটি মতন (**مَعْنَى**)। হাদিসের রাবি পরম্পরাকে সনদ বলা হয়। যিনি হাদিস বর্ণনা করেন তাঁকে বলা হয় রাবি বা বর্ণনাকারী। হাদিস বর্ণনায় হাদিসের রাবিগণের পর্যায়ক্রমিক উল্লেখ বা বর্ণনা পরম্পরাই সনদ (**سَنَد**)। আর হাদিসের মূল বক্তব্য বা মূল অংশকে বলা হয় মতন (**مَعْنَى**)। হাদিস শাস্ত্রে সনদ ও মতন উভয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রকারভেদ

মতন বা হাদিসের মূল বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে হাদিসকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

ক. কওলি (قُولِيٌّ), খ. ফিলি (فِعْلِيٌّ) এবং গ. তাকরিরি (تَقْرِيرِيٌّ)

ক. কওলি হাদিস

রাসুলুল্লাহ (স.)-এর বাণীসূচক হাদিসকে কাওলি হাদিস বলা হয়। অর্থাৎ মহানবি (স.)-এর পরিত্র মুখনিঃস্ত বাণীকে কাওলি বা বাণীসূচক হাদিস বলে।

খ. ফিলি হাদিস

ফিলি শব্দের অর্থ কাজ সম্বন্ধীয়। যে হাদিসে মহানবি (স.)-এর কোনো কাজের বিবরণ স্থান পেয়েছে তাকে ফিলি বা কর্মসূচক হাদিস বলা হয়।

গ. তাকরিরি হাদিস

তাকরিরি অর্থ মৌন সম্মতি জ্ঞাপক। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর অনুমোদনসূচক হাদিসই হলো তাকরিরি হাদিস। অর্থাৎ সাহাবিগণ রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সামনে কোনো কথা বলেছেন কিংবা কোনো কাজ করেছেন কিন্তু রাসুলুল্লাহ (স.) তা নিজে করেননি এবং তাতে বাধাও দেননি বরং মৌনতা অবলম্বন করে তাতে সম্মতি বা অনুমোদন দিয়েছেন। এরপ অবস্থা বা বিষয়ের বর্ণনা যে হাদিসে এসেছে সে হাদিসকে তাকরিরি বা সম্মতিসূচক হাদিস বলা হয়।

সনদ বা রাবির পরম্পরার দিক থেকে হাদিস আবার তিন প্রকার। যথা- (ক) মারফু (المَرْفُوعُ),
(খ) মাওকুফ (المَوْقُوفُ) ও (গ) মাকতু (المَقْطُوعُ)।

ক. মারফু হাদিস

যে হাদিসের সনদ রাসুলুল্লাহ (স.) পর্যন্ত পৌছেছে তাকে মারফু হাদিস বলা হয়।

খ. মাওকুফ হাদিস

যে হাদিসের সনদ সাহাবি পর্যন্ত পৌছে শেষ হয়ে গেছে, রাসুলুল্লাহ (স.) পর্যন্ত পৌছেনি এরপ হাদিসকে মাওকুফ হাদিস বলে।

গ. মাকতু হাদিস

যে হাদিসের সনদ তাবিঙ্গ পর্যন্ত পৌছেছে তাকে মাকতু হাদিস বলে। অন্যকথায়, যে হাদিসে কোনো তাবিঙ্গের বাণী, কাজ ও মৌন সম্মতি বর্ণিত হয়েছে তাকে মাকতু হাদিস বলা হয়।

প্রকৃতপক্ষে, শরিয়তে আরও বহু প্রকারের হাদিস দেখা যায়। আমরা পরবর্তীতে এগুলো সম্পর্কে জানব।

হাদিসের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকার হলো হাদিসে কুদসি। কুদস শব্দের অর্থ পরিত্র। এ প্রকার হাদিস সরাসরি আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পৃক্ত। ইসলামি পরিভাষায়, যে হাদিসের শব্দ ও ভাষা রাসুলুল্লাহ (স.)-এর নিজস্ব, কিন্তু তার অর্থ, ভাব ও মূলকথা আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে ইলহাম বা স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত, তাকে

হাদিসে কুদসি বলে। সংক্ষেপে, যে হাদিসের মূল কথা আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং মহানবি (স.) নিজের ভাষায় তা উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন সেটাই হাদিসে কুদসি। হাদিসে কুদসির ভাব, অর্থ ও মূলকথা আল্লাহ তায়ালার হলেও তা আল-কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এটি হাদিস হিসেবে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

হাদিস সংরক্ষণ ও সংকলন

রাসুলুল্লাহ (স.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌল সম্মতিকে সাধারণভাবে হাদিস বলা হয়। সুতরাং রাসুলুল্লাহ (স.) থেকেই হাদিসের উৎপত্তি। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্ধশায় প্রথম দিকে হাদিস লিখে রাখা নিষেধ ছিল। কেননা তখন আল-কুরআন নাজিল হচ্ছিল। এ অবস্থায় মহানবি (স.)-এর হাদিস লিখে রাখলে তা আল-কুরআনের বাণীর সাথে সংমিশ্রণের আশঙ্কা ছিল। এ কারণে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্ধশায় ব্যাপকভাবে হাদিস লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা হয়নি।

তবে সাহাবিগণ মহানবি (স.)-এর বাণীসমূহ মুখস্থ রাখতেন। রাসুলুল্লাহ (স.) কোন সময় কী কাজ করতেন তা খেয়াল রাখতেন। আরবদের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। তাঁরা একবার যা স্মৃতিতে ধারণ করতেন কখনোই তা ভুলতেন না। ফলে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর প্রতিটি বাণী ও কাজ সাহাবিগণের স্মৃতিতে সংরক্ষিত হতো। রাসুলুল্লাহ (স.)ও স্বয়ং তাঁদের হাদিস মুখস্থ করার জন্য উৎসাহিত করতেন। তিনি বলেন, “আল্লাহ ঐ ব্যক্তির জীবন উজ্জ্বল করবেন, যে আমার কথা শনে তা মুখস্থ করল ও সঠিকরণে সংরক্ষণ করল এবং এমন ব্যক্তির নিকট পৌছে দিল যে তা শুনতে পায়নি।” (তাবারানি)। সাহাবিগণ রাসুল (স.)-এর কথা শনতেন, তা মনে রাখতেন এবং তা হ্রস্ব বন্ধুবাক্ব, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট পৌছে দিতেন। এভাবে রাসুলুল্লাহ (স.) এর জীবদ্ধশাতেই হাদিস সংরক্ষণ শুরু হয়।

তা ছাড়া লিখিত আকারেও সেসময় বেশ কিছু হাদিস সংরক্ষিত হয়। বহু সাহাবি রাসুলুল্লাহ (স.)-এর অনুমতিক্রমে ব্যক্তিগত উদ্যোগে হাদিস লিখে রাখতেন। এ প্রসঙ্গে হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.)-এর সহিফা ‘আস-সাদিকা’-এর কথা উল্লেখযোগ্য। এ সহিফাতে তিনি রাসুলুল্লাহ (স.)-এর বহুসংখ্যক হাদিস লিখে রেখেছিলেন। তা ছাড়া রাসুলুল্লাহ (স.)-এর চিঠিপত্র, সন্ধিপত্র-চুক্তিনামা, সনদ, ফরমান ইত্যাদি লিখিত আকারে সংরক্ষিত ছিল।

হাদিস সংকলনের ক্ষেত্রে উমাইয়া খিলিফা হ্যরত উমর ইবনে আব্দুল আয়িয (র.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনিই সর্বপ্রথম সরকারিভাবে হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনে নতুন গতি সম্ভব হয়। এরই ধারাবাহিকতায় হ্যরত ইমাম মালিক (র.) সর্বপ্রথম হাদিসের বিশুদ্ধ সংকলন তৈরি করেন। তাঁর এ গ্রন্থের নাম আল-মুয়াত্তা।

হিজরি তৃয় শতক ছিল হাদিস সংকলনের স্বর্ণযুগ। এ সময় হাদিসের বিশুদ্ধতম ছয়টি কিতাব সংকলিত হয়। এগুলোকে একত্রে সিহাহ বা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ বলা হয়। এ ছয়টি গ্রন্থ এবং এদের সংকলকগণের নাম :

২. সহিহ মুসলিম - ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজাজ আল-কুশাইরি (র.)
৩. সুনানে নাসাই - ইমাম আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে শুআইব আন-নাসাই (র.)
৪. সুনানে আবু দাউদ - ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আশআস (র.)
৫. জামি তিরমিয়ি - ইমাম আবু সিসা মুহাম্মদ ইবনে সিসা আত-তিরমিয়ি (র.)
৬. সুনানে ইবনে মাজাহ - ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাজাহ (র.)।

হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলাম শরিয়তে হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম। হাদিস হলো শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস। এটিও এক প্রকার ওহি। মহানবি (স.) আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনা প্রাপ্ত হয়েই মানুষকে নানা বিষয়ের নির্দেশনা প্রদান করতেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

অর্থ : আর তিনি নিজ প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেন না। তা তো ওহি, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয় (সূরা আন-নাজর, আয়াত ৩-৪)।

সুতরাং রাসুলুল্লাহ (স.)-এর বাণী ও কাজের অনুসরণ করা আবশ্যিক। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর আনুগত্য করলে প্রকারান্তরে আল্লাহ তায়ালারই আনুগত্য করা হয়। আল্লাহ তায়ালা এতে সন্তুষ্ট হন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “আপনি বলুন! তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য কর। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখুন, আল্লাহ তো কাফিরদের পছন্দ করেন না” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩২)।

আল-হাদিস পরিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ। আল্লাহ তায়ালা পরিত্র কুরআনে শরিয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান ও মূলনীতি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর নবি (স.)-এর দায়িত্ব ছিল এসব বিধি-বিধান স্পষ্টকরণে বর্ণনা করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “আর আমি আপনার প্রতি কুরআন নাজিল করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যা তাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে” (সূরা আন-নাহল, আয়াত ৪৪)।

রাসুলুল্লাহ (স.) কুরআনের বিধি-বিধানসমূহের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিতেন। অনেক ক্ষেত্রে নিজে আমল করার দ্বারা এসব বিধান হাতে-কলমে শিক্ষা দিতেন। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর এসব বাণী ও কর্মই হাদিস। সুতরাং কুরআনের বিধি-বিধান সুস্পষ্টকরণে অনুসরণের জন্য হাদিস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এজন্য আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَمَآ أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهِّكُمْ عَنْهُ فَإِنْ تَهْوَا

অর্থ : আর রাসুল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক (সূরা আল-হাশর, আয়াত ৭)।

আর রাসুলুল্লাহ (স.)-এর আদেশ-নিষেধ এর পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের জন্যও হাদিস জানা অত্যাবশ্যক। কেবল হাদিসের মাধ্যমেই আমরা এসব বিষয় জানতে পারি। মহানবি (স.) স্বয়ং হাদিসের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন,

تَرْكُتُ فِينِكُمْ أَمْرِيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكُتُمْ بِهَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنْنَةُ رَسُولِهِ -

অর্থ : আমি তোমাদের মধ্যে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এ দুটোকে আঁকড়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) এবং অপরটি তাঁর রাসুলের সুন্নাহ (মুয়াত্তা)।

প্রকৃতপক্ষে, কুরআন ও হাদিস ইসলামি শরিয়তের সর্বপ্রধান দুটি উৎস। এগুলো মানুষকে সত্য, ন্যায় ও শান্তির পথে পরিচালনা করে। এ দুটোর শিক্ষা ও আদর্শ ত্যাগ করলে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। সুতরাং মানবজীবনে আল-কুরআনের পাশাপাশি মহানবি (স.)-এর হাদিসের প্রয়োজনীয়তাও অনব্ধীকার্য।

কাজ : হাদিস অঙ্গীকার করলে কীভাবে কুরআন অমান্য করা হয়, শিক্ষার্থীরা তার ব্যাখ্যা করবে।

মহানবি (স.)-এর ১০টি হাদিস

পাঠ ১২

হাদিস ১

(নিয়ত সম্পর্কিত হাদিস)

শব্দার্থ

- | | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| إِيمَانٌ | - | প্রকৃতপক্ষে, বস্তুত, আসলে |
| الْأَعْمَالُ | - | আমলসমূহ, কর্মসমূহ |
| الْنِّيَاتُ | - | নিয়ত, সংকল্প, উদ্দেশ্য। |

إِيمَانٌ إِلَّاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ



অর্থ : প্রকৃতপক্ষে সকল কাজ (এর ফলাফল) নিয়তের উপর নির্ভরশীল (বুখারি)।

ব্যাখ্যা

এই হাদিসটি সহিত বুখারির সর্বপ্রথম হাদিস। এর তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক। মানুষের সকল কাজই নিয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট। নিয়ত বা উদ্দেশ্য ছাড়া মানুষ কোনো কাজই করে না। কাজের উদ্দেশ্যের গুরুত্ব এ হাদিস দ্বারা বুঝতে পারা যায়। সাথে সাথে কোন কাজের উদ্দেশ্য কেমন হওয়া উচিত তাও এ হাদিসের তাৎপর্য বিশ্লেষণে জানা যায়।

আল্লাহ তায়ালা পরকালে মানুষের সকল কৃতকর্মের হিসাব নেবেন। সেদিন তিনি মানুষের সকল কাজের নিয়ত বা উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন। মানুষ যদি সৎ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে তবে সে তার পুরুষার লাভ করবে। নেক নিয়তে কাজ করে ব্যর্থ হলেও সে তার জন্য পুরুষার পাবে। আর যদি মন্দ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে তবে সে শান্তি ভোগ করবে। এমনকি খারাপ উদ্দেশ্যে ইবাদত করলে কিংবা ভালো কাজ করলেও তাতে কোনো সাওয়াব হয় না। বরং নিয়ত সঠিক না হওয়ায় সে ভালো কাজও মন্দ হিসেবে পরিগণিত হয়।

উপরে বর্ণিত হাদিসটির শেষাংশে জানলে আমরা নিয়তের বিশয়টি আরও সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারব। এ হাদিসের শেষাংশে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নিয়তে (তাঁদের সন্তুষ্টি লাভের জন্য) হিজরত করে তবে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টি লাভ করবে। আর যদি সে পার্থিব লাভ বা কোনো স্ত্রীলোককে বিয়ে করার জন্য হিজরত করে তবে সে শুধু তাই লাভ করবে, যে জন্য সে হিজরত করেছে।

রাসুলুল্লাহ (স.) বিশেষ এক প্রেক্ষাপটে এ হাদিসটি বর্ণনা করেন। আর তা হলো- উম্মে কায়স নামক একজন মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় হিজরত করেন। তখন জনেক ব্যক্তি তাঁকে বিয়ে করার জন্য মদিনায় হিজরত করে চলে আসেন। এই ব্যক্তির উদ্দেশ্য জানতে পেরে নবি (স.) এ হাদিসটি বর্ণনা করেন। যার মূল বক্তব্য হলো- আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করা অত্যন্ত পুণ্যময় কাজ। আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত না থাকায় লোকটি হিজরতের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হলেন।

শিক্ষা

১. কাজের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে নিয়ত বলা হয়।
২. নিয়তের উপরেই কাজের সফলতা নির্ভর করে। অর্থাৎ নিয়ত যদি ভালো হয় তবে ব্যক্তি উভয় প্রতিদান লাভ করবে। আর নিয়ত যদি খারাপ হয় তবে ভালো কাজ করলেও ব্যক্তি সাওয়াব লাভ করবে না।
৩. আল্লাহ তায়ালা মানুষের বাহ্যিক আচলের সাথে সাথে অন্তরের অবস্থাও লক্ষ করেন।

সুতরাং সকল কাজেই আমরা নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখব। লোক দেখানোর জন্য বা পার্থিব কোনো লাভের আশায় সৎকর্ম করব না, বরং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করব।

কাজ : ক. শিক্ষার্থীরা নিয়ত সম্পর্কিত হাদিসটি আরবিতে মুখ্য বলবে।

খ. শিক্ষার্থীরা নিয়ত সম্পর্কিত হাদিসটি আরবিতে অর্থসহ লিখে একটি পোস্টার তৈরি করবে।

পাঠ ১৩

হাদিস ২

[ইসলামের ভিত্তি (ইমান, সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ) সম্পর্কিত হাদিস]

শব্দার্থ

يُبَنِي	- ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত	وَ	- এবং, ও, আর
عَلَىٰ	- উপর	إِقَامٍ	- কায়েম করা, প্রতিষ্ঠা করা
خَمْسٌ	- পাঁচ	الصَّلَاةُ	- সালাত, নামায
شَهَادَةٌ	- সাক্ষ্য দেওয়া, সাক্ষ্য	إِيمَانٌ	- প্রদান করা, আদায় করা
إِلَّا	- ব্যতীত, ছাড়া	الزَّكُورَةُ	- যাকাত
عَبْدُهُ	- তার বান্দা	صَوْمٌ	- সাওম, রোয়া
رَسُولُهُ	- তার রাসুল	رَمَضَانُ	- রময়ান মাস

**يُبَنِي الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيمَانِ
الزَّكُورَةِ وَالْحِجَّةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ**

অর্থ : ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাঝুদ নেই, মুহাম্মদ (স.) তার বান্দা ও রাসুল এবং সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হজ করা এবং রময়ানের রোয়া রাখা (বুধারি ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা

এই হাদিসে মহানবি (স.) ইসলামের পাঁচটি মূলভিত্তি একসাথে বর্ণনা করেছেন। এগুলো হলো ইমান, সালাত, যাকাত, হজ ও সাওম। এ পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত। এর কোনো একটিকে বাদ দিলে ইসলাম পরিপূর্ণ হয় না।

এই হাদিসে মহানবি (স.) উপরাং মাধ্যমে বিষয়টি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে, ইসলাম হলো একটা তাঁবু সদৃশ ঘর। ইমান হলো তাঁবুর মধ্যস্থিত মূল খুঁটি। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ মধ্যস্থিত খুঁটি ছাড়া তাঁবু দাঁড় করানো অসম্ভব। তাঁবুর বাকি চারটি খুঁটি ও গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হলো সালাত, যাকাত, হজ ও সাওম। সবগুলো খুঁটি ঠিক থাকলে তাঁবু ঠিকভাবে দণ্ডায়মান থাকে। এর কোনো একটি খুঁটি না থাকলে তাঁবু ভুলুষ্টি হয়। সুতরাং ইসলামের পূর্ণতার জন্য এ পাঁচটি ভিত্তির সবকটিই গুরুত্বপূর্ণ। একজন পূর্ণাঙ্গ মুসলিম ব্যক্তি এ পাঁচটি বিষয়ের প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপ করে থাকেন।

শিক্ষা

১. ইসলামের মূলভিত্তি পাঁচটি। এগুলো হলো- ইমান, সালাত, যাকাত, হজ ও সাওম।
২. ইমান হলো সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।
৩. ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষ্য দেওয়ার মাধ্যমে ইমানের প্রকাশ ঘটাতে হবে।
৪. অতঃপর অন্যান্য ভিত্তি যথা- সালাত, যাকাত, হজ ও সাওমের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে।
৫. এ পাঁচটি ভিত্তির একটি ছাড়াও ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

কাজ : শিক্ষার্থীরা পোস্টারে একটি ছবি এঁকে ইসলামের মূল তত্ত্বগুলো প্রদর্শন করবে।

পাঠ ১৪

হাদিস ৩

(দানশীলতা সম্পর্কিত হাদিস)

শব্দার্থ

يَوْمٌ	- দিন	اللَّهُمَّ	- হে আল্লাহ!
يُصْبِحُ	- সকালে উপনীত হয়	أَعْطِ	- তুমি দান কর
الْعِبَادُ	- বান্দাগণ	مُنْفِقًا	- খরচকারী, দানকারী
مَلَكَانِ	- দুজন ফেরেশতা	خَلْفًا	- প্রতিদান
يَنْزِلَاِنِ	- দুজন নাজিল হল, তারা দুজন অবতরণ করেন।	مُهْسِكًا	- আটককারী, কৃপণ
أَحْدُهُمْ	- তাদের মধ্যে একজন	ثَلَقًا	- ক্ষতি

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَاِنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ
الْأَخْرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُهْسِكًا ثَلَقًا -

অর্থ : বান্দাগণ প্রতিদিন সকালে উপনীত হলেই দুজন ফেরেশতা অবতরণ করেন। এঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দানকারীকে তুমি তার প্রতিদান দাও। আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! সম্পদ আটককারীকে (কৃপণকে) ক্ষতিগ্রস্ত কর (বুখারি ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা

মানবজীবনে অর্থের ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে এ হাদিসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে দানশীলতার পুরস্কার ও কৃপণতার কুফল সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য খরচ করা ও দানশীলতা অত্যন্ত পুণ্যময় কাজ। নানাভাবে একাজ করা যায়। সন্তুষ্ট চিন্তে নিজ পিতা-মাতা, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বাঙ্গবন্দের জন্য খরচ করাও একপ্রকার দানশীলতা। তাছাড়া গরিব, অভিযোগী, ইয়াতীম, দুঃস্থ, ফকির-মিসকিনকে সাহায্য করাও সকলের কর্তব্য। দান করার মাধ্যমে মানুষের ইমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বাহ্যিকভাবে এতে দেখা যায় যে, সম্পদ করে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে সম্পদ করে না। বরং আল্লাহ তায়ালা খুশি হয়ে দানশীলকে আরও প্রভূত পরিমাণে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। তার অবশিষ্ট সম্পদে বরকত হয়। আসমানের ফেরেশতা প্রতিদিন সকালে তার পক্ষে আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করেন।

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি সম্পদ খরচ না করে জমা করে রাখে সে কৃপণ। তার সম্পদ কোনো কাজে আসে না। এতে কোনোরূপ কল্যাণ ও বরকত নেই। আসমানের ফেরেশতাগণও তার প্রতি বদদোয়া করেন। এভাবে দুনিয়া ও আধিরাতে কৃপণ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শিক্ষা

১. দানশীলতা মহৎ গুণ।

২. দানশীল ব্যক্তির জন্য ফেরেশতাগণ দোয়া করে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা দানশীলকে উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

৩. কৃপণতা নিন্দনীয় কাজ। কৃপণ ব্যক্তি সর্বাবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতএব, আমরা দানশীল হব। গরিব, দুঃস্থী, অভিযোগীদের সাহায্য করব। নিজ পিতা-মাতা, ভাইবোনদের জন্য খরচ করব। এতে আল্লাহ তায়ালা খুশি হবেন এবং আমাদের উত্তম প্রতিদান দেবেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দানশীলতা সম্পর্কিত হাদিসটির শিক্ষা লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৫

হাদিস ৪

(বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত হাদিস)

শব্দার্থ

مُسْلِمٌ - মুসলিম, মুসলমান

يَغْرِسُ - রোপণ করে

مِنْهُ - তা থেকে

ظِلِّيْ - পাখি

غَرْسًا	- বৃক্ষ	إِنْسَانٌ	- মানুষ
يَرْعَ	- আবাদ করে, চাষ করে	بِهِيْمَةٌ	- চতুর্পদ জন্তু
رَعَا	- ফসল	إِلَّا	- ছাড়া, ব্যতীত
يَأْكُلُ	- ভক্ষণ করে, খায়	صَدَقَةٌ	- সদকা, দান

مَا مِنْ مُسْلِيمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَرْعَ عَزْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيْمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ -

অর্থ : কোনো মুসলমান যদি বৃক্ষরোপণ করে কিংবা কোনো ফসল আবাদ করে, এরপর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুর্পদ জন্তু কিছু ভক্ষণ করে তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে (বুখারি ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব বর্ণনায় হাদিসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ হাদিসে মহানবি (স.) আমাদের বৃক্ষরোপণ ও কৃষি কাজ সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

বৃক্ষরোপণ ও কৃষিকাজ মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এর দ্বারা মানুষ নানাভাবে উপকৃত হয়। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের অঘৃ, বন্ধ, বাসস্থান প্রয়োজন। বৃক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের সে অযোজন পূরণ করে। বৃক্ষ থেকে আমরা খাদ্য, ঔষধ, পোশাক, কাঠ, ফল ইত্যাদি লাভ করি। বৃক্ষ আমাদের আর্থিক সচলতাও প্রদান করে। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায়ও বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অক্সিজেনের সরবরাহ বৃক্ষ, জলবায়ুর উন্নতা রোধ, অতিরুষ্টি, অনাবৃষ্টি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বৃক্ষের অবদান অনন্বীক্ষ্য। আলোচ্য হাদিসে বৃক্ষরোপণের নির্দেশ দানের মাধ্যমে মহানবি (স.) আমাদের এসব নিয়ামত ও উপকার লাভের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

আমরা অনেকেই বৃক্ষরোপণ বা কৃষিকাজকে ছোট কাজ বলে স্থূল করি। কিন্তু অক্তপক্ষে কোনো কাজই ছোট নয়। সৎভাবে করা সকল কাজই উত্তম। বৃক্ষরোপণেও কোনো লজ্জা নেই। বরং এটি অনেক নেকির কাজ। স্বয়ং মহানবি (স.) আমাদের এ কাজে উৎসাহিত করেছেন।

বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে মানুষ পার্থিব লাভের পাশাপাশি পরকালীন কল্যাণও লাভ করতে পারে। কেননা পশ্চ-পাখি, জীব-জন্তু ও কৌট-পতঙ্গ বৃক্ষের ফল, ফেতের ফসল থেঁয়ে থাকে। এতে বৃক্ষরোপণকারী ও ফসল আবাদকারী সাওয়াব লাভ করে। এই ফল-ফসল সদকা করে দিলে যে সাওয়াব হতো, পশ্চপাখি বা মানুষের খাওয়ার ফলে আঙ্গুহ তায়ালা তার আমলনামায় সে পরিমাণ সাওয়াব লিখে দেন। ফলে সে নিজের অজান্তেই অনেক সাওয়াবের অধিকারী হয়ে যায়।

শিক্ষা

১. বৃক্ষরোপণ পুণ্যের কাজ।
২. বৃক্ষরোপণের দ্বারা মানুষ আর্থিকভাবে লাভবান হয়। পরিবেশ সংরক্ষিত থাকে। পাশাপাশি আধিরাতেও প্রতিদান পাওয়া যাবে।
৩. মহানবি (স.) আমাদের বৃক্ষরোপণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন।
৪. মানুষের উৎপাদিত ফল, ফসলে পশু-পাখি ও অন্য মানুষেরও হক রয়েছে।
৫. উৎপাদিত ফল, ফসল থেকে কোনো থাণী কিছু ভক্ষণ করলে তা বিনষ্ট হয় না। বরং তা সদকা হিসেবে আবাদকারীর আমলনামায় লেখা হয়।

কাজ : ক. শিক্ষার্থীরা বৃক্ষরোপণ সম্পর্কিত হাদিসটির শিক্ষা শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।
 খ. প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজ নিজ বাড়িতে একটি বৃক্ষরোপণ করে শিক্ষককে জানাবে।

পাঠ ১৬ হাদিস ৫

(সর্বোত্তম মানুষ সম্পর্কিত হাদিস)

শব্দার্থ

أَنِّيْكُمْ	- আমি তোমাদের খবর দেব	الَّذِينَ	- যারা
خَيَارِكُمْ	- তোমাদের মধ্যে উচ্চম	إِذَا	- যখন
قَالُوا	- তাঁরা বললেন	رُغْوًا	- দেখা হয়
بَلِّي	- হ্যাঁ	ذُكْرٌ	- স্মরণ হয়।

أَلَا أَنِّيْكُمْ بِخَيَارِكُمْ قَالُوا إِنَّمَا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ خَيَارِكُمْ الَّذِينَ إِذَا رُغْوًا ذَكَرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

অর্থ : রাসুলগ্লাহ (স.) বলেন, “আমি কি তোমাদের ভালো লোকদের সম্পর্কে অবহিত করব না? তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! হ্যাঁ, বলে দিন। তিনি বললেন— তোমাদের মধ্যে ভালো লোক তারা, যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় (ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা

এ হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) সবচেয়ে উত্তম মানুষের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। বক্তৃত সর্বোত্তম মানুষ হলেন তাঁরা, যাঁদের দেখলে আল্লাহ তায়ালার কথা স্মরণ হয়। ঐসব ব্যক্তি চল-চলন, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিছদে ইসলামের একান্ত অনুসারী। তাঁরা সদাসর্বদা আল্লাহ তায়ালার ধিকির ও প্রশংসায় লিঙ্গ থাকেন। এরপ লোকদের দেখলেই আল্লাহর স্মরণ এসে যায়। মানুষের মধ্যে এসব লোকই সর্বোত্তম।

সমাজে আমরা বহু লোকের সাথে চলাফেরা করি। তাদের সকলকে দেখলে আল্লাহ তায়ালার কথা স্মরণ হয় না। সুতরাং যাঁদের দেখলে আল্লাহ তায়ালার কথা স্মরণ হয়, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত। এতে তাঁদের অভাব আমাদের উপরও পড়বে। আমরাও তাদের ভালো কাজ দ্বারা অনুগ্রামিত হব। আমাদের চলাফেরা, উঠাবসা, আচার-আচরণ সুন্দর হবে। ফলে আমরাও উত্তম মানুষে পরিণত হতে পারব।

শিক্ষা

১. আল্লাহ তায়ালার স্মরণ সর্বোত্তম কাজ।
 ২. মানুষের মর্যাদা ধন-দৌলত, শিক্ষা বা ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল নয়। বরং দীন পালনের মাধ্যমেই মানুষের মর্যাদা নির্মিত হয়।
 ৩. যাঁদের দেখলে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ হয় তাঁরা সর্বোত্তম ব্যক্তি।
- আমরা দ্বিন্দার লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখব। তাঁদের মতো হতে চেষ্টা করব।

কাজ : কেন ভালো বন্ধু প্রয়োজন? এবং কীভাবে ভালো বন্ধু বোৰা যায়? শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে প্রথমে শিক্ষকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গল্প শুনবে; অতঃপর নিজ নিজ গল্প ও পরিকল্পনা খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৭

হাদিস ৬

(মানবপ্রেম ও সৃষ্টির সেবা সম্পর্কিত হাদিস)

শব্দার্থ

الْحُنْقُ	- সৃষ্টিজগৎ, মাখলুক, সমগ্র সৃষ্টি, সৃষ্টিকুল
عَيَّالٌ	- পরিজন, আপনজন
أَحْبَبٌ	- অধিক প্রিয়, সর্বাধিক প্রিয়

مَنْ	- যে
أَحْسَنَ	- অনুগ্রহ করে, সদাচরণ করে
إِلِيْ	- প্রতি, দিকে

الْحُنْقُ عَيَّالُ اللَّهُو أَحْبَبُ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عَيَّالِهِ

অর্থ : “সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন। সুতরাং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে তাঁর পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করে।” (বায়হাকি)

ব্যাখ্যা

আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর সৃষ্টি। তিনি হলেন খালিক। তিনি ব্যতীত যা কিছু আছে সবই তারই সৃষ্টি বা মাখলুক। মানুষ যেমন তার সৃষ্টি তেমনি কীটপতঙ্গও তার মাখলুক। বস্তুত জিন-ইনসান, আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, পশু-পাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, তরলতা, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সবই আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি।

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকল কিছুর লালনকর্তা, পালনকর্তা, রিয়িকদাতা ও নিয়ন্ত্রক। তিনি সকল সৃষ্টিকে এক রকম করে সৃষ্টি করেননি। এটা তার পরীক্ষা। তিনি সৃষ্টিকুলকে নানাভাবে ভাগ করেছেন এবং সকল কিছুকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। মানুষ হলো আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। সুতরাং মানুষের উচিত আল্লাহ তায়ালার সকল সৃষ্টির প্রতি সদাচরণ করা, সকল মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা। পশু-পাখি, জীব-জন্মের প্রতি অনুগ্রহ করা। এদের প্রতি অনুগ্রহ করলে আল্লাহ তায়ালা খুশি হন। যাঁরা আল্লাহ তায়ালার এসব সৃষ্টির প্রতি সদয় আচরণ করেন তাঁরা মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দা। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের ভালোবাসেন।

শিক্ষা

১. সকল সৃষ্টি আল্লাহ তায়ালার পরিজন স্বরূপ।
২. এদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন ও সদাচরণ করা ইসলামের আদর্শ।
৩. জীবজন্ম, পশু-পাখির প্রতি দয়া প্রদর্শন করলে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন।
৪. সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ করার দ্বারা মানুষ আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা হতে পারে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে মানবপ্রেম ও সৃষ্টির সেবা সম্পর্কিত হাদিসটির শিক্ষা পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১৮ হাদিস ৭ (পরোপকার সম্পর্কিত হাদিস)

শব্দার্থ

أَخْ -	ভাই	حَاجَةٌ -	প্রয়োজন
لَا يُظْلِمْهُ -	সে তার প্রতি অত্যাচার করে না	أَخْيُوهُ -	তার ভাই
لَا يُسْلِمْهُ -	তাকে সোপন্দ করে না		

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ

অর্থ : এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার ভাইয়ের উপর অত্যাচার করে না, তাকে শক্তির হাতে সোগর্দ করে না। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন (বুখারি ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা

মুসলমানগণ পরম্পর ভাই ভাই। তারা সকলে একই আদর্শে বিশ্বাসী, একই জীবনাদর্শের অনুসারী। ফলে পৃথিবীর যে স্থানেই কোনো মুসলমান থাকুক না কেন সকলেই ইসলামি আত্মত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। এতে দেশ, কাল, জাতি, বর্ণ ইত্যাদির কোনো ভেদাভেদ নেই। ধর্মী-গরিব, সাদা-কালো, আরব-অনারব সকল মুসলমানই পরম্পর ভাই-ভাই। সুতরাং এক মুসলমানকে অন্য মুসলমানের প্রতি বেশকিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন- কোনো মুসলমান ভাইয়ের প্রতি কোনোরূপ অন্যায়-অত্যাচার করা যাবে না ও জুলুম-নির্যাতন করা যাবে না। বরং সর্বাবহুয় তার সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। তার জান, মাল, ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করতে হবে। শক্তির মোকাবিলায় তাকে সাহায্য করতে হবে। তার শক্তিকে সাহায্য করা যাবে না। ছোট-বড় যেকোনো প্রয়োজনে অপর মুসলমান ভাইকে সাধ্যমতো সাহায্য করতে হবে। সামর্থ্য থাকলে ধন-সম্পদ ব্যয় করে তার সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় বুদ্ধি পরামর্শ ও সৎ উপদেশের মাধ্যমে সাহায্য করতে হবে। এমনকি প্রয়োজনে দৈহিক পরিশ্রমের মাধ্যমেও তাকে সাহায্য করতে হবে।

বস্তুত নিজের সামর্থ্যানুযায়ী আন্তরিকভাবে অপর মুসলমান ভাইয়ের বিপদে এগিয়ে আসতে হবে। এতে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন। তিনি স্বয়ং সাহায্যকারীকে সাহায্য করেন। তার সকল প্রয়োজন পূরণ করে দেন।

শিক্ষা

১. মুসলমানগণ পরম্পর ভাই-ভাই।
২. তারা পরম্পর অন্যায় অত্যাচার করবে না।
৩. শক্তির মোকাবিলায় সকলে একত্রে এগিয়ে আসবে।
৪. বিপদে আপদে পরম্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে।
৫. সাহায্যকারী মুসলিম আল্লাহ তায়ালা নিকট প্রিয়। আল্লাহ তায়ালা তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা পরোপকার বিষয়ক হাদিসটির অনুবাদ ও শিক্ষা লিখে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৯

হাদিস ৮

(ব্যবসায়ে সততা সম্পর্কিত হাদিস)

শব্দার্থ

الثَّاجِرُ	- ব্যবসায়ী, বণিক	الشَّهَدَاءُ	- শহিদগণ, শাহাদাত লাভকারীগণ
الْأَمِينُ	- বিশ্঵ন্ত	مَعَ	- সঙ্গে, সাথে
الصَّدُوقُ	- সত্যবাদী	يَوْمَ	- দিবস, দিন

الثَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشَّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ : বিশ্বন্ত, সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহিদগণের সঙ্গে থাকবেন (ইবনু মাজাহ)।

ব্যাখ্যা

ব্যবসায়-বাণিজ্য একটি পবিত্র পেশা। আমাদের প্রিয়নবি (স.)ও ব্যবসা করেছেন। সৎ ও বিশ্বন্ত ব্যবসায়ী দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন বিশ্বন্ত ও সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ীগণ শহিদগণের সঙ্গে অবস্থান করবেন। সেদিন তাঁদের কোনো ভয় ও চিন্তা থাকবে না। বরং তাঁরা সেদিন আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ লাভ করে ধন্য হবেন। শহিদগণ হলেন ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তি। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা তাঁদের জন্য জাল্লাতের ঘোষণা প্রদান করেছেন। সৎ ব্যবসায়ীগণও কিয়ামতের দিন শহিদগণের সঙ্গী হবেন। তাঁরাও শহিদগণের ন্যায় জাল্লাতে প্রবেশ করবেন।

তবে এজন্য ব্যবসায়ীদের দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে। প্রথমত, সততা ও সত্যবাদিতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাদেরকে বিশ্বন্ত ও আমানতদার হতে হবে। অর্থাৎ সততা ও বিশ্বন্ততার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করলে কিয়ামতের দিন মহাপুরুষ্কার লাভ করা যাবে। অন্যদিকে, ব্যবসায় প্রত্যাগ করলে, মিথ্যা বললে এ কল্পাণ লাভ করা যাবে না। সুতরাং ব্যবসা ক্ষেত্রে সকল প্রকার অন্যায় ও খারাপ কাজ ত্যাগ করতে হবে। লোভ-লালসা পরিত্যাগ করতে হবে। ওজনে কম দেওয়া, খারাপ দ্রব্য ভালো বলে বিক্রি করা, ভেজাল মেশালো, পণ্ডের দোষক্রটি গোপন করা, মজুদদারি, কালোবাজারি প্রভৃতি অনৈতিক কাজ করা যাবে না। বরং সর্বাবস্থায় সততা ও বিশ্বন্ততার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে। তাহলেই কিয়ামতে শহিদগণের সঙ্গী হওয়ার মহান মর্যাদা লাভ করা যাবে।

শিক্ষা

১. ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল পেশা। তবে তা ইসলামি নীতি আদর্শের অনুসরণে করতে হবে।
২. ব্যবসায়ে সততা ও বিশ্বস্ততা মহৎ গুণ। সকলকেই এগুলোর অনুশীলন করতে হবে।
৩. বিশ্বস্ত ও সৎ ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহিদগণের সঙ্গী হবেন।

কাজ : কী কী কারণে আমাদের দেশে ব্যবসায়ের সততা নষ্ট হচ্ছে? শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে দলগতভাবে আলোচনা করে ১০টি কারণ চিহ্নিত করবে।

পাঠ ২০ হাদিস ৯

(ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কিত হাদিস)

শব্দার্থ

عَجَبًا	- বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক	صَرَّهُ	- দুঃখ-কষ্ট, বিপদ
الْمُؤْمِنُ	- মুমিন, ইমানদার	صَبَرَ	- ধৈর্যধারণ করে
أَمْرَةٌ	- তার কাজ	سَرَّأَمُ	- খুশি, আনন্দ
خَيْرٌ	- কল্যাণ, ভালো	شَكَرَ	- শুকরিয়া আদায় করে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে
إِلَّا	- ব্যতীত, ছাড়া	لَهُ	- তার জন্য
أَصَابَتْهُ	- তার নিকট পৌছায়		

عَجَبًا لِّأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَةً كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لَا حِلٌّ لِّالْمُؤْمِنِ إِنَّ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ -

অর্থ : মুমিনের কাজ বিস্ময়কর। আর প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আর এ কল্যাণ মুমিন ছাড়া আর কেউ লাভ করতে পারে না। যদি সে সুখ-শান্তি লাভ করে, তবে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এটা তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি সে দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয় তবে সে ধৈর্যধারণ করে। এটা ও তার জন্য কল্যাণকর (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা

এ হাদিসে মানবজীবনের নানা অবস্থায় কিরূপ আচরণ করতে হবে সে সম্পর্কে সুন্দর দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মানবজীবনে সুখ-শান্তির পাশাপাশি দুঃখ-কষ্টও বিদ্যমান। এগুলো আল্লাহ তায়ালার পরীক্ষা স্বরূপ। আল্লাহ তায়ালা সুখ ও দুঃখের মাধ্যমে মানুষের পরীক্ষা করে থাকেন। মানুষের উচিত সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর হৃকুম পালন করা। প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি এরূপ করে থাকেন। ফলে সকল অবস্থাই তার জন্য কল্যাণকর। কেননা দুঃখ কষ্টে নিপত্তি হলে মুমিন ব্যক্তি হতাশ হয়ে পড়েন না। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য অন্যায় কাজ করেন না। বরং এ অবস্থাতেও তিনি আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালন করেন ও ধৈর্যসহকারে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করেন। এতে আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। তাকে সাওয়াব দান করেন এবং দুঃখ-কষ্ট থেকে উদ্ধার করেন। ফলে দুঃখ-কষ্টের অবস্থাও মুমিন ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়।

আর সুখ-শান্তির অবস্থাতেও মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে যান না। বরং তিনি সুখ-শান্তি ও নিয়ামতের জন্য আল্লাহ তায়ালার শোকর করেন। তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করেন। ফলে আল্লাহ তায়ালা তার উপর খুশি হন ও তাঁর নিয়ামতসমূহ আরও বাড়িয়ে দেন। ফলে এ অবস্থায় মুমিন ব্যক্তি সর্বাধিক কল্যাণ লাভ করেন।

শিক্ষা

১. সুখ-দুঃখ মানবজীবনের স্বাভাবিক বিষয়।

২. দুঃখ-কষ্টের সময় হতাশ হওয়া চলবে না। বরং ধৈর্যসহকারে আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালন করতে হবে।

৩. আনন্দের সময়ও আল্লাহ তায়ালার আদেশ ভুলে গেলে চলবে না। বরং তার শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

৪. এভাবে সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় শোকর ও সবরের মাধ্যমে কল্যাণ লাভ করা যায়।

৫. মুমিন ব্যক্তির সকল কাজই কল্যাণজনক। কেননা, মুমিন ব্যক্তি সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালন করেন। কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ বিমুখ হন না। ফলে সবর ও শোকরের মাধ্যমে তিনি সর্বোচ্চ কল্যাণ লাভ করেন। প্রকৃত মুমিন হতে হলে আমাদেরকে সদা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালনে সচেষ্ট হতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কিত হাদিসটির অনুবাদ ও শিক্ষা লিখে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ২১

হাদিস ১০

(যিকির সম্পর্কিত হাদিস)

শব্দার্থ

كَلِمَاتٍ	- দুটি বাক্য	ثَقِيلَاتٍ	- খুবই ভারী
حَبِيبَاتٍ	- খুবই প্রিয়	أَلْبِيزَانِ	- দাঁড়িগাল্লায়
الرَّحْمَنِ	- দয়াময়	سُبْحَانَ	- মহা পবিত্র
خَفِيفَاتٍ	- খুবই সহজ	كَمِدَه	- তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা
اللِّسَانِ	- জিহ্বা	الْعَظِيمُ	- মহামহিম

**كَلِمَاتٍ حَبِيبَاتٍ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَاتٍ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَاتٍ فِي الْبِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهُ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهُ
الْعَظِيمُ.**

অর্থ : দুটি বাক্য এমন রয়েছে যা দয়াময় আল্লাহর নিকট খুবই প্রিয়, উচ্চারণ করতে সহজ ও দাঁড়িগাল্লায় খুবই ভারী। বাক্য দুটি হলো “সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযিম” (আল্লাহ মহাপবিত্র, সকল প্রশংসা তাঁর জন্যই। মহাপবিত্র আল্লাহ, তিনি মহামহিম) (বুখারি)।

ব্যাখ্যা

এ হাদিসে মহানবি (স.) উম্মাতকে দুটি অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন। এগুলো হলো :

প্রথম বাক্য : সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি

দ্বিতীয় বাক্য : সুবহানাল্লাহিল আযিম

রাসুলুল্লাহ (স.) ছিলেন উম্মাতের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকামী। এজন্য তিনি আমাদের অতীব বরকতময় এ দুটি যিকির শিক্ষা দিয়েছেন এবং এর ফজিলতও বর্ণনা করেছেন।

প্রথমত, এ বাক্যদ্বয় আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয়। কেননা এতে মহান আল্লাহর পবিত্রতা, মহিমা ও প্রশংসা বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আমরা বাংলাভাষী। আরবি আমাদের মাতৃভাষা নয়। তথাপি এ বাক্যদ্বয় খুবই সুন্দর ও সাবলীল। আমরা খুব সহজেই এগুলো উচ্চারণ করতে পারি, মুখস্থ করতে পারি। এগুলো উচ্চারণে কোনোরূপ জিহ্বার আড়ষ্টতা সৃষ্টি হয় না, কোনোরূপ কষ্ট হয় না। বস্তুত এ দুটো সহজ সরল ও সুন্দর বাক্য।

ত্রৃতীয়ত, এ বাক্যদ্বয় মিয়ানে বা দাঁড়িপাল্লায় খুবই ভারী হবে। কিয়ামতের দিন মানুষের সকল কৃতকর্ম দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হবে। নেকির পাল্লা ভারী হলে মানুষ জাল্লাতে প্রবেশ করবে। আর নেকির পাল্লা হালকা হলে তার স্থান হবে জাহান্নাম। এ বাক্যদ্বয়ের সাওয়াব ওজনে খুবই ভারী। মিয়ানে এগুলো নেকির ওজনকে ভারী করে তুলবে।

অতএব, আমরা এ বাক্য দুটো মুখস্থ করব এবং সব সময় পাঠ করব। ফলে মহামহিম ও মহাপবিত্র আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন এবং অধিক পরিমাণ প্রতিদান দেবেন।

শিক্ষা

১. আল্লাহ তায়ালা মহাপবিত্র, মহামহিম। তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করলে তিনি খুশি হন।
২. সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযিম- আল্লাহ তায়ালার প্রিয় দুটি বাক্য। আমরা সদা সর্বদা এ বাক্যদ্বয়ের যিকির করব।
৩. হাশরের দিন মিয়ানে এ বাক্যদ্বয় খুবই ভারী হবে। ফলে এর পাঠকারী সফলতা লাভ করবে।

কাজ : প্রত্যেক শিক্ষার্থী হাদিসটি অনুবাদসহ মুখস্থ শোনাবে।

পাঠ ২২

শরিয়তের তৃতীয় উৎস : আল-ইজমা (المَصْدُرُ الثَّالِثُ لِلتَّشْرِيعِ: الْإِجْمَاعُ)

পরিচয়

শরিয়তের তৃতীয় উৎস হলো ইজমা। ইজমা আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ- একমত হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া, মতেক্য প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। ব্যবহারিক অর্থে কোনো বিষয় বা কথায় ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলে। ইসলামি পরিভাষায়, শরিয়তের কোনো বিষয়ে একই যুগের মুসলিম উম্মতের পুণ্যবান মুজতাহিদগণের (গবেষক) ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়। ইজমা মহানবি (স.)-এর পরবর্তী যেকোনো যুগে হতে পারে। সাহাবিগণ থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি যুগেই ইজমা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ইজমা কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত হওয়া আবশ্যিক। কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতি বিরোধী কিংবা কোনো অন্যায় ও পাপ কাজে ইজমা হয় না। ইজমা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত মুসলমানদের জন্য এক বিশেষ মর্যাদা ও নিয়ামত।

ইজমার উৎপত্তি

ইজমা বা একমত্যের ভিত্তিতে কোনো সমস্যার সমাধান করা কিংবা নতুন বিধান প্রবর্তন করা কোনো নতুন ঘটনা নয়। বরং রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সময় হতেই এর ব্যবহার বা প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। রাসুলুল্লাহ (স.) স্বয়ং বিভিন্ন বিষয়ে সাহাবিগণের পরামর্শ নিতেন। অতঃপর তাঁদের মতামতের আলোকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন- **وَأَمْرُ هُنْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ**

অর্থ : “আর তাদের কাজকর্ম সম্পাদিত হয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে।” (সূরা আশ-গুরা, আয়াত ৩৮)

এভাবেই রাসুলুল্লাহ (স.) ইজমার বৈধতা, দৃষ্টিক্ষণ ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে সাহাবিগণের যুগে এর পূর্ণাঙ্গ প্রচলন ঘটে। খলিফাগণ নতুন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে সর্বপ্রথম আল-কুরআনে এর সমাধান খুঁজতেন। তাতে খুঁজে না পেলে মহানবি (স.)-এর হাদিসের মাধ্যমে সমাধান করতেন। আর যদি হাদিসেও সে সমস্যার সুস্পষ্ট কোনো সমাধান না পেতেন তখন তাঁরা বিশিষ্ট সাহাবিগণের মতামত নিয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমাধান দিতেন। যেমন- হ্যরত আবু বকর (রা.)-এর সময়ে সাহাবিগণের ঐকমত্যের মাধ্যমেই কুরআন সংকলনের কাজ শুরু করা হয়। দ্বিতীয় খলিফা হ্যরত উমর (রা.)-এর সময়ে বিশ রাকআত তারাবি-এর সালাত জামাআতের সাথে আদায় করার ব্যাপারে সাহাবিগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে পরবর্তী যুগগুলোতেও ইজমার মাধ্যমে নানা সমস্যার সুস্থ সমাধান করা হয়েছে।

ইজমার হৃকুম ও কার্যকারিতা

ইজমা শরিয়তের তৃতীয় উৎস। বিধি-বিধান নির্ধারণে ইজমা অকাট্য দলিল হিসেবে সাব্যস্ত। সাধারণভাবে ইজমার ভিত্তিতে অণীত বিধানের উপর আমল করা ওয়াজিব।

ইজমার গুরুত্ব ও বৈধতা

ইসলামি শরিয়তে ইজমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল-কুরআন ও হাদিসের পরই এর স্থান। এটি শরিয়তের তৃতীয় উৎস ও অকাট্য দলিল। আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিস দ্বারা ইজমার বৈধতা প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

كُنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ

অর্থ : তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০)।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ

অর্থ : আর এভাবে আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষ্যদাতা হতে পার (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৪৩)।

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ে উম্মতে মুহাম্মদি তথা মুসলিম জাতিকে শ্রেষ্ঠ ও মধ্যপন্থী উম্মত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইজমার পরোক্ষ দলিল স্বরূপ।

মুসলিম মুজতাহিদগণ একমত হয়ে কোনো বিষয়ে ফয়সালা করলে তার বিরোধিতা করা চরম পাপ। আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেন-

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فُوْلَهُ مَا تَوَلَّ وَنَصِّلَهُ جَهَنَّمُ

অর্থ : আর সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পরও কেউ যদি রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনগণের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, তবে আমি তাকে ঐ দিকেই ফিরিয়ে দেব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিষ্কেপ করব (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১১৫)।

উক্ত আয়াতে মুমিনদের অনুসৃত পথ বলতে মুসলিমদের একমত্য বা ইজমা এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আমাদের প্রিয়নবি (স.) বলেছেন-

مَارَأُوا الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

অর্থ : মুসলমানগণ যা ভালো বলে মনে করে তা আল্লাহ তায়ালার নিকটও ভালো (তাৰামানি)।

এ হাদিস দ্বারাও ইজমা তথা মুসলমানদের একমত্যের গুরুত্ব প্রমাণিত।

মহানবি (স.) বলেছেন, “আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতকে নিশ্চয়ই গোমরাহির উপর জমায়েত করবেন না। আল্লাহর হাত (রহমত ও সাহায্য) দলবদ্ধ থাকার উপর রয়েছে। যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে (অবশেষে) দোষখে যাবে” (তিরনিয়ি)

ইজমা শরিয়তের অন্যতম দলিল। এর বৈধতা কুরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এর বিধানের উপর আমল করা আবশ্যিক।

কাজ : শিক্ষকের নির্দেশনায় শিক্ষার্থীরা ইজমা সম্পর্কিত কুরআন ও হাদিসের ৪টি উদ্ভৃতি শিক্ষার্থীরা উল্লেখ করবে।

পাঠ ২৩

শরিয়তের চতুর্থ উৎস : আল-কিয়াস

(المَصْدُرُ الرَّابعُ لِلتَّشْرِيعِ: الْقِيَاسُ)

পরিচয়

শরিয়তের চতুর্থ উৎস হলো কিয়াস। কিয়াস শব্দের অর্থ অনুমান করা, তুলনা করা, পরিমাপ করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, কুরআন ও সুন্নাহর আইন বা নীতির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে পরবর্তীতে উদ্ভৃত সমস্যার সমাধান দেওয়াকে কিয়াস বলে। অন্য কথায়, কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমাতে যে সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় না, ইসলামি মূলনীতি অনুযায়ী বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে সে সমস্যার সমাধান করাই হলো কিয়াস।

কিয়াসের গুরুত্ব

কিয়াস ইসলামি শরিয়তের অন্যতম উৎস। ইজমার পরই এর স্থান। ইসলামি শরিয়তের পূর্ণাঙ্গতার জন্য কিয়াসের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মানবজীবন ও সমাজ সতত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তন ও বিবর্তনের ধারায় জগতে নতুন নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নোব্য ঘটে। ফলে নতুন নতুন জিজ্ঞাসা, সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ সমস্ত সমস্যার সমাধান সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকেই করতে হয়। ইসলাম অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে এসব সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। কেননা, ইসলাম একটি গতিশীল জীবনব্যবস্থা। এটি পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনীন জীবন-বিধান। কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের জন্য পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা এতে দেওয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদিসে শরিয়তের বিষয়গুলো এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেন এগুলোর দ্রষ্টান্ত অনুসরণ করে সর্বযুগে সর্বকালে সমস্ত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়। আর এ পদ্ধতির নামই কিয়াস। সুতরাং শরিয়তের পূর্ণাঙ্গতার জন্য কিয়াস অপরিহার্য।

আল-কুরআন ও হাদিসে কিয়াসকে শরিয়তের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন— ۝يَأُولِي الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِرُو۝

অর্থ : আতএব হে চক্ষুশূন্যানগণ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর (সূরা আল-হাশর, আয়াত ২)।

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের চিন্তা ও গবেষণা করে শিক্ষা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর কিয়াস মুসলিম জ্ঞানীদের চিন্তা-ভাবনারই ফল।

কিয়াস শরিয়তের সর্বনিম্ন স্তর। যখন কোনো বিষয়ে আল-কুরআন, হাদিস ও ইজমায় পরিক্ষারভাবে সমাধান পাওয়া যায় না তখনই কিয়াস প্রযোজ্য হয়। রাসুলুল্লাহ (স.) সাহাবিগণকে কিয়াস করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মহানবি (স.) যখন হ্যরত মুআব ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেনের বিচারক হিসেবে প্রেরণ করেন তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘যখন কোনো সমস্যার উত্তর হবে তখন তুমি কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে?’ হ্যরত মুআব (রা.) বললেন, আল্লাহর কিতাব অনুসারে। রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, ‘যদি আল্লাহর কিতাবে তা না পাও, তবে?’ তিনি বললেন, তাহলে নবির সুন্নাহ মোতাবেক। রাসুল (স.) পুনরায় বললেন, ‘যদি তাতেও না পাও, তাহলে?’ হ্যরত মুআব (রা.) বললেন, তা হলে আমি আমার বিবেক বৃদ্ধি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত প্রদান করব। তাঁর উত্তর শুনে নবি (স.) বললেন, “সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর রাসুলের দৃত দ্বারা এমন উত্তর প্রদান করালেন যাতে তাঁর রাসুল সম্মত হলেন” (আবু দাউদ)।

উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও রাসুলুল্লাহ (স.)-এর হাদিসে স্পষ্টভাবে কিয়াস বা গবেষণার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। সুতরাং কিয়াস যে শরিয়তের অন্যতম উৎস এ ব্যাপারে কোনো সদেহের অবকাশ নেই।

কিয়াসের নীতিমালা

রাসুলুল্লাহ (স.)-এর ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে কিয়াসের মাধ্যমে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করা হতো। পরবর্তী যুগে কিয়াসের ব্যবহার আরও ব্যাপক হয়ে ওঠে। তবে নিজের খেয়ালখুশি মতো স্বার্থপরভাবে কিয়াস করা বৈধ নয়। শরিয়তের ইমামগণ কিয়াস করার ব্যাপারে কতিপয় নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এগুলো হলো :

ক. যেসব বিষয়ের সমাধান কুরআন, হাদিস ও ইজমায় পাওয়া যায় সেসব বিষয়ে কিয়াস করা যাবে না।

খ. কিয়াস কখনোই কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার বিরোধী হবে না।

গ. কিয়াসের পদ্ধতি ও আইন মানুষের জ্ঞানের পরিসীমার মধ্যে থাকতে হবে।

ঘ. কুরআন, হাদিস ও ইজমা দ্বারা প্রবর্তিত আইনের মূলনীতি বিরোধী কোনো আইন তৈরি করা কিয়াসের আওতা বহির্ভূত।

প্রকৃতপক্ষে কিয়াস ইসলামি শরিয়তের একটি বিজ্ঞানসম্মত ও যৌক্তিক উৎস। কিয়াস ইসলামি আইনকে গতিশীল করেছে ও সর্বজনীনতা দান করেছে। এর মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বায়নের নতুন নতুন বিষয়ের বিধান দেওয়া সম্ভব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ‘কুরআন ও হাদিস থাকা সত্ত্বেও কিয়াসের প্রয়োজনীয়তা’ যুক্তিসহকারে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ২৪

শরিয়তের আহকাম সংক্রান্ত পরিভাষা

(مُصْطَلَحَاتُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ)

শরিয়ত হলো ইসলামি বিধি-বিধানের সমন্বিত রূপ। পরিভাষায় শরিয়ত বলতে এমন সুদৃঢ় সোজাপথকে বুঝায় যার দ্বারা তার অবলম্বনকারী ব্যক্তি হিদায়াত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মপদ্ধা লাভ করতে পারেন। আর আহকাম হলো বিধানাবলি।

প্রতিটি বিষয়েরই নিজস্ব কিছু পরিভাষা থাকে। ইসলামি শরিয়তেরও এরূপ বেশ কিছু পরিভাষা বিদ্যমান। এসব পরিভাষার মাধ্যমে শরিয়তের বিধানাবলির পর্যায়ক্রমিক গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। ইসলামি শরিয়তের আহকাম বা বিধানাবলি সংক্রান্ত পরিভাষাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহব, মুবাহ ইত্যাদি। এ পাঠে আমরা উল্লিখিত পরিভাষাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানব।

ফরজ

ফরজ (فُرْضٌ) অর্থ অবশ্য পালনীয়, অত্যাবশ্যক। শরিয়তের যেসব বিধান কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলিল দ্বারা অবশ্য কর্তব্য ও অলঙ্ঘনীয় বলে প্রমাণিত তাকে ফরজ বলা হয়।

ফরজ কাজ কোনো অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা যায় না। ফরজ অস্থীকার করলে ইমান থাকে না। আর এগুলো পালন না করলে কবিরা গুনাহ বা মারাত্মক পাপ হয়। ফরজ কাজ পালন না করলে আধিরাতে ভয়কর শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

ফরজ দুই প্রকার। যথা- ১. ফরজে আইন
২. ফরজে কিফায়া

১. ফরজে আইন

যে সকল ফরজ বিধান সকলের উপর পালন করা অত্যাবশ্যক তাকে ফরজে আইন বলে। অর্থাৎ যেসব ফরজ কাজ ব্যক্তিগতভাবে সকল মুসলমানকেই আদায় করতে হয় তা-ই ফরজে আইন। যেমন- দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা, রম্যান মাসে রোধা রাখা, এসব কাজ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিজে আদায় করতে হয়।

২. ফরজে কিফায়া

ফরজে কিফায়া হলো সামষ্টিকভাবে ফরজ কাজ। অর্থাৎ যেসব কাজ মুসলমানের উপর ফরজ, কিন্তু সমাজের কতিপয় মুসলমান যদি আদায় করে ফেলে তবে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যায়। কিছু লোকের আদায় করার দ্বারা সমাজের বাকি সবাই সে দায়িত্ব থেকে মুক্তি পায়। তবে যদি সমাজের কেউই আদায় না করে তবে সকলেই গুনাহগার হবে। যেমন- জানায়ার সালাত। কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে ঐ এলাকার সবার উপর তার জানায়ার সালাত আদায় করা ফরজ। এ পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের কতিপয় মুসলমান যদি তার জানায়ার সালাত আদায় করে ফেলে তবে সকলেই এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করবে। কিন্তু কেউই যদি মৃত্যুক্রিয় জানায়ার সালাত আদায় না করে তবে সকলেই ফরজ ত্যাগের কারণে গুনাহগার হবে।

ওয়াজিব

ওয়াজিব অর্থ : অবশ্য পালনীয়, কর্তব্য, অপরিহার্য ইত্যাদি। শরিয়তের এমন কিছু বিধান রয়েছে যা পালন করা কর্তব্য। তবে ফরজ নয়। এরূপ বিধানকে ওয়াজিব বলা হয়।

শরিয়তে ফরজের পরই ওয়াজিবের স্থান। এটি ফরজের কাছাকাছি। অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত না হলেও এটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। ওয়াজিব অঙ্গীকার করলে মানুষ কাফির হয় না। তবে সে বড় রকমের অপরাধী হিসেবে গণ্য হয়। ওয়াজিব কাজ আদায় না করলেও কঠিন পাপ হয়। এর জন্য আখিরাতে শান্তি পেতে হবে। ইসলামি শরিয়তে বহু ওয়াজিব কাজ রয়েছে। যেমন- দুই ঈদের সালাত, বিতরের সালাত ইত্যাদি। সালাত আদায়ের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু ওয়াজিব কাজ রয়েছে। যেমন- সূরা ফাতিহা পড়া, রকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো, সিজদাহর মধ্যে সোজা হয়ে বসা ইত্যাদি। সালাতের এসব ওয়াজিব কাজ বাদ পড়লে সিজদাহ সাহু দিতে হয়। নতুন সালাত শুরু হয় না। পুনরায় তা আদায় করতে হয়।

সুন্নত

সুন্নত অর্থ- পথ, পদ্ধা, রীতি, নিয়ম, পদ্ধতি ইত্যাদি। পরিভাষায় মহানবি (স.) থেকে যে সমস্ত কাজ ইসলামি শরিয়তের বিধান হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে সেগুলোকে বলা হয় সুন্নত। অর্থাৎ যে সকল কাজ মহানবি (স.) নিজে করেছেন বা যা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন কিংবা অনুমোদন করেছেন তাকে সুন্নত বলা হয়। সুন্নত দুই প্রকার। যথা-

১. সুন্নতে মুয়াকাদাহ
২. সুন্নতে যায়িদাহ।

১. সুন্নতে মুয়াকাদাহ

যে সকল কাজ মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) নিজে সর্বদাই পালন করতেন, অন্যদেরকে তা পালনের তাগিদ দিতেন তাকে সুন্নতে মুয়াকাদাহ বলে। যেমন- আযান ও ইকামত দেওয়া, ফজরের ফরজ

নামায়ের পূর্বে দুই রাকআত, যোহরের ফরজের পূর্বে চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরিব ও এশার ফরজের পর দুই রাকআত নামায আদায় করা সুন্নতে মুয়াক্তাদাহ।

সুন্নতে মুয়াক্তাদাহ ওয়াজিবের কাছাকাছি। এগুলো পালন করা কর্তব্য। ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলাবশত বিনা কারণে এগুলো পালন না করলে গুনাহ হয়।

২. সুন্নতে যায়িদাহ

সুন্নতে যায়িদাহ হলো অতিরিক্ত সুন্নত। পরিভাষায়, যে সকল কাজ নবি (স.) করেছেন বলে প্রমাণিত তবে তিনি সর্বদা তা পালন করতেন না, বরং কখনো করতেন আবার কখনো ছেড়ে দিতেন এসব কাজকে সুন্নতে যায়িদাহ বলা হয়। মহানবি (স.) এরূপ কাজ করার জন্য উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। তবে এ ব্যাপারে তিনি তাগিদ করেননি এবং তা না করলে গুনাহ হয় না। সুন্নতে যায়িদাহকে সুন্নতে গায়রে মুয়াক্তাদাহও বলা হয়। যেমন- আসর ও এশার ফরজের পূর্বে চার রাকআত সুন্নত নামায আদায় করা। সুন্নতে যায়িদাহ পালনে অনেক সাওয়াব অর্জন করা যায়।

মুস্তাহাব

মুস্তাহাব অর্থ পছন্দনীয়। যে সকল কাজের প্রতি রাসুলুল্লাহ (স.) উম্মতকে উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং তা করলে নেকি পাওয়া যাবে, কিন্তু না করলে গুনাহ হবে না সেসব কাজকে শরিয়তে মুস্তাহাব বলে।

ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত ব্যতীত অতিরিক্ত সবধরনের ইবাদত ও ভালো কাজই মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য। এ মুস্তাহাবকে নফল বা মানদুবও বলা হয়।

মুবাহ

যে সকল কাজ করলে কোনোরূপ সাওয়াব নেই, আবার না করলে কোনোরূপ গুনাহও হয় না এরূপ কাজকে মুবাহ বলা হয়। মানুষ ইচ্ছা করলে এরূপ কাজ করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে তা না-ও করতে পারে।

হালাল-হারাম

পার্থিব জীবন মানুষের জন্য পরীক্ষাগার। আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যই এ বিশ্঵জগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন-

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لِكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَوِيجًا

অর্থ : তিনিই সে সকল যিনি তোমাদের জন্য এ পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ২৯)।

আর এ সবকিছু সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো মানুষকে পরীক্ষা করা। এজন্য আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি বস্তুর কিছু কিছু হালাল করে দিয়েছেন আর কিছু কিছু বস্তুকে হারাম করে দিয়েছেন। যেসব বস্তু মানুষের জন্য সামগ্রিকভাবে কল্যাণকর সেগুলোকে হালাল করেছেন। আর যেসব বস্তু মানুষের জন্য অকল্যাণকর তা হারাম করে দিয়েছেন। অতঃপর নবি-রাসুলও আসমানি কিতাবের মাধ্যমে হালাল-হারামের পরিচয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। সুতরাং মানুষের উচিত হালালকে গ্রহণ করা ও যাবতীয় হারাম বস্তু ও কাজকে বর্জন করা। এ পাঠে হালাল ও হারাম সম্পর্কে আমরা জানতে চেষ্টা করব।

হালাল

হালাল অর্থ- বৈধ, সিদ্ধ, আইনানুগ বা অনুমোদিত বিষয়। এছাড়া পবিত্র, গ্রহণযোগ্য ইত্যাদি অর্থেও হালাল শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ইসলামি পরিভাষায় যে সকল বিষয়ের বৈধ হওয়া কুরআন-হাদিস দ্বারা পরিকল্পিত প্রমাণিত, শরিয়তে তাকে হালাল বলা হয়। হালাল কথা, কাজ বা বস্তু সবই হতে পারে। যেমন- যেসব বস্তু বা দ্রব্য ব্যবহার করা শরিয়তে বৈধ তা হালাল দ্রব্য হিসেবে পরিচিত। যেমন- গরুর

গোশত, চাল-ডাল, ফলমূল আহার করা, শালীন ও রুচিসম্মত পোশাক পরিধান করা ইত্যাদি। তেমনি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল (স.) যেসব কথা বা কাজের অনুমতি দিয়েছেন সেগুলো হালাল কাজ হিসেবে স্বীকৃত। যেমন- সত্য কথা বলা, সুন্নত সম্মত পছায় ব্যবসা-বাণিজ্য করা, মানুষের উপকার করা ইত্যাদি।

হারাম

হারাম হলো হালালের বিপরীত। হারাম অর্থ নিষিদ্ধ, মন্দ, অসংগত, অপবিত্র ইত্যাদি। পরিভাষায় যে সকল কাজ বা বস্তু কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশে অবশ্য পরিত্যাজ্য, বর্জনীয় তাকে হারাম বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল (স.) যেসব কাজ করতে বা যেসব বস্তু ব্যবহার করতে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন সেসব কাজ বা বস্তু মানুষের জন্য হারাম। যেমন সুদ, ঘৃষ, জুয়াখেলা, শূকরের গোশত খাওয়া, মদ পান করা ইত্যাদি হারাম।

হালাল-হারামের সংখ্যা

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে হালাল ও হারাম সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। মহানবি (স.) বলেছেন-

أَكُلُّ بَيْنِ وَالْحَرْمَ بَيْنِ -

অর্থ : হালাল বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত। আর হারাম সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত (বুখারি ও মুসলিম)।

পৃথিবীতে হালাল জিনিস বা বস্তু অগণিত। এর কোনো সীমা পরিসীমা নেই। এগুলো আল্লাহ তায়ালার নিয়ামত হিসেবে চিহ্নিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَإِنْ تَعْلَمُوا نَعْمَلَ اللَّهُ لَا تُحَضِّرُوهَا -

অর্থ : আর তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা করতে চাও তবে গুনে তা শেষ করতে পারবে না (সূরা ইবরাহিম, আয়াত ৩৪)।

শরিয়তের ভাষ্য অনুযায়ী আকিদা ও ইবাদত ব্যতীত প্রত্যেক বিষয় মুবাহ বা বৈধ। তবে এর বিপক্ষে কুরআন ও হাদিসে যদি কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায় তবে তা হারাম হবে। সুতরাং বোবা গেল যে, হালালের সংখ্যা অগণিত। আর হারাম বস্তুর সংখ্যা সীমিত।

এসব হালাল ও হারাম বিষয়গুলো চিনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কেননা হালালকে হারাম মনে করা ও হারাম বিষয়কে হালাল বলে বিশ্বাস করা কুফর। যেহেতু হারাম সীমিত সংখ্যক, সেহেতু নিম্নে বর্তমান সমাজে প্রচলিত কতিপয় হারাম বিষয় ও দ্রব্যের তালিকা উল্লেখ করা হলো :

১. মৃত জীবজন্তু খাওয়া (তবে মৃত মাছ খাওয়া হারাম নয়)।
২. রক্ত পান করা (তবে হালাল জন্তুর গোশতে লেগে থাকা রক্ত হারাম নয়)।
৩. মানুষের গোশত খাওয়া।
৪. শূকরের গোশত খাওয়া।
৫. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে উৎসর্গীকৃত কিংবা জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া।
৬. মদ্যপান করা।
৭. মাদকদ্রব্য যেমন- হেরোইন, ইয়াবা, ফেনসিডিল, গাঁজা, আফিম সেবন করা।
৮. গলা টিপে বা উঁচু থেকে ফেলে দিয়ে হত্যাকৃত পশুর গোশত খাওয়া।
৯. হিন্দু প্রাণী যেমন- বাঘ, সিংহ, ভালুক ইত্যাদির গোশত খাওয়া।
১০. বিষাক্ত ও ক্ষতিকর প্রাণীর গোশত খাওয়া। যেমন- সাপ, বিচু ইত্যাদি।

১১. যেসব প্রাণী ময়লা ও নাপাক দ্রব্য খেয়ে বাঁচে তাদের গোশত খাওয়া। যেমন- কাক, শকুন, কুকুর ইত্যাদি।
 ১২. গাধা, খচর, হাতি ইত্যাদির গোশত খাওয়া।
 ১৩. সুদ, ঘুষ ও জুয়ার মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ।
 ১৪. চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, প্রতারণার মাধ্যমে উপার্জিত দ্রব্য।
 ১৫. অবৈধ পণ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন।
 ১৬. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, মিথ্যা হলফ করা, গিবত, গালি-গালাজ করা।
 ১৭. সর্বোপরি অশ্লীল, অশালীল ও মানুষকে কষ্টদায়ক সকল দ্রব্য, কথা ও কাজ।
- প্রকৃতপক্ষে, কুরআন ও সুন্নতে নিমেধকৃত সকল বন্ধুই হারাম। এগুলো থেকে বেঁচে থাকা সকল মুমিনের অপরিহার্য কর্তব্য।

মানবজীবনে হালালের প্রভাব

আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর স্তুষ্টা। তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন কোনটা উপকারী ও কোনটা অপকারী। যেসব দ্রব্য ও বিষয় মানুষের জন্য কল্যাণকর আল্লাহ তায়ালা তা হালাল করে দিয়েছেন। তিনি বলেন-

يَعِيشُ الْمَوْلَى فِي الْأَرْضِ حَلَّاً ظَبِيبًا ز

অর্থ : হে মানবজাতি! তোমরা পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বন্ধ আহার কর (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৬৮)।

হালাল বন্ধ গ্রহণ করার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তায়ালার নিয়ামত গ্রহণ করে এবং সর্বোচ্চ কল্যাণ প্রাপ্ত হয়।

হালাল দ্রব্য মানুষকে ইবাদতে উৎসাহিত করে। মানুষ অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতে পারে। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

يَعِيشُ الرَّسُولُ كُلُّهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا

অর্থ : হে রাসুলগণ! তোমরা পবিত্র বন্ধ থেকে আহার কর এবং সৎকাজ কর (সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত ৫)।

হালাল ও পবিত্র দ্রব্য মানুষের দেহ ও মস্তিককে সুস্থ রাখে। অন্তরে নূর সৃষ্টি করে। ফলে মানুষ অন্যায় ও অসৎ চরিত্রকে ঘৃণা করতে থাকে। মানুষ সৎগুণাবলি সম্পন্ন হয়ে গড়ে ওঠে। বন্ধত হালাল খাদ্য মানুষের মধ্যে পবিত্র ভাব ও আত্মঙ্কির উদ্রেক করে। ফলে মানুষ দুনিয়া ও আধিবাসিতে প্রভৃত কল্যাণপ্রাপ্ত হয়।

মানবজীবনে হারামের প্রভাব

মানব জীবনে হারাম বন্ধ, কথা ও কাজের পরিণাম ও কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ। কোনো কোনো হারাম দ্রব্যের মধ্যে এমন উপাদান বিদ্যমান থাকে যা মানুষের মন, মস্তিক ও শরীরের জন্য চরম ক্ষতিকর। এগুলো অনেক সময় মানুষের মস্তিক বিকৃত করে। এমনকি অনেক মারাত্মক ও প্রাণনাশক রোগ সৃষ্টি করে। যেমন- মদ, গাঁজা, হেরোইন ইত্যাদি।

তা ছাড়া আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, হিন্দু প্রাণীর দেহে এমন সব জীবাণু আছে যা মানুষের দেহের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

হারাম কাজ মানবসমাজেও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। যেমন- সুদ, ঘুষ, জুয়া, লটারি ইত্যাদি। এতে সামাজিক পরিবেশ নষ্ট হয়, নৈতিক মানবিক মূল্যবোধ ধ্বন্দ্ব হয়, সমাজে বৈষম্য দেখা দেয়, অনেকে সর্বস্বান্ত ও দেউলিয়া হয়ে যায়। এমনকি অনেকে আত্মহত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

হারাম খাদ্যদ্রব্য মানুষের অঙ্গের বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। মানুষ অন্যায়, অশ্রীলতা ও অসংচরিতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মানুষ চরিত্রের সংগুণাবলি নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ ইবাদতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তার ইবাদত-দোয়া করুল হয় না। মহানবি (স.) বলেছেন, “কোনো ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করে আসে এবং অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে তার দুঃহাত তুলে আল্লাহর নিকট বলতে থাকে, হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! কিন্তু তার পানাহার হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম। সুতরাং এমতাবস্থায় তার দোয়া কীভাবে করুল হতে পারে?” (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (স.) অন্য হাদিসে বলেছেন- “যে শরীর হারামের মাধ্যমে গঠিত, তা জাহানামের ইঙ্কন হবে।” (আহমাদ, বায়হাকি ও দারিমি)

প্রকৃতপক্ষে, হারাম মানুষকে অকল্যাণ ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং আমরা সদা সর্বদা হারামের ব্যাপারে সতর্ক থাকব। সকল কথা, কাজ ও পানাহারে হালাল পছ্ন্য গ্রহণ করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শরিয়তের আহকাম সংক্রান্ত পরিভাষাগুলোর একটি তালিকা তৈরি করে শিক্ষককে দেখাবে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি

১. কে সর্বপ্রথম কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলন করেন?

- ক. হযরত আবু বকর (রা.)
- খ. হযরত উমর (রা.)
- গ. হযরত উসমান (রা.)
- ঘ. হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.)

২. মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্য কোনটি?

- ক. নিফাক ও মুনাফিকের বিবরণ
- খ. মুশরিক ও কাফিরদের বর্ণনা
- গ. তাওহিদ ও রিসালাতের আহবান
- ঘ. আয়াতসমূহ তুলনামূলক ছোট

৩. শরিয়ত মেনে চললে -

- i. পারিবারিক জীবন পরিশুল্ক হয়
- ii. সামাজিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়
- iii. কর্মবিমুখতা সৃষ্টি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

জনাব 'ক' একজন দরিদ্র রিকশাচালক। তার স্ত্রী জটিল কিডনী রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। চিকিৎসা করাতে গিয়ে 'ক'- এর জমানো টাকা শেষ হয়ে যায়। 'ক'এর ভাই 'খ' একজন ব্যবসায়ী। তিনি বড় ভাইয়ের কাছে স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য কিছু আর্থিক সহযোগিতা চান। জনাব 'খ' ধর্মকের সুরে বলেন, তার কাছে টাকা নেই। তিনি 'ক'-কে গালাগাল দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেন। এতে 'ক' কষ্ট পেলেও হতাশ না হয়ে রিকশা চালানোর পাশাপাশি একটি ছোট ব্যবসায় নিজেকে নিয়োজিত করেন।

৩. জনাব 'ক' এর কর্মকাণ্ডে কোন সুরার শিক্ষা লজ্জন হয়েছে?

- ক. সুরা আশ-শামস
- খ. সুরা আদ-দুহা
- গ. সুরা আল-ইনশিরাহ
- ঘ. সুরা আত-তীন

৪. জনাব 'খ'-এর কর্মকাণ্ডে যে সুরার শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে, তার ফলে-

- i. মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন
- ii. সামাজিক শৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে
- iii. রাসুলুল্লাহ (স.)- এর আদর্শ ও শিক্ষা অনুসৃত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

(১)

দৃশ্যপট-১ : জনাব 'ক' একজন ঔষধ ব্যবসায়ী। তিনি ন্যায্য মূল্যে ঔষধ বিক্রি করেন। সন্তানে একদিন তিনি কর্মচারীদের নিয়ে ঔষধের মেয়াদ পরীক্ষা করে মেয়াদেন্তীর্ণ ঔষধগুলো বিক্রি না করে ধূংস করে ফেলেন।

দৃশ্যপট-২ : জনাব 'খ' একজন ব্যবসায়ী। বর্ষা মৌসুমের শুরুতে তিনি বাড়ির চারিদিকে বিভিন্ন প্রজাতির ফলের চারা রোপণ করেন। চারাগুলো একটু বড় হলে প্রতিবেশির ছাগল বাড়িতে ঢুকে সেগুলো নষ্ট করে ফেলে। এতে 'খ' কষ্ট পেলেও তিনি আবারো বিভিন্ন প্রজাতির ফলের চারা আবারও রোপণ ও নিয়মিত পরিচর্যা করতে থাকেন।

দৃশ্যপট-৩ : জনাব 'গ' একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তিনি পরিবারের বড় ছেলে। ছোট ভাইদের পড়ালেখার যাবতীয় খরচ তিনি দিয়ে থাকেন। তিনি তার বৃন্দ পিতা-মাতাকে নিজের কাছে রাখেন এবং অসুস্থ হলে তাদের চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা করেন। তিনি মাঝে মাঝে গ্রামের অসহায় দরিদ্র মানুষদের চাল-ডালসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস দান করেন।

ক. শরিয়ত কী ?

- খ. হযরত উসমান (রা.)কে কেন 'জামিউল কুরআন' বলা হয়? ব্যাখ্যা কর।
- গ. দৃশ্যপট ১-এ কোন হাদিসের শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে? বর্ণনা কর।
- ঘ. দৃশ্যপট ২ ও দৃশ্যপট ৩ -এ যে হাদিসসমূহের শিক্ষা প্রতিপালিত হয়েছে তা চিহ্নিত সমাজে ধর্মী গরিবের বৈষম্য নিরসনে কোনটি ভূমিকা রাখে? বিশ্লেষণসহ মতামত দাও।

(২)

দৃশ্যপট-১ : জনাব 'ক' একজন বর্গাচারী। সকালে ফজরের আযানের সাথে সাথে তিনি মসজিদে চলে যান। মসজিদ থেকে বাড়ি ফিরে খাবার খেয়ে তিনি জমি চাষ করতে চলে যান। জমিতে কাজ করার সময় আযান হলে ওয়ু করে নামায পড়ে নেন। তার বাড়িতে দুজন এতিম শিশু থাকে। তিনি তাদের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন। পড়াশোনার যাবতীয় খরচ তিনি বহন করেন।

দৃশ্যপট-২ : প্রধান শিক্ষক প্রাত্যহিক সমাবেশে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান এবছর বার্ষিক দোয়া মাহাফিলে কাকে প্রধান অতিথি করা যায়? দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী আবিদ প্রস্তাব করলো শায়খ 'ক'-কে প্রধান অতিথি করা হোক। অন্য সকল শিক্ষার্থী তার প্রস্তাবটি সমর্থন করে। প্রধান শিক্ষক মহোদয় ঘোষণা দেন তোমাদের প্রস্তাবটি পাস হলো এবং শায়খ 'ক'-কে প্রধান অতিথি হিসেবে মনোনিত করা হলো।

দৃশ্যপট-৩ : করোনাকালে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবে ঢাকার জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে সাময়িকভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নামাজ আদায় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরের দিন বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা জামে মসজিদেও বায়তুল মোকাররমের অনুকরণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সাময়িকভাবে নামাজ আদায় শুরু হয়।

ক. শানে নৃযুল কাকে বলে?

- খ. সূরা আশ-শামস-এর শিক্ষা জানা জরুরি কেন?
- গ. দৃশ্যপট ১-এ কোন সূরার শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. দৃশ্যপট-২ ও দৃশ্যপট-৩ ঘটনাসমূহ শরিয়তের যে উৎসসমূহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ চিহ্নিত করে কোনটি ইসলামি আইনকে গতিশীল করে বলে তুমি মনে করো? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. শরিয়ত মেনে চলা প্রয়োজন কেন?
২. 'আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই এর সংরক্ষক' ব্যাখ্যা কর।
৩. 'আমার উম্মাতের উত্তম ইবাদত হলো কুরআন তিলাওয়াত' ব্যাখ্যা কর।
৪. ফরজে আইন মেনে চলা জরুরি কেন? ব্যাখ্যা কর।
৫. হারাম বর্জনীয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

ইবাদত (الْعِبَادَةُ)

মানুষ সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর ইবাদত করা। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ মহান আল্লাহর আদেশ যেমন- সালাত, সাওম, হজ, যাকাত পালন করা এবং নিষেধ যেমন- শিরক করা, মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া, সুদ, ঘূর, বেপর্দা, বেহায়াগনা ইত্যাদি পরিহার করে চলাকে ইবাদত বলে। তেমনি নবি-রাসূলের দেখানো গথ অনুযায়ী একে অপরের সাথে উভয় আচার ব্যবহার করাও ইবাদত। মূলত ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব প্রকাশ করা হয়। এর মধ্যে মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা -

- হাকুল্লাহ (আল্লাহর হক) ও হাকুল ইবাদ (বান্দার হক)-এর ধারণা লাভ করব এবং এগুলো আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব;
- হাকুল্লাহ (আল্লাহর হক) ও হাকুল ইবাদ (বান্দার হক) চিহ্নিত করে বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারব;
- সালাতের পরিচয় ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- সাওমের (রোয়ার) গুরুত্ব ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব;
- যাকাতের ভূমিকা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- হজের ধারণা ও নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারব;
- আত্মবোধ, শৃঙ্খলাবোধ ও নৈতিকতা অর্জনে হজের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব;
- অসহায় ও দরিদ্রের অধিকার বর্ণনা করতে পারব;
- মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ইলম (জ্ঞান)-এর ধারণা, প্রকারভেদ ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষকের গুণাবলি বর্ণনা করতে পারব;
- ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক এবং শিক্ষা ও নৈতিকতার ধারণা বর্ণনা করতে পারব;
- জিহাদের ধারণা, প্রকারভেদ ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারব এবং সন্ত্রাসবাদের কুফল বর্ণনা করতে পারব;
- জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য অনুধাবন করে সন্ত্রাসমুক্ত মানবতাবাদী জীবনযাপনে সচেষ্ট হতে পারব;
- মৌলিক ইবাদতগুলো পালনের মাধ্যমে নৈতিক ও মানবিক জীবন গঠনে অগ্রসর হতে পারব।

পাঠ ১

ইবাদত (الْعِبَادَةُ)

ইবাদত (الْعِبَادَةُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো চূড়ান্তভাবে দীনতা-হীনতা ও বিনয় প্রকাশ করা এবং নমনীয় হওয়া। আর ইসলামি পরিভাষায়, দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজ-কর্মে আল্লাহ তায়ালার বিধি-বিধান

মেনে চলাকে ইবাদত বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে সহজভাবে জীবনযাপন করার জন্য অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন।

আমরা মহান আল্লাহর বান্দা। তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুরআন মাজিদে বলেছেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَنَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ○

অর্থ : আর আমি জিন ও মানবজাতিকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি (সূরা আয়-যারিয়াত, আয়াত ৫৬)।

আমরা পৃথিবীতে যত ইবাদতই করি না কেন, সকল ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যই হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর এ ইবাদত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য না হলে আল্লাহ তা কবুল করবেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিন্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তার ইবাদত করতে।” (সূরা আল-বাইয়িয়ানা, আয়াত : ৫)

কীভাবে ইবাদত করলে ও জীবনযাপন করলে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হবেন, তা শেখানোর জন্য নবি-রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের অনুসরণ করতে পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, “(হে নবি!) আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখুন, আল্লাহ তো কাফিরদের পছন্দ করেন না।” (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ৩২)

উক্ত আয়াত থেকে আমরা বুঝলাম আল্লাহ ও তার রাসূল কর্তৃক নির্দেশিত পথ ও মত অনুসরণ করার নাম ইবাদত। সুতরাং তাঁদের নির্দেশিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারলে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হব।

ইবাদতের শুরুত্ব ও তাৎপর্য

আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য হলো বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞানের। যদি মানুষ সে বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করতে না পারে তাহলে সে চতুর্পদ জন্ম কিংবা তার চেয়েও অধিম হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলক্ষ্য করে না। তাদের চক্ষু আছে তা দ্বারা দেখে না, তাদের কর্ণ আছে তা দ্বারা শব্দে না; এরা পশুর ন্যায়। বরং অধিক নিকৃষ্ট (পশ্চ হতে); তারা হলো অচেতন।” (সূরা আল-আরাফ, আয়াত ১৭৯)। অতএব ইবাদত বলতে শুধু উপসনাকেই বুঝায় না। বরং আল্লাহর খলিফা (প্রতিনিধি) হিসেবে সকল কার্য আল্লাহর বিধানমতো করাই হলো ইবাদত। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فِإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَأَنْتَ شُرُونَ فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَإِذْ كُرِّبُوا اللَّهُ أَكْثَرُهُمْ عَلَّمَهُ تُفْلِحُونَ ○

অর্থ : সালাত আদায় করার পর তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে ব্যাপ্ত হবে এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করবে। যাতে তোমরা সফলকাম হও (সূরা আল-জুমু'আ, আয়াত ১০)।

এ আয়াতের মর্ম থেকে বোধা যায় যে, আল্লাহ তায়ালার আদিষ্ট কাজগুলো পরিপূর্ণভাবে আদায় করে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি ও কৃষিকাজ করা এবং বৈধ পছায় সম্পদ উপার্জন ও দুনিয়ার অন্যান্য সকল ভালো কাজ করা ইবাদত। এমনিভাবে মহান আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ভালোবাসা, তার রহমতের আশা, শান্তির ভয়, ইখলাস, সবর, শোকর, তাওয়াকুল ইত্যাদি সব কাজই ইবাদতের মধ্যে শামিল।

আমরা আল্লাহ ও তার রাসূল (স.)-এর প্রদর্শিত পছা যথাযথভাবে অনুসরণ করলে পরকালে আল্লাহ তায়ালা আমাদের পুরক্ষৃত করবেন। ফলে দুনিয়া ও আখিরাতে আমরা শান্তি পাব

হাকুল্লাহ ও হাকুল ইবাদ

ইবাদত প্রধানত দুই একার : (ক) হাকুল্লাহ ও (খ) হাকুল ইবাদ।

(ক) হাকুল্লাহ (আল্লাহর হক)

আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে হাকুল্লাহ (الْحُكْمُ) বলে। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য অনেক ধরনের ইবাদত (কাজ) করি। সেগুলোর মধ্যে কিছু ইবাদত শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্দিষ্ট, এগুলো হলো হাকুল্লাহ, যেমন- সালাত (নামায) কায়েম করা, সাওম (রোয়া) পালন ও হজ করা ইত্যাদি। এসব কাজ করার পূর্বে প্রত্যেক মানুষকে অন্তর থেকে যা বিশ্বাস করতে হবে তা হলো- আল্লাহ আছেন, তিনি এক ও অবিতীয়, তার কোনো শরিক (অংশীদার) নেই, তিনিই সবকিছুর স্঵ষ্টি। তার আদেশেই পৃথিবীর সবকিছু আবার ধ্বংস হবে। আমাদের জীবন-মৃত্যু সবই তার হাতে। পৃথিবীর সবকিছুই তার জ্ঞানের আওতাভুক্ত। তার হাতেই সকল সৃষ্টির রিজিক। আমরা তারই ইবাদতকারী। তিনি ব্যক্তিত উপসনার উপযুক্ত আর কেউ নেই। এ সবকিছু মনে থাণে বিশ্বাস করা ও স্মীকার করাই হলো বান্দার ওপর আল্লাহর হক।

আল্লাহ তায়ালার হক আদায় করতে হলে আমাদের অবশ্যই নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে :

১. সামগ্রিক জীবনে মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করা।
২. আল্লাহর দেওয়া সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।
৩. সর্বাবস্থায় নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ এবং তার অনুগ্রহ কামনা করা।

আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে মহান আল্লাহর বিধানগুলো মেনে চলব; তাতে তিনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন। ফলে আমরা পরকালে তার থেকে পুরক্ষার পাব।

(খ) হাকুল ইবাদ (বান্দার হক)

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবন্ধ হয়েই মানুষকে বসবাস করতে হয়। আমরা পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আতীয়-স্বজন, পাঢ়া-প্রতিবেশীদের নিয়ে সামাজিকভাবে একসাথে বসবাস করি। একজনের দৃঢ়ত্বে অন্যজন সাড়া দেই। আপন্দে-বিপন্দে একে-অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করি। পরস্পরের প্রতি এ সহানুভূতি ও দায়িত্বই হাকুল ইবাদ (الْحُكْمُ الْعَبْدِي) (বান্দার হক বা অধিকার)। কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে জানা যায় যে, ইসলামে বান্দার হক তথা মানবাধিকারের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মানবাধিকার সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত ও হাদিস রয়েছে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, নিশ্চয় তোমার ওপর তোমার প্রতিপালকের, তোমার শরীরের, তোমার জ্বী ও সন্তান-সন্তির হক রয়েছে। অন্যত্র রাসুলুল্লাহ (স.) আরও বলেছেন, “এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের ছয়টি অধিকার রয়েছে। যেমন- সালামের জবাব দেওয়া, রোগীকে দেখতে ঘাওয়া, জানায়ায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত করুণ করা, মজলুমকে সাহায্য করা ও হাঁচির জবাব দেওয়া” (বুখারি ও মুসলিম)।

মানুষের প্রতি মানুষের হক বা অধিকারকে আটটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন : (১) নিকটাত্তীয়ের হক, (২) দূরাত্তীয়ের হক, (৩) প্রতিবেশীর হক, (৪) দেশবাসীর হক, (৫) শাসক-শাসিতের হক, (৬) সাধারণ মুসলমানের হক, (৭) অভাবী লোকের হক এবং (৮) অমুসলিমের হক।

আমরা আল্লাহর হক পালন করার সাথে সাথে মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হ্ব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে মহান আল্লাহর হক ও বান্দার হক সম্পর্কিত তিনটি করে উদাহরণ তৈরি করবে।

পাঠ ২

সালাত (الصلوة)

পরিচয়

সালাত আরবি শব্দ। এর ফার্সি প্রতিশব্দ হলো নামায। এর অর্থ দোয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা ও রহমত (দয়া) কামনা করা। যেহেতু সালাতের মাধ্যমে বান্দা প্রভুর নিকট দোয়া করে, দয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে তাই একে সালাত বলা হয়। ইসলাম যে পাঁচটি রূক্নের (স্তম্ভের) ওপর প্রতিষ্ঠিত- তার দ্বিতীয়টি হলো সালাত। এ সম্পর্কে মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন-

*بِيْنِ الْإِسْلَامِ عَلَىٰ خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَاقَامَ الصَّلوةُ وَإِيتَاءُ
الزَّكُوْةِ وَالْحِجَّةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ-*

অর্থ : ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মারুদ নেই, মুহাম্মদ (স.) তার বান্দা ও রাসুল এবং সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হজ করা এবং রমজানের রোয়া রাখা (বুখারি ও মুসলিম)।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেবেন। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন-

أَوْلُ مَا يُحَاسِبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلوةُ-

অর্থ : কিয়ামতের দিন বান্দার কাছ থেকে সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবে (তিরমিয়ি)।

মহান আল্লাহ মুমিনের ওপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ (আবশ্যক) করেছেন। তা হলো-ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। সালাত একজন মুমিনকে (বিশ্বাসী) মন্দ ও গাহিত কর্ত থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ

তায়ালা বলেন-

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۖ

অর্থ : নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্রীল ও ধারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে (সূরা আল-‘আনকাবুত, আয়াত ৪৫)।

শরিয়ত অনুমোদিত কারণ ব্যতীত কখনোই সালাত ত্যাগ করা যাবে না।

ধর্মীয় গুরুত্ব

একজন মুসলিমের দৈনন্দিন জীবনে সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। সালাত মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে বান্দা তার প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। ইমান মজবুত হয়, আত্মা পরিষুচ্ছ হয়। মানুষকে খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে অভ্যন্ত করে তোলে, যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসুলগ্রাহ (স.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি মনোযোগসহ সালাত আদায় করে, কিয়ামতের দিন ঐ সালাত তার জন্য ন্তর হবে” (তাবারানি)।

একদা হয়রত মুহাম্মদ (স.) তাঁর সাথিদের লক্ষ্য করে বললেন- ‘যদি করও বাড়ির পাশ দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত হয় এবং কোনো লোক দৈনিক পাঁচবার ঐ নদীতে গোসল করে, তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকবে?’ সাহাবিগণ উন্নতে বললেন, ‘না’ হে আল্লাহর রাসূল! তখন মহানবি (স.) বলেন- পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ঠিক তেমনি তার (সালাত আদায়কারীর) গুনাহসমূহ দূর করে দেয়। (বুখারি ও মুসলিম) মহানবি (স.) আরও বলেছেন, “সালাত হলো ইমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী” (তিরমিয়ি)।

মহানবি হয়রত মুহাম্মদ (স.) জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, “জামাআতে সালাত আদায় করলে একাকী আদায় করার চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়।” (বুখারি ও মুসলিম)

আর আল্লাহ তায়ালাও সালাতকে জামাআতের সাথে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَإِذْ كُعْوَامَعَ الرِّزْكِ يَعْيَىٰ

অর্থ : আর তোমরা কুরুকারীদের সাথে রক্ত কর (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৪৩)।

সামাজিক গুরুত্ব

পবিত্র কুরআনের বহুস্থানে জামাআতে সালাত আদায় করার কথা বলা হয়েছে। সালাতের কারণে দৈনিক পাঁচবার মুসলমানগণ একস্থানে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়। একে-অপরের খৌজ-খবর নিতে পারে। সুখে-দুঃখে একে অপরের সহযোগিতা করতে পারে। এতে তাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন আরও সুড়ত হয়। এমনকি সালাতের সারিতে দাঁড়াতে গিয়ে উঁচু-নিচু কোনো ভেদাভেদ থাকে না। ফলে সালাত আদায়কারীদের মধ্যে সাম্য সৃষ্টি হয়। সালাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষ পারস্পরিক সকল মতপার্থক্য ভুলে একসাথে কাজ করার শিক্ষা পায়।

সালাত আমাদেরকে সময়ের গুরুত্ব ও শৃঙ্খলাবোধ শিক্ষা দেয়। নেতার অনুসরণ করতে এবং নিয়মতাত্ত্বিক ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনে উদ্বৃদ্ধ করে। আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ রেখে নিয়মিত সালাত আদায় করব। জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সালাত বিষয়ে অর্থসহ দুটি আয়াত লিখে শ্রেণিকক্ষে পোস্টার সঁটাবে।

পাঠ ৩

সাওম (الصُّومُ)

পরিচয়

সাওম আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো বিরত থাকা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, সাওম হলো- সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় ত্বক্ষি থেকে বিরত থাকা। আমাদের দেশে সাওমকে রোযাও বলা হয়ে থাকে। রোজা ফার্সি ভাষার শব্দ।

থাণ্ড বয়ক্ষ প্রত্যেক নারী ও পুরুষের ওপর রম্যান মাসের এক মাস সাওম পালন করা ফরজ। এটি ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের একটি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাওমের শিক্ষা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

সাওমের নৈতিক শিক্ষা

সাওম কেবল আমাদের ওপরই ফরজ নয়। বরং পূর্বের নবি-রাসুলের উম্মতের উপরও ফরজ ছিল। এর মাধ্যমে সাওম পালনকারীর আত্মিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। সাওমের মাধ্যমে মানুষের মনে তাকওয়া (আল্লাহভীতি) ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। ক্ষুধা ও ত্যগায় কাতর হয়েও মানুষ মহান আল্লাহর ভালোবাসা ও ভয়ে কিছুই পানাহার করে না ও ইন্দ্রিয় ত্বক্ষি লাভ করে না।

মহান আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقَوَّنَ۔

অর্থ : হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ওপর সাওম (রোযা) ফরয করা হয়েছে। যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। যেন তোমরা তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি) অর্জন করতে পার (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৩)।

আমরা তাকওয়া অর্জনের জন্য রম্যান মাসে সিয়াম পালন করব।

মানুষ লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্যে, ত্রোধ-ক্ষোভ ও কামভাবের বশবর্তী হয়ে অনেক মন্দ কাজে লিঙ্গ হয়। সাওম মানুষকে এসব কাজ থেকে মুক্ত থাকতে শেখায়। সাওম হলো কোনো ব্যক্তি ও তার মন্দ কাজের মাঝে ঢাল স্বরূপ। মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন-

الصَّيَامُ جُنَاحٌ

অর্থ : সাওম (রোযা) ঢালস্বরূপ (বুখারি ও মুসলিম)।

সর্বোপরি সাওম পালনের মাধ্যমে দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি অর্জিত হয়।

সাওমের সামাজিক শিক্ষা

সিয়াম সাধনার ফলে সমাজের মানুষের মাঝে পারম্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়। সাওম পালন করে একপ ব্যক্তি ক্ষুধার্ত থাকার ফলে সে অন্য আরেকজন অনাহারীর ক্ষুধার জ্বালা সহজে বুঝতে পারে। ক্ষুধা ও পিপাসার যন্ত্রণা যে কীরুপ পীড়াদায়ক হতে পারে তা সে উপলক্ষ্য করতে পারে। এতে অসহায় নিরন্তর মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ভাব জাগ্রত হয়। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, ‘এ মাস সহানুভূতির মাস’ (ইবনে খুয়ায়মা)।

সাওম অসহায় ও দরিদ্রকে দান করতে উদ্ব�ৃক্ষ করে। রম্যান মাসে রাসুলুল্লাহ (স.) অন্যদের দান-সদকা করতে যেমন উদ্বৃক্ষ করেছেন, তিনি নিজেও তেমনিভাবে বেশী দান-সদকা করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, “রাসুলুল্লাহ (স.) লোকদের মধ্যে অধিক দানশীল ছিলেন। বিশেষ করে রম্যান এলে তার দানশীলতা আরও বেড়ে যেত” (বুখারি ও মুসলিম)।

সাওমের ধর্মীয় গুরুত্ব

ধর্মীয় দিক থেকেও সাওমের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। সকল সৎকাজের প্রতিদান মহান আল্লাহ দশশুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু সাওম এর প্রতিদান সম্পর্কে হাদিসে কুদসিতে রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন-

الصَّوْمُ فِي وَآجِزٍ بِهِ

অর্থ : সাওম আমার জন্য আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দেবো (বুখারি)।

যেহেতু সাওয়াবের আশায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাওম পালন করা হয় সেহেতু আল্লাহ তায়ালা রোগাদারের পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। যেমন, মহানবি (স.) বলেছেন-

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذَنْبٍ -

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও সাওয়াবের আশায় রম্যান মাসে রোগ রাখে, আল্লাহ তায়ালা তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন (বুখারি)।

সাওম একটি মৌলিক ফরজ ইবাদত। যদি কেউ তা অস্বীকার করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

সাওমের সামাজিক গুরুত্ব

সাওম পালনের মাধ্যমে একজন লোক ক্ষুধার যন্ত্রণা উপলক্ষ্য করতে পারে। সমাজের নিরন্তর ও অভাবীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারে। সাওম পালনকারী ব্যক্তি অন্যায়-অশীল কথাবার্তা পরিহার করে চলে। হানাহানি থেকে দূরে থাকে। ফলে সমাজে শান্তি বিরাজ করে। অধিক সাওয়াব পাওয়ার আশায় একে অপরকে সাহারি ও ইফতার করায় এবং অভাবীকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে। এতে পরম্পরারের মধ্যে আত্মত্বোধ সৃষ্টি হয় এবং সামাজিক বন্ধন আরও মজবুত ও শক্তিশালী হয়। সুতরাং মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় আমাদের সাওম পালন করা উচিত। আমরা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সাওম পালন করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে গ্রুপভিত্তিক কাজ ভাগ করে ৩০ মিনিটের একটি ইদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান করবে, যাতে তারা সিয়াম সাধনা ও সুন্নাহভিত্তিক ইদ উদযাপনের অভিজ্ঞতা আলোচনা করবে।

পাঠ ৪

যাকাত (الزكوة)

পরিচয়

অর্থনৈতিকভাবে ধনী ও গরিব উভয় শ্রেণির মানুষ সমাজে রয়েছে। ধনী ও গরিবের মাঝে আর্থিক সমন্বয়সাধনে যাকাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাকাত আদায় করলে সমাজের অসচ্ছল লোকেরাও আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়ে ওঠবে। ফলে ধনী ও গরিবের মাঝে সেতুবন্ধ তৈরি হবে। এতে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় থাকে। হযরত মুহাম্মদ (স.) যাকাতকে ইসলামের সেতুবন্ধ হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন—

الزكوة فنطرة الإسلام

অর্থ : যাকাত হলো ইসলামের সেতুবন্ধ (বায়ব্রাকি)।

যাকাত শব্দের অভিধানিক অর্থ পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা ও বৃদ্ধি পাওয়া। আর ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় কোনো মুসলিম ‘নিসাব’ পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরাতে তার সম্পদের শতকরা ২.৫০ হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলে। নিসাব হলো ন্যূনতম সম্পদ, যা থাকলে যাকাত ফরজ হয়। যাকাত প্রদানে ধনীর সম্পদ পবিত্র, পরিশুদ্ধ ও বৃদ্ধি পায়। তাই একে যাকাত বলা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে যাকাত গরিবের প্রতি ধনীর দয়া নয় বরং এটি গরিবের অধিকার। তাই আল্লাহ তায়ালা যাকাত আদায় করাকে আবশ্যক করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُورَةَ

অর্থ : আর তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর (সূরা আন-নূর, আয়াত ৫৬)।

যাকাতের গুরুত্ব

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে অনেক স্থানে সালাতের সাথে যাকাতের কথা ও বলেছেন। যাকাত ইসলামের পঞ্চ স্তুপের মধ্যে তৃতীয়। যাকাতের সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে। এসব কারণেই মহান আল্লাহ মুসলমানদের ওপর যাকাত ফরজ করেছেন।

সামাজিক গুরুত্ব

যাকাত সমাজ থেকে অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে পারস্পরিক সৌহার্দ স্থাপন করে। সামাজিক নিরাপত্তা দানের পাশাপাশি সমাজের মানুষের মাঝে সম্পদের বৈবম্য দূর করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كُلَّا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ط

অর্থ : যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের অর্থশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয় (সূরা আল-হাশের, আয়াত ৭)।

সুতরাং সমাজে যাকাত ব্যবস্থা চালু করে বৈষম্য দূর করে সাম্যের ভিত্তিতে জীবন গড়ে তোলাই আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

নৈতিক গুরুত্ব

যাকাত মানুষের মনে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে। পবিত্র ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে। অগচ্য রোধ করতে শেখায়। সর্বোপরি যাকাত মানুষের আত্মিক প্রশাস্তি, নৈতিক উন্নতি, সম্পদের পবিত্রতা ও পরিশুল্কতা নিশ্চিত করে। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন-

خُلُّ مَنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُظْهِرُهُمْ وَتُنَزِّهُمْ بِهَا

অর্থ : আপনি তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদাকা (যাকাত) গ্রহণ করুন। এর মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র এবং পরিশোধিত করবেন (সূরা আত্-তাওবা, আয়াত ১০৩)।

অতএব নৈতিকভাবে পরিশুল্ক হওয়ার জন্য আমরা যাকাত আদায় করব।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার উৎসগুলোর মধ্যে যাকাত অন্যতম। এর ওপর ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও জনকল্যাণমূল্যের প্রকল্পসমূহের সাফল্য নির্ভরশীল। এতে সম্পদের প্রবাহ গতিশীল হয়। ধনীর সম্পদ পুঁজীভূত না থেকে দরিদ্র লোকদের হাতেও যায়। ফলে রাষ্ট্রের অর্থনীতি সচল হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং বেকারত্ব হ্রাস পায়। মার্খাপিছু আয় বেড়ে যায়। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত ও শক্তিশালী হয়। আর্থিকভাবে অসচ্ছল লোকগুলো ধীরে ধীরে সচ্ছল হতে থাকে। দিনে দিনে সমাজে সম্পদশালী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَمْحُقُ اللَّهُ الرِّبُّوَا وَ يُبَيِّنُ الصَّدَقَاتِ

অর্থ : আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বাড়িয়ে দেন (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৭৬)।

আমরাও অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য যথাযথভাবে যাকাত আদায়ের চেষ্টা করব।

ধর্মীয় গুরুত্ব

কোনো মুসলিম যাকাত না দিলে সে আর পরিপূর্ণ মুসলিম থাকতে পারে না। আল্লাহ বলেন-

أَلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كُفَّارُونَ

অর্থ : যারা যাকাত দেয় না এবং তারা পরকালও অস্থীকারকারী (সূরা হা-মীম আস-সাজদা, আয়াত ৭)।

যাকাত অস্থীকার করা আল্লাহ ও তার রাসূলকে অস্থীকার করার শামিল। ইসলামি আইনে যাকাত দানের উপর্যুক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই যাকাত দিতে হবে। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) যাকাত

অস্থীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সালাত ও সাওম শারীরিক ইবাদত। আর যাকাত হলো আর্থিক ইবাদত। সুতরাং যাকাত আদায় করা একজন মুসলিমের ইমানি দায়িত্ব।

যাকাত অসহায় ও দরিদ্রের অধিকার

যাকাত প্রদান করা দরিদ্রের প্রতি ধনী লোকের কোনো দয়া বা অনুগ্রহ নয়। বরং যাকাত হলো দরিদ্র লোকের প্রাপ্য বা অধিকার। কেউ ইসলামের অনুসারী হলে তার উচিত স্বেচ্ছায় যাকাত প্রদান করা এবং অসহায় লোকদের নিকট তা পৌছে দেওয়া। মহান আল্লাহ বলেন-

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حُقْقٌ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُوفِ
○

অর্থ : আর তাদের (ধনীদের) সম্পদে অভাবহস্ত ও বর্খিতের অধিকার রয়েছে (সূরা আয়-যারিয়াত, আয়াত ১৯)।

তাই সম্পদশালী ব্যক্তি তার সম্পদ ভোগ করার পূর্বে চিন্তা করবে যে, এতে অসহায়দের অধিকার আছে। তাদের অধিকার অবশ্যই দিতে হবে। অন্যথায় সমুদয় সম্পদ তার জন্য অপবিত্র হয়ে যাবে। পরিণামে তাকে পরকালে কঠিন শান্তি ভোগ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, “আর যারা স্বর্গ ও রূপা (সম্পদ) জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না তাদেরকে কঠিন শান্তির সুসংবাদ দিন।” (সূরা আত্-তাওবা, আয়াত ৩৪)

আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় করে বেকার ও গরিবদের জন্য অনেক কর্মসংহান করা যেতে পারে। এতে দেশ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবে। দারিদ্র্য দূরীভূত হবে এবং দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। ধনী-দরিদ্রের মাঝে সম্পদের বৈষম্য দূর হবে। কাজেই ধনীদের শরিয়তের বিধান অনুসারে যাকাত আদায় করা একান্ত আবশ্যিক।

কাজ: শিঙ্কার্থীরা শ্রেণিকক্ষে লটারির মাধ্যমে যাকাতভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর উপস্থিত বৃক্তার আয়োজন করবে। যেমন- ‘যাকাত অনুদান নয়; অধিকার’, ‘যাকাতে সম্পদ বৃদ্ধি পায়; সুদে ধৰ্মস হয়’ ইত্যাদি।

পাঠ ৫ হজ (পুরুষ)

পরিচয়

হজ ইসলামের পঞ্চম ভিত্তি। ‘হজ’ এর আভিধানিক অর্থ হলো- সংকল্প করা, ইচ্ছা করা। ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাইতুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত করাকে হজ বলে। হজ ঐ সমস্ত ধনী মুসলমানের উপর ফরজ যাদের পবিত্র মুক্তায় যাতায়াত ও হজের কাজ সম্পাদন করার মতো আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ্য রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَيَلْهُ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ

অর্থ : আর মানুষের মধ্যে যার আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য আছে তার উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ করা অবশ্য কর্তব্য (সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৭)।

সামর্থ্যবানদের জন্য হজ জীবনে একবার পালন করা ফরজ।

হজের ফরজ ও ওয়াজিব সমূহ

হজের মোট ৩টি ফরজ রয়েছে। যথা-

১. ইহরাম বাঁধা (আনুষ্ঠানিকভাবে হজের নিয়ত করা)।
২. ৯ই জিলহজ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।
৩. তাওয়াফে যিয়ারত (১০ই জিলহজ ভোর থেকে ১২ই জিলহজ পর্যন্ত যেকোনো দিন কাবা শরিফ তাওয়াফ করা)।

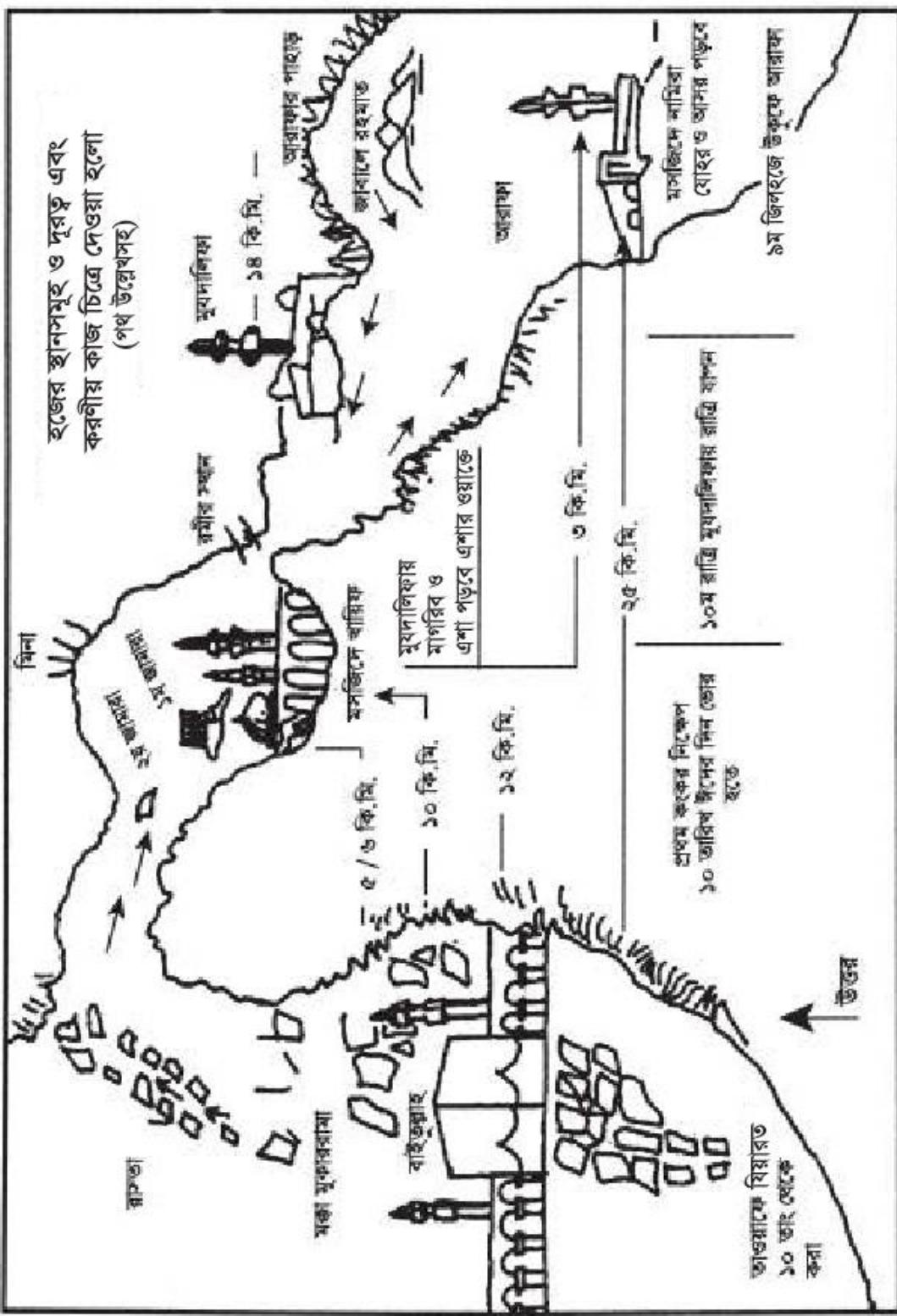
হজের ওয়াজিব- ৬টি। যথা-

১. ৯ই জিলহজ দিবাগত রাতে মুয়দালিফা নামক স্থানে অবস্থান করা।
২. সাফা ও মারওয়া পাহাড়স্থানের মাঝে সাঁজ (দৌড়ানো) করা।
৩. ১০, ১১ ও ১২ই জিলহজ পর্যায়ক্রমে মিনায় তিনটি নির্ধারিত স্থানে ৭টি করে কংকর (পাথর কণা) শয়তানের উদ্দেশ্যে নিষ্কেপ করা।
৪. কুরবানি করা।
৫. মাথা কামানো বা চুল কেটে ছোট করা।
৬. বিদায়ী তাওয়াফ করা (এটি মক্কার বাইরের লোকদের জন্য ওয়াজিব)।

অপর পৃষ্ঠায় চিত্রের মাধ্যমে হজের কার্যক্রমগুলো দেখানো হলো।

ছবি : হজের স্থানসমূহ

১০৯



হজের ধর্মীয় গুরুত্ব

ইসলামে হজের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সূরা হাজ নামে একটি সূরা অবতীর্ণ করেছেন। এ ছাড়াও পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ হজের ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। রাসুলুল্লাহ (স.) থেকেও হজের গুরুত্বের ব্যাপারে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন-

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

অর্থ : মাকবুল (আল্লাহর নিকট গ্রহণ্য) হজের বিনিময় জালাত ছাড়া আর কিছুই নেই (বুখারি-মুসলিম)। হজের মাধ্যমে বিগত জীবনের গুনাহ মাফ হয়। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি হজ করে সে যেন নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়” (ইবনে মাজাহ)।

হজ অস্থীকারকারী কাফির হয়ে যাবে। আমাদের উচিত আল্লাহর নিকট গ্রহণ্য হজ করার ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া।

সামাজিক গুরুত্ব

হজের মাধ্যমে বিশ্বভাস্তু তৈরি হয়। প্রতিবছর বিশ্বের নানা ধ্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলিম একই স্থানে সমবেত হয়। হজ বিশ্বমুসলিমের মহাসম্মেলন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, “এবং মানুষের নিকট হজের ঘোষণা করে দাও; তারা তোমার নিকট (মক্কায়) আসবে পায়ে হেঁটে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটের পিঠে আরোহণ করে। তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে” (সূরা আল-হাজ, আয়াত ২৭)।

হজে এসে সবাই একই রকম পোশাক পরিধান করে আল্লাহর দরবারে নিজেকে সমর্পণ করে। সম্মিলিত কর্তৃত আওয়াজ করে বলতে থাকে লাববাইক, আল্লাহম্মা লাববাইক : হাজির হে আল্লাহ! আমরা তোমার দরবারে হাজির।

হজের শিক্ষা ও তাৎপর্য

ধন-সম্পদ, বর্ণ-গোত্র ও জাতীয়তার দিক থেকে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকলেও হজ এসব ভেদাভেদ ভূলিয়ে মুসলমানদের এক্যবন্ধ হতে শেখায়। হজ মুসলমানদের আদর্শিক ভাস্তু বন্ধনে আবদ্ধ করে। রাজা-প্রজা, মালিক-ভূত্য সকলকে সেলাইবিহীন একই কাপড় পরিধান করায়। একই উদ্দেশ্যে মহান প্রভুর দরবারে উপস্থিত করে সাম্যের প্রশিক্ষণ দেয়। হজ মানুষকে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা দিয়ে সহানুভূতিশীল করে গড়ে তোলে। বিশ্বভাস্তুবোধ শেখায়। পারস্পরিক ভাব ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে মানুষের মাঝে সৌহার্দ্যবোধ জাগিত করে। আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করার কারণে সাধারণ মানুষ হাজিদের সম্মান করে থাকে। সুতরাং আল্লাহর রহমত পেতে হলে তাঁর আদেশ পালনার্থে ধনী মুসলমানদের যত শীত্ব সম্ভব হজ আদায় করা উচিত। আমরাও হজ থেকে শিক্ষা লাভ করে বিশ্বজনীন ভাস্তুবোধে উদ্বৃদ্ধ হব।

কাজ : শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে প্রতি দলের একজনকে 'হজ বিশ্ব মুসলিমদের মহাসম্মেলন' এর উপর ২/৩ মিনিট বক্তৃতা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

পাঠ ৬

মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক (عَلَاقَةُ الْمَالِكِ بِالْعَامِلِ)

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদি একজন মানুষের মৌলিক অধিকার। আর এ অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে মানুষ প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। মানুষ সামাজিক জীব। পৃথিবীর কোনো মানুষই একা তার সকল কাজ করতে পারে না। শিল্পায়নের এ যুগে জীবনধারণের জন্য প্রত্যেক মানুষকেই একে অন্যের মূখ্যপক্ষী হতে হয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি এক ব্যক্তির অধীনে একাধিক ব্যক্তি কাজকর্ম করে। এতে কেউ মালিক হয় আবার কেউ হয় শ্রমিক। মালিকের সাথে শ্রমিকের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। মালিক শ্রেণি যেমন শ্রমিক শ্রেণির সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না তেমনিভাবে শ্রমিক শ্রেণির দৈনন্দিন জীবন মালিক শ্রেণির বেতন-ভাতার উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অন্যের কাজ করে শ্রমের মূল্য গ্রহণ করা সূণার কাজ নয়। আমাদের প্রিয় নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) ও শ্রমিকের কাজ করেছেন। তাঁকে জিজেস করা হলো— কোন প্রকারের উপার্জন উত্তম ও পরিত্র? তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তির নিজ শ্রমের উপার্জন এবং সংব্যবসালক্ষ মুনাফা। (বায়হাকি)

ইসলাম অধীনস্থ লোকদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَبِأَنَّ الَّذِينَ احْسَانُوا وَبِنِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَاجْهَارُ ذِي الْقُرْبَى وَاجْهَارُ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ
وَابْنِ السَّبِيلِ。 وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

অর্থ : আর তোমরা পিতা-মাতা, আতীয়-স্বজন, ইয়াতীয় ও মিস্কিনদের সাথে ভালো আচরণ কর এবং নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথি, মুসাফির ও তোমাদের অধীনস্থ যেসব দাস-দাসী (শ্রমিক) রয়েছে তাদের প্রতিও সদয় হও (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৩৬)।

মালিক ও শ্রমিকের মাঝে এক চমৎকার দৃষ্টান্ত আমরা হ্যরত আনাস (রা)-এর জীবন থেকে পাই। তিনি বলেন, “আমি দশ বছর যাবৎ রাসুলুল্লাহ (স.)-এর খেদমত করেছি। তিনি আমার সম্পর্কে কখনো উহ! শব্দ বলেননি এবং কখনো বলেননি, এটা করোনি কেন? এটা করেছ কেন? আমার বহুকাজ তিনি নিজ হাতে করে দিতেন” (বুখারি)।

হ্যরত উমর (রা) আমিরুল মুমিনিন ছিলেন। জেরুজালেম সফরে উটের পিঠে চড়া ও উট টেনে নেওয়ার মাধ্যমে তিনি সাম্য ও মানবতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি উটের পিঠে চড়া ও উটের রশি টানার বিষয়ে নিজের ও ভ্রতের মাঝে পালাত্রম ঠিক করে নিয়েছিলেন। মালিক-শ্রমিকের এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল।

বিদায় হজের সময় রাসুলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, একজন অধীনস্থ কর্মচারীকে কতবার ক্ষমা করা যেতে পারে? হ্যরত মুহাম্মদ (স.) বলেছিলেন-

كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ

অর্থ : দৈনিক সপ্তর বার (তিরমিয়ি)।

মানিবের উচিত তার শ্রমিকের শক্তি ও সামর্থ্য বিচার করে তাকে কাজ দেওয়া। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন-

وَلَا يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ

অর্থ : আর তাকে (শ্রমিককে) তার সাধ্য ও সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজ দেওয়া যাবে না (মুসলিম)।

খাওয়া পরা থেকে আরম্ভ করে সকল কাজে মালিক-শ্রমিকের মাঝে কোনো বৈষম্য ইসলাম অনুমোদন করে না। শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে হ্যরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, “তারা (যারা তোমাদের কাজ করে) তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। সে (মালিক) যা খায় তার অধীনস্থদেরও যেন তা খাওয়ায়। সে (মালিক) যা পরে তাদেরকে যেন তা পরতে দেয়। আর তাকে এমন কর্মভার দেবে না যা তার ক্ষমতার বাইরে। এমন কাজ (ক্ষমতার বাইরের) হলে তাকে (শ্রমিককে) যেন সাহায্য করে।” (বুখারি ও মুসলিম)

খুব দ্রুত শ্রমিকের পারিশ্রমিক আদায়ের ব্যাপারে ইসলামের বিধান সূচ্পট। হ্যরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন-

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقُهُ

অর্থ : শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও (ইবনু মাজাহ)।

পারিশ্রমিক দিতে অকারণে বিলম্ব করা সমীচীন নয়। শ্রমিক যাতে তার শ্রমের সঠিক মূল্য পায় সে ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “মজুরের পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করে তাকে কাজে নিয়োগ করো না।” একইভাবে শ্রমিককেও তার মালিকের দেওয়া দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার ব্যাপারে ইসলামে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। হ্যরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, “গোলাম (শ্রমিক) যখন তার মালিকের কাজ সুচারুরূপে করে এবং সুস্থিভাবে আল্লাহর ইবাদত করে তখন সে দ্বিগুণ প্রতিদান পায়।” (বুখারি ও মুসলিম)

মালিক-শ্রমিক যদি ইসলাম স্বীকৃত পছন্দ তাদের সম্পর্ক তৈরি করতে পারে, তাহলে শ্রমিক তার ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে আর মালিকও তার সঠিক শ্রম পাবে। শ্রমিক ও মালিকের মাঝে কোনো দিন মনোমালিন্য হবে না। কল-কারখানায় স্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করবে। কাজেই দেশ ও জাতির কল্যাণে আমাদের ইসলাম প্রদত্ত আদর্শ শ্রমনীতি অনুসরণ করা উচিত।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে শ্রমিকের অধিকার বিষয়ে কুরআন ও হাদিসের ৪টি উন্নতি অর্থসহ লিখে দেখাবে।

পাঠ ৭

ইলম (জ্ঞান) (العلم)

ইলম আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো- জ্ঞান, জানা, অবগত হওয়া, বিদ্যা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, ইলম হলো কোনো বস্তুর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা। অপরদিকে ইসলাম অর্থ আনুগত্য করা ও আত্মসমর্পণ করা। তাই প্রতিটি মুসলিম কার আনুগত্য করবে এবং কীভাবে করবে? কার নিকট আত্মসমর্পণ করবে? এবং কীভাবে আত্মসমর্পণ করবে? তা অবশ্যই জানতে হবে। ইলম ব্যতীত তা জানা যাবে না। তাই ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম।

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব

ইসলামে ইলম (জ্ঞান) এর গুরুত্ব এত বেশি যে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন নাজিলের সূচনা করেছেন
পড়ুন (أَقْرَأْتُ لِي أَنْ يَسِّمِ رِبِّكَ الْجِلَّةَ)

إِقْرَأْ إِلَيْهِمْ رِبِّكَ الْجِلَّةَ

অর্থ : পড়ুন আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন (সূরা আলাক, আয়াত ১)। সুতরাং পড়ার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন হয় বিধায় মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে এবং পরিপূর্ণ মানুষকূপে গড়ে উঠতে জ্ঞানচর্চা অপরিহার্য। জ্ঞানবান ব্যক্তি ও অজ্ঞ ব্যক্তি কখনো সমান হতে পারে না। জ্ঞান জ্ঞানীর মর্যাদা সমৃদ্ধ ও সমুদ্ভূত করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন-

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এলেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদায় সমুদ্ধৰণ করবেন (সূরা আল-মুজাদলা, আয়াত ১১)।

ইসলাম জ্ঞানার্জনকে সকল মুসলিমের উপর ফরজ (আবশ্যক) করেছে। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ : ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ (ইবনে মাজাহ)।

হযরত মুহাম্মদ (স.) অন্যত্র জ্ঞানার্জনকে উভয় ইবাদত বলে অভিহিত করেছেন। ইলমের অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এর মধ্যে যে ধরনের ইলম অর্জন করলে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করা যায়, বৈধ-অবৈধ বোঝা যায় এবং আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করা যায় তাই হলো উত্তম ইলম।

ইলম-এর প্রকারভেদ

ইলম দুই ভাগে বিভক্ত। যথা: (ক) দ্বীনি ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান) ও (খ) দুনিয়াবি ইলম (পার্থিব জ্ঞান)।

দ্বিনি ইলম বলতে সাধারণত ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞানকেই বুঝায়। যেমন- কুরআন, হাদিস, ফিকাহ, তাফসির ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান।

আর দুনিয়াবি ইলম বলতে শুধু পার্থিব উন্নতির সাথে সম্পৃক্ত জ্ঞানকেই বুঝায়। যেমন- গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, সাহিত্য, পদার্থ, রসায়ন ইত্যাদির জ্ঞান।

অন্যভাবে ইলমকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা: (ক) গ্রহণীয় জ্ঞান (খ) বর্জনীয় জ্ঞান।

গ্রহণীয় জ্ঞান হলো যে জ্ঞান ইহকাল ও পরকালে মানুষের কল্যাণে আসে। যেমন- নৈতিক জ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রকৌশল, পদার্থ-রসায়নসহ সকল কল্যাণকর জ্ঞান। আর বর্জনীয় জ্ঞান হলো যে জ্ঞান মানুষের কোনো কল্যাণে আসে না, বরং যার দ্বারা ইহকাল ও পরকালে অকল্যাণ সাধিত হয়। যেমন- অন্তেক জ্ঞান, চুরি, ডাকাতি, অন্যায়, ভুলুম, জিদিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। তবে প্রত্যেক সম্প্রদায় বা দেশ থেকে একদলকে অবশ্যই ইসলাম ধর্মের জ্ঞানে পণ্ডিত হতে হবে, অন্যথায় সকলকেই আল্লাহর নিকট পরকালে কৈফিয়ত দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন-

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ كَآئِفَةٌ لَّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنَذِّرُوا أَقْوَمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ

অর্থ : তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ বের হয় না কেন, যাতে তারা দ্বিন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে। (সূরা আত-তাওবা, আয়াত ১২২)

সুতরাং আমাদের মধ্যে একদল লোককে অবশ্যই দ্বিনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে দ্বিন শিক্ষার ব্যাপারে যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমনিভাবে পার্থিব শিক্ষা অর্জনেরও গুরুত্ব রয়েছে। তবে তা অবশ্যই আল্লাহর কোনো বিধানের পরিপন্থী হতে পারবে না। বরং তার সাথে নৈতিকতার সমন্বয় থাকতে হবে। কারণ শিক্ষার সাথে নৈতিকতা থাকলেই কেবল মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়। আর শিক্ষার সাথে নৈতিকতা না থাকলে মানুষের মনুষ্যত্ব ধ্বংস হয়ে যায়।

মূলত ইসলামের উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ করা। যেমন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন- ‘দ্বিন হলো কল্যাণ করা।’ (মুসলিম)। তাই যেসব ইলম মানবজীবনে কল্যাণ সাধন করে তা অর্জন করা অবশ্যই কর্তব্য। সুতরাং যে ইলম মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ সাধন করবে তা আমরা শিখিব ও শিখাব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে গ্রহণীয় জ্ঞান ও বর্জনীয় জ্ঞানের ৫টি করে উদাহরণ পেশ করবে।

পাঠ ৮

(صفات المعلم) শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য

যে নিয়মিত লেখাপড়া করে এবং শেখার প্রতি আগ্রহী ও যত্নশীল থাকে তাকে শিক্ষার্থী বলা হয়। একজন প্রকৃত শিক্ষার্থীর কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যিক। নিম্নে একজন আদর্শ শিক্ষার্থীর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো—

১. শিক্ষকগণের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।
২. সাক্ষাৎ হলে বিনয়ের সাথে সালাম দিয়ে তাঁদের খৌজ-খবর নেওয়া।
৩. শিক্ষক যা শিক্ষা দেন তা মনোযোগ সহকারে শোনা ও পালন করা।
৪. সব সময় শিক্ষকগণের সাথে নম্র, ভদ্র ও উত্তম আচরণ করা।
৫. সহপাঠীদের সাথে সংজ্ঞাব ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা।
৬. নিয়মিত শ্রেণিতে উপস্থিত থাকা।
৭. শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের পরিকার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা।
৮. শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছন্ন রাখা।
৯. শ্রেণিকক্ষে বা অন্য কোথাও শিক্ষকের সাথে দেখা হলে সাথে সাথে দাঁড়িয়ে সম্মান করা।
১০. অনুমতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষের বাইরে যাওয়া।
১১. জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষকদের উত্তম শিক্ষা মেনে চলা।
১২. শিক্ষকগণ অপছন্দ করেন এমন কাজ না করা।
১৩. কোনো অবস্থাতেই কারণ সাথে অভদ্র আচরণ না করা।
১৪. সর্বাবস্থায় শিক্ষকের কল্যাণ কামনা করা ও মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য দোয়া করা।
১৫. সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যন্তর হওয়া।
১৬. শেখার প্রতি উৎসাহী হওয়া ও সর্বদা শিক্ষকের সাহচর্যে থাকার চেষ্টা করা।
১৭. সরকিছু বুঝেও নে পড়া, না বুঝে পড়ার অভ্যাস ত্যাগ করা।
১৮. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে যা পাঠদান করবেন তা লিখে নেওয়া।
১৯. প্রতিদিনের পড়া নিয়মিতভাবে আয়ন্ত করা।
২০. পরের দিনের পড়া পূর্বের দিন দেখে ক্লাসে যাওয়া।

ইমাম শাফেয় (র.) ছাত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর শিক্ষক আল্লামা ওয়াকি (র.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন—“ছাত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট্য হলো সকল পাপকাজ বর্জন করা”।

আমরা শিক্ষার্থীর এ বৈশিষ্ট্যগুলো আয়ন্ত করব ও আদর্শ ছাত্র হব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা একজন আদর্শ শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্যের ওপর ৫টি প্ল্যাকার্ড বাড়ির কাজ হিসেবে তৈরি করে আনবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৯

শিক্ষকের গুণাবলি (صفات المعلم)

যিনি আমাদের শিক্ষা দেন তিনি শিক্ষক। পৃথিবীতে সবচাইতে সম্মান ও মর্যাদার পেশা হলো শিক্ষকতা। আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজেকে শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দিয়ে বলেছেন-

إِنَّمَا بُعْثُتُ مُعَلِّمًا

অর্থ : আমাকে শিক্ষক হিসেবেই প্রেরণ করা হয়েছে (ইবনু মাজাহ)।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পেশার লোকের বৈশিষ্ট্যগুলোও শ্রেষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। নিম্নে শিক্ষকের কতিপয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো :

- ক. একজন ভালো শিক্ষক অবশ্যই আদর্শবান হবেন। তিনি- (১) আদর্শিক জ্ঞানের অধিকারী হবেন; (২) নিজস্ব ধর্মীয় দর্শন ও অন্যান্য জীবন দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান রাখবেন; (৩) উভম আদর্শের ভিত্তিতে তিনি ছাত্রদের গড়ে তুলবেন; (৪) কথা ও কাজে মিল রাখবেন; (৫) আদর্শ প্রচারে কৌশলী ও সাহসী হবেন; (৬) শিক্ষকতাকে নিজের জীবনের পেশা ও ব্রত হিসেবে নেবেন; (৭) দুনিয়া ও আধিরাতের কল্যাণকে সামনে রেখে এ পেশায় আত্মনিয়োগ করবেন ও (৮) অন্যায়ের ব্যাপারে আপসহীন হবেন।
- খ. একজন ভালো শিক্ষক অবশ্যই গভীর জ্ঞানের অধিকারী হবেন। তিনি- (১) সবসময় জ্ঞানচর্চা করবেন; (২) ক্লাসে পড়ালোর জন্য আগেই প্রস্তুতি নেবেন; (৩) সমসাময়িক বিষয়ে ধারণা রাখবেন; (৪) মেধা বিকাশে সহায়ক বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেবেন; (৫) বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখি করবেন।
- গ. একজন ভালো শিক্ষক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হবেন। তিনি- (১) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবেন; (২) শালীন, মার্জিত ও ব্যক্তিত্বরক্ষাকারী পোশাক পরিধান করবেন; (৩) বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও প্রকাশভঙ্গির অধিকারী হবেন; (৪) মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখবেন; (৫) নিয়মনীতির ক্ষেত্রে কঠোর হবেন; (৬) সুস্থ মন ও দেহের অধিকারী হবেন।
- ঘ. একজন ভালো শিক্ষক ছাত্রদের প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসা সম্পন্ন হবেন। তিনি-
 - (১) স্নেহ-মমতা দিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করবেন।
 - (২) সকল শিক্ষার্থীকে সমান চোখে দেখবেন।

- (৩) ছাত্রদের মাঝে জ্ঞান লাভের উৎসাহ তৈরি করবেন।
- (৪) প্রয়োজনে একটি বিষয় বার বার বলবেন।
- (৫) ছাত্রদের একান্ত আপনজন হবেন।
- (৬) শিক্ষার্থীদের অহেতুক ধর্মক দেবেন না অথবা শাসন করবেন না।

(৭) তাদেরকে প্রহার বা তাদের প্রতি নির্মমতা প্রদর্শন করবেন না বরং দরদি মন নিয়ে তাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দেবেন। প্রখ্যাত সাহাবি মুআবিয়া ইবনুল হাকম আস-সুলামি (রা.) রাসুলুল্লাহ (স.) সম্পর্কে বলেন, “আমি তাঁর পূর্বে ও পরে তাঁর চেয়ে সুন্দর শিক্ষাদানকারী শিক্ষক আর দেখিনি। আল্লাহর কসম তিনি আমাকে বকাবকি করেননি, মারেননি এবং গালমন্দও করেননি।” (মুসলিম)

ঙ. একজন ভালো শিক্ষক বিচক্ষণ হবেন। তিনি ছাত্রদের মনমেজাজ, পছন্দ-অপছন্দ ও গ্রহণ করার ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টি দেবেন।

চ. একজন ভালো শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের প্রতি হবেন আন্তরিক ও দরদি। প্রশাসনের সাথে থাকবে তাঁর সুসম্পর্ক। কর্মজীবনে আমরা শিক্ষকতার মহান পেশায় নিযুক্ত হলে এসব বৈশিষ্ট্য অর্জন করব এবং আদর্শ শিক্ষক হব।

কাজ : ক. শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে একজন ভালো শিক্ষকের গুণাবলির বিষয়ে ১০টি বাক্য লিখবে।
 খ. আছাই শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে একজন ভালো শিক্ষকের অভিনয় করবে।

পাঠ ১০

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক (عَلَاقَةُ الطَّالِبِ بِالْمُعَلِّمِ)

শিক্ষক হলেন আদর্শ জাতি গঠনের কারিগর। পিতা-মাতার পরই শিক্ষকের মর্যাদা। শিক্ষক পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। পিতা-মাতা সন্তানকে জন্ম দিয়ে শুধু লালন-পালন করেন। পক্ষান্তরে শিশুদেরকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলেন একজন শিক্ষক।

শিক্ষার্থীরা অনুকরণগ্রস্তির। কাজেই একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যে শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন, শিক্ষার্থীরা তাই শিখবে। শিক্ষার্থীদের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী হবে শিক্ষকরাই ছেট বেলায় তা শিখিয়ে দেন। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় নিয়ম-কানুন, আদর্শ-কায়দা, শিষ্টাচার, বিনয়, ন্যূনতা, নিয়মানুবর্তিতা, দয়া, সহানুভূতি ইত্যাদি শিক্ষা দিয়ে থাকেন, যা তারা পরিণত বয়সে কাজে লাগিয়ে সার্বিক উন্নতি লাভ করে। ছাত্রদের সার্বিক কল্যাণ কামনায় শিক্ষকগণ যেভাবে ত্যাগের পরিচয় দেন তার জন্য শিক্ষকগণের যথাযথ সম্মান করা আবাদের কর্তব্য।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক হলো আত্মার সম্পর্ক। এটি পিতা-পুত্রের সম্পর্কের ন্যায়। পিতা যেমন সর্বদা পুত্রের কল্যাণ কামনা করেন ও তাকে কল্যাণের পথে চলতে উত্তুক করেন, শিক্ষকও তেমনি তাঁর ছাত্রের কল্যাণ কামনা করেন ও তাকে সৎ পথ দেখান। পুত্র তার পিতা থেকে সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়, অন্যদিকে ছাত্রও তার শিক্ষক থেকে জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হয়। পুত্র যেমন পিতা থেকে প্রাপ্ত সম্পদের পরিচর্যা করে বড় সম্পদশালী হতে পারে, শিক্ষার্থীও তেমনি শিক্ষক থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান সমৃদ্ধ করে বড় জ্ঞানী হতে পারে।

নবি ও রাসূল (আ.) গণ হলেন শিক্ষক আর তাঁদের উম্মত হলো তাঁদের ছাত্র। রাসুলুল্লাহ (স.) এই উম্মতের জ্ঞানীদেরকে নবিদের উত্তরাধিকারী বলেছেন। তিনি বলেন, “আলেমগণ (জ্ঞানীরা) হলেন নবিদের উত্তরাধিকারী। তাঁরা সম্পদ ও মালের উত্তরাধিকারী নন, বরং তাঁরা হলেন জ্ঞানের উত্তরাধিকারী” (তিরমিয়ি)।

সুতরাং পুত্র ও পিতার মাঝে যেমন উত্তরাধিকারের সম্পর্ক আছে; ছাত্র-শিক্ষকের মাঝেও তেমন সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই আমরা এই সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা.) বলেছেন, “যাঁর কাছে আমি একটি শব্দও শিখেছি, আমি তাঁর দাস। তিনি ইচ্ছা করলে আমাকে বিক্রি করতে পারেন কিংবা আযাদ করে দিতে পারেন কিংবা ইচ্ছা করলে দাস বানিয়েও রাখতে পারেন।” তাই তাঁর মতে, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক হলো ভৃত্য-মুনিব সম্পর্ক। এক বিন্দু শিক্ষার্থীর দৃষ্টিতে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে। বস্তুত ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক হবে সুন্দর, যেখানে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, মেহ ও ভালোবাসা বিরাজ করবে।

কাজ : শিক্ষকের সাথে ছাত্রের আচরণ কেমন হওয়া উচিত? শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।

পাঠ ১১

শিক্ষা ও নৈতিকতা (التعليمُ وَالْأَخْلَاقُ)

শিক্ষা

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষাহীন জাতি মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মতো। সংক্ষিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাকে নিজের জীবনে সফলভাবে প্রয়োগ করাকেই শিক্ষা বলে। এই শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে সাহায্য করে এবং মানব হৃদয়কে অঙ্গতার অঙ্গকার থেকে মুক্ত করে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করে। শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি মানুষের শরীর, মন ও আত্মার সমন্বিত বিকাশসোধন। এখানে শিক্ষা বলতে বিশেষভাবে ইসলামি শিক্ষাকেই বোঝানো হয়েছে। আর যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণরূপে তুলে ধরা হয়েছে তাকে ইসলামি শিক্ষা বলে। একথায় কুরআন ও হাদিসের আলোকে সমন্বিত শিক্ষাই হলো ইসলামি শিক্ষা। এ শিক্ষার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সৎ, চরিত্রবান, খোদাভোক, দেশপ্রেমিক, দায়িত্বশীল ও সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে।

ইসলাম শিক্ষার মূল উৎস হলো দু'টি-

১. আল-কুরআন : এই কুরআনে মানবজাতির জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবকিছুই মহান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন-

مَا فَرَّطَنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

অর্থ : কিতাবে (কুরআনে) কোনো কিছুই আমি বাদ দেইনি (সূরা : আল-আনআম, আয়াত ৩৮)।

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

অর্থ : আর আমি সকল বিষয়ের বর্ণনা দিয়ে আপনার উপর কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি (সূরা আন-নাহল, আয়াত ৮৯)।

২. আল হাদিস : রাসুলুল্লাহ (স.)-এর বাণী, কাজ ও মৌল সম্মতি হলো হাদিস। এটি ইসলামি শিক্ষার বিতীয় উৎস। হাদিসের গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَا أَنْكُمْ الرَّسُولُ فَقْدُوهُ وَمَا نَهِيْكُمْ عَنْهُ فَإِنْتُهُوا

অর্থ : আর রাসুল (স.) তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাক (সূরা আল-হাশর, আয়াত ৭)।

কুরআন ও হাদিস ব্যতীত ইসলাম ধর্মবিশারদদের ঐকমত্য (ইজমা) এবং তাঁদের সাদৃশ্যমূলক অভিমত (কিয়াস) ইসলামি শিক্ষার যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ উৎস।

একজন মুসলমানের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহর বিধিবিধান মেনে নেওয়া ও তাঁর সম্মতি অর্জন করাই হলো ইসলামি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। মূলত ইসলামি শিক্ষার ভিত্তি : তাওহিদ (আল্লাহর একত্ববাদ), রিসালাত (আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবি ও রাসুলগণ (আ.)-এর কার্যক্রম ও দাওয়াত) ও আখিরাত (মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের হিসাব-নিকাশ ও জাহান-জাহানাম ইত্যাদি) এ তিনটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা এগুলোর আলোকে জীবন গড়ব এবং জীবনকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করতে চেষ্টা করব।

নৈতিকতা

সততা, সদাচার, সৌজন্যমূলক আচরণ, সুন্দর স্বভাব, মিষ্টি কথা ও উন্নত চরিত্র- এ সবকিছুর সমন্বয় হলো নৈতিকতা। একজন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাল-চলন, উঠা-বসা, আচার-ব্যবহার, লেন-দেন সবকিছুই যখন প্রশংসনীয় ও গ্রহণযোগ্য হয় তখন তাকে নৈতিক গুণাবলি সম্পন্ন ব্যক্তি বলে। এই নৈতিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে রাসুলুল্লাহ (স.) সর্বোভূত লোক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, “নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে এ ব্যক্তি উন্নম, যার চরিত্র উন্নম” (বুখারি ও মুসলিম)।

নৈতিকতা হলো ব্যক্তির মৌলিক মানবীয় গুণ এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যা অর্জন করলে তার জীবন সুন্দর ও উন্নত হয়। এর মাধ্যমে সে অর্জন করে সম্মান ও মর্যাদা। ইসলামি শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া। নীতিহীন ও চরিত্রহীন মানুষ চতুর্পদ জন্মের চেয়েও নিকৃষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন, “তাদের হৃদয় আছে উপলব্ধি করে না, চোখ আছে দেখে না; কান আছে শুনে না; এরা হলো চতুর্পদ জন্মের ন্যায়, বরং তার থেকেও নিকৃষ্ট। আর এরাই হলো গাফিল” (সূরা আল-আরাফ, আয়াত ১৭৯)।

আমরা নৈতিকগুণে সন্মুক্ত হব এবং তা চর্চা করে উন্নম মানুষ হব।

নৈতিকতার গুরুত্ব

ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষকে ইমান ও নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য মহানবি (স.) প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, “আমি মহান নৈতিক গুণাবলিকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি” (বুখারি)।

নৈতিকতার কথা শুধু মুখে বললে চলবে না। বরং বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আদর্শসমূহ জীবনে বাস্তবায়ন করে নৈতিকতার প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) নীতিবান লোককে পরিপূর্ণ মুমিন হিসেবে অভিহিত করে বলেন-

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًاً أَحْسَنُهُمْ خُلُقًاً -

অর্থ : চরিত্রের বিচারে যে লোকটি উন্নত মুমিনদের মধ্যে সেই পূর্ণ ইমানের অধিকারী (তিরমিয়ি)।

মানুষের নৈতিকতা যত উন্নত হবে, সে তত উন্নত মানুষে পরিগত হবে। এভাবে সে আল্লাহ এবং তার রাসূল (স.)-এর প্রিয়পাত্র হবে। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) আরও বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে সেই লোকটিই আমার নিকট অধিক প্রিয় যার আখলাক (নৈতিকতা) সবচাইতে সুন্দর।” (বুখারি)। এমনিভাবে জনৈক ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নিকট জানতে চাইলেন মহান আল্লাহ মানুষকে অনেক কিছু দান করেছেন; এর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান দান কোনটি? নবি করিম (স.) বললেন, “সবচেয়ে মূল্যবান দান সুন্দর চরিত্র।”

আমাদের উচিত সুন্দর চরিত্র ও নৈতিক আচরণ অর্জন করে রাসূলাল্লাহ (স.)-এর প্রিয়পাত্র হওয়া। ইসলামি শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতা সম্পর্কে জানা ও তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা অধিকতর সহজ। ইসলামি শিক্ষার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি পরিপূর্ণ নৈতিকতা লাভ করতে পারে। তাই বলা যায় যে নৈতিক শিক্ষা ইসলামি শিক্ষণ অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কাজ : শিক্ষা ও নৈতিকতা বিষয়ে কুরআন-হাদিসের তিটি উদ্ধৃতি অর্থসহ উল্লেখ করবে।

পাঠ ১২

জিহাদ (ঐক্য)

পরিচিতি

জিহাদ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ পরিশ্রম, সাধনা, কষ্ট, চেষ্টা ইত্যাদি। আর ইসলামি পরিভাষায়, জান-মাল, ইলম, আমল, লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর দীনকে (ইসলামকে) সমুন্নত করাই হলো জিহাদ। অনেকেই জিহাদ বলতে শুধু রক্তপাত ও কতল (হত্যা) বোবেন। এটা সঠিক নয়। কেননা জিহাদ একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। পৃথিবীর যা কিছু উন্নত তাতেই আল্লাহর

সন্তুষ্টি । আর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই শুধু জিহাদ হতে পারে । আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন-

وَجَاهِهِدُوا فِي أَنْلُو حَقَّ جِهَادِ ط

অর্থ : আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত ৭৮)।

বক্তৃত সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে এবং অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব ধরনের চেষ্টা, শ্রম ও সাধনাই হলো জিহাদ ।

জিহাদের প্রকারভেদ

ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ তিন প্রকার-

(১) স্বীয় নফসের (প্রবৃত্তির) সাথে জিহাদ করা । যেমন হ্যরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন-

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَنَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ

অর্থ : প্রকৃত মুজাহিদ সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্য করার ব্যাপারে নিজের নফসের (কুপ্রবৃত্তির) সাথে জিহাদ করে (মুসলাদে আহমাদ)।

(২) জ্ঞানের সাহায্যে জিহাদ করা । এরূপ জিহাদকে পবিত্র কুরআনে জিহাদে কাবির (বড়) বলা হয়েছে ।
আল্লাহ বলেন-

فَلَا تُطِعْ الْكُفَّارِينَ وَجَاهِهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

অর্থ : সুতরাং আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না এবং আপনি কুরআনের (জ্ঞানের) সাহায্যে তাদের সাথে প্রবল জিহাদ চালিয়ে যান (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত ৫২)।

(৩) ইসলামের শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা । এটি হলো জিহাদের সর্বোচ্চ স্তর । কেউ ধর্মদ্রোহী হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে আঘাত হানলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ।

জিহাদের গুরুত্ব

জিহাদ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল । জীবনের সকল ক্ষেত্রে দীনের বৈশিষ্ট্যসমূহ রক্ষা করা এবং ইসলামের বিধিবিধান ও অনুশাসন মেনে চলা যেমন একজন মুমিনের দায়িত্ব, অনুরূপভাবে দীন রক্ষা করা, দীনকে সমৃদ্ধি রাখা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জিহাদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করাও তেমনিভাবে তার কর্তব্য । মূলত শাস্তির জন্য জিহাদ । বান্দাকে মানবীয় কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্ত করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর অনুগত বানিয়ে দেওয়া জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ।

জিহাদের ফজিলত বর্ণনায় রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন-

مَا اغْبَرَتْ قَدَّمَا عَبْدِِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ

অর্থ : আল্লাহর পথে যে বান্দার দু'পায়ে ধূলি লাগে তাকে জাহানামের আগ্নে স্পর্শ করবে না (বুখারি)।

কাজ : জিহাদ বিষয়ে কুরআন-হাদিসের ৫টি উকুতি অর্থসহ উল্লেখ করবে।

পাঠ ১৩

জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ (الْجِهَادُ وَالْإِرْهَابُ)

জিহাদ (جِهَاد) সম্পর্কে পূর্বের পাঠে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা এ পাঠে সন্ত্রাসবাদ (الْإِرْهَابُ) সম্পর্কে বর্ণনা করব।

সন্ত্রাসবাদ বলতে আমরা বুঝি পার্থিব কোনো স্বার্থ লাভের আশায় বিশৃঙ্খলা ও তাঙ্গবলীলার মাধ্যমে জনসাধারণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা ও তাদের ক্ষতি করা।

ইসলামি জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এক শ্রেণির লোক জিহাদ ও সন্ত্রাসকে এক করে ফেলেছে। বস্তুত উভয়ের মাঝে বিশাল পার্থক্য বিদ্যমান। বলা যায়, এ দুটো পরম্পর বিপরীত। রাজ্য জয়, ক্ষমতা দখল, সম্পদের লোভ, খুন-খারাবি, লুটতরাজ এবং অন্যায় রক্তপাত জিহাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে নিয়ে আসা এবং জুলুম ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে ইনসাফ ও ন্যায়ের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসাই জিহাদের উদ্দেশ্য।

মানুষকে সত্যনিষ্ঠ ও নৈতিকগুণে গুণাদ্঵িত করাও জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَّيَكُونَ الَّذِينُ كُلُّهُمْ لَهُوَ .

অর্থ : আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় (সূরা আল- আনফাল, আয়াত ৩৯)।

পক্ষান্তরে, সন্ত্রাসবাদের উদ্দেশ্য হলো অন্যায়ভাবে রক্তপাত করে রাজ্য জয়, ক্ষমতা দখল, সম্পদ অর্জন করা এবং লুটতরাজ ও খুন-খারাবির মাধ্যমে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

ইসলাম জিহাদের মাধ্যমে মুসলমানদের রক্তপাত করতে শিখায়নি। বরং ইসলাম যে জিহাদের কথা বলে তাতে রক্তপাত নয়, মানবতার দিকনির্দেশনা দেয়। মুসলমানদের কোনো জিহাদেই নিরপরাধ সাধারণ লোকজনের কোনো ক্ষতি হয়নি। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্ধশায় তিনি প্রায় একশত-এর কাছাকাছি

জিহাদে (যুদ্ধে) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

বর্তমান যুগে জিহাদের নামে যেভাবে বোমাবাজি, জঙ্গিবাদ, খুন-খারাবি ও নিরীহ লোকজনকে হত্যা করে নেরাজ্য সৃষ্টি করা হচ্ছে, তার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এটা সন্ত্রাসেরই নামান্তর। বক্তৃত জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ এক নয়।

উপরোক্ত আলোচনা ও বাস্তব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, জিহাদে সন্ত্রাসবাদের কোনো স্থান নেই। জিহাদের সাথে সন্ত্রাসবাদের সম্পর্ক নেই। সুতরাং আমরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও ইতিহাস জেনে জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করব এবং প্রকৃত মুসলমান হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য আলোচনা করবে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি

১. হজের ওয়াজিব কোনটি?

- ক. ইহরাম বাঁধা
- খ. আরাফাতের ময়দানে অবস্থান
- গ. তাওয়াফে যিয়ারত
- ঘ. বিদায়ী তাওয়াফ

২. সালাতের মাধ্যমে-

- i. মানুষের মধ্যে হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়
- ii. মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়
- iii. সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

দশ বছর বয়সী আরিফ শেষ রাতের খাবার খেয়ে একটি ইবাদতের নিয়ত করে। দুপুর বেলায় তার খুব ক্ষুধা পায় তখন তার বন্ধু জারিফ কেক নিয়ে বাসায় আসে। কিন্তু আরিফ কেক না খেয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে। আরিফের বাবা আমিন সাহেব এলাকার ধনাট্য ব্যক্তি। এলাকার দুটি দুষ্ট পরিবার আমিন সাহেবের নিকট সাহায্যের জন্য আসে। তিনি বছরান্তে মোট সম্পদের একটি অংশ দিয়ে তাদেরকে দুটি অটোরিকশা কিনে দেন।

৩. আরিফের কর্মকাণ্ডে কোন মৌলিক ইবাদতটি পালিত হয়েছে?

- ক. সালাত
- খ. যাকাত
- গ. সাওম
- ঘ. হজ

৪. আমিন সাহেবের কর্মকাণ্ডে যে ইবাদতটি পালিত হয়েছে, তার ফলে-

- i. মানুষের আত্মা পরিশুদ্ধ হবে
- ii. সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে
- iii. সমাজে নেতৃত্ব তৈরি হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

সংজ্ঞানশীল প্রশ্ন

(১)

দৃশ্যপট-১ : পরিচিত এক দোকানে একটি জামা দেখে জনাব 'ক'-এর খুব পছন্দ হয়। জামাটি কেনার মত টাকা তার পকেটে ছিলো না। তাকে দোকানে বসিয়ে দোকানদার কিছু সময়ের জন্য বাইরে যায়। জনাব 'ক' মনে মনে ভাবে জামাটি যদি না বলে নিয়ে যাই তাহলে কেউ দেখবে না। সাথে সাথে তার মনে হলো মহান আল্লাহ তাকে দেখছেন। 'ক' কাজটি থেকে নিজেকে বিরত রাখে।

দৃশ্যপট-২ : জনাব 'খ' আয়ান হওয়ার সাথে সাথে মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করেন। তিনি রাতের অধিকাংশ সময় তাহাঙ্গুদসহ অন্যান্য ইবাদত করেন। একদিন জনাব 'খ' কথা প্রসঙ্গে তার বন্ধু জনাব 'গ'-কে বলেন, আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর প্রষ্টা, এটা আমাদের মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে। তা না হলে আমাদের কোনো ইবাদত কবুল হবে না।

দৃশ্যপট-৩ : জনাব 'ঘ' দ্বিতীয় উপলক্ষে স্ত্রীর জন্য জামদানী শাড়ি, সন্তানদের জন্য দায়ি পোশাক এবং বাসার কাজের মেয়ের জন্য নতুন জামা কিনে আনেন। গ্রামের আতীয়দের জন্য পাঞ্জাবি ও শাড়ি কিনলেন। এছাড়াও দ্বিতীয় উপলক্ষে গ্রামের দরিদ্র অসহায় মানুষের মাঝে তিনি লুঙ্গি ও শাড়ি বিতরণ করেন।

ক. ইলম কী?

খ. 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।' ব্যাখ্যা করো।

গ. দৃশ্যপট-১-এ জনাব 'ক'-এর কর্মকাণ্ডে কোন ধরনের ইবাদত ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. দৃশ্যপট-২-এ জনাব 'খ' ও দৃশ্যপট-৩-এ জনাব 'ঘ'-এর কর্মকাণ্ডে যে ইবাদতসমূহ উঠেছে তা চিহ্নিত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে উভয় ইবাদতই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. 'আর তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।' ব্যাখ্যা করো।
২. সাওমের সামাজিক শিক্ষা উপলক্ষে করা প্রয়োজন কেন?
৩. 'যাকাত গরিবের প্রতি ধনীর দয়া নয়, গরিবের অধিকার।' ব্যাখ্যা করো।
৪. বিশ্ব আত্ম প্রতিষ্ঠায় হজের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।
৫. নৈতিকতা অর্জন করা জরুরি কেন?

চতুর্থ অধ্যায়

আখলাক (الْخُلُقُ)

আখলাক আরবি শব্দ। এটি বহুবচন। এর একবচন খুলুকুন (خُلُقٌ)। এর আভিধানিক অর্থ- স্বভাব, চরিত্র ইত্যাদি। শব্দগত বিবেচনায় আখলাক বলতে সচরিত্র ও দুশ্চরিত্র উভয়কেই বোঝায়। তবে প্রচলিত অর্থে আখলাক শুধু সচরিত্রকেই বুঝায়। যেমন ভালো চরিত্রের মানুষকে আমরা চরিত্রবান বলি। আর মন্দ চরিত্রের মানুষকে বলি চরিত্রহীন। ব্যবহারিক বিবেচনায় আখলাক দ্বারা ভালো ও উন্নত চরিত্রকে বোঝানো হয়।

মূলত আখলাক হলো মানুষের স্বভাবসমূহের সমষ্টির রূপ। মানুষের আচার-আচরণ, চিন্তা-ভাবনা, মানসিকতা, কর্মপদ্ধা সবকিছুকে একত্রে চরিত্র বা আখলাক বলা হয়। তা ভালো কিংবা মন্দ হতে পারে। এককথায়, মানুষের সকল কাজ ও নীতির সমষ্টিকেই আখলাক বলা হয়।

আখলাক দু'প্রকার। যথা-

ক. আখলাকে হামিদাহ (خُلُقُ حَمِيدَةٍ)

খ. আখলাকে যামিমাহ (خُلُقُ ذَمِيمَةٍ)

আখলাকে হামিদাহ হলো মানুষের গ্রন্থসন্নায় গুণাবলি আর আখলাকে যামিমাহ মানব স্বভাবের মন্দ অভ্যাসগুলোর সামষ্টিক নাম। আমরা আলোচ্য অধ্যায়ে এ দু'প্রকার আখলাকের পরিচয়, গুরুত্ব, কুফল এবং কতিপয় ভালো ও মন্দ চরিত্র সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- আখলাকের ধারণা, প্রকার ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- কতিপয় সদাচরণ (আখলাকে হামিদাহ) এর পরিচয় ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- তাকওয়ার ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ওয়াদা পালনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সত্যবাদিতার ধারণা ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- শালীনতার ধারণা ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- আমানতদারির পরিচয়, আমানত রক্ষার উপায় ও আমানতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ইসলামে মানবসেবার ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- ভাত্তবোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা ও সুফল বর্ণনা করতে পারব;
- ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- স্বদেশগ্রেমের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কর্তব্যপরায়ণতার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- ইসলামে পরিচ্ছন্নতার ধারণা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মিতব্যয়িতার ধারণা, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;

- আত্মশুন্দির ধারণা ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কতিপয় অসদাচরণ (আখলাকে যামিমাহ) এর পরিচয় ও এর কুফল বর্ণনা করতে পারব;
- প্রতারণার ধারণা ও এর কুফল ব্যাখ্যা করতে পারব;
- গিবত ও পরনিন্দার ধারণা ও এর কুফল ব্যাখ্যা করতে পারব;
- হিংসা-বিদ্বেষের ধারণা ও এর কুফল বর্ণনা করতে পারব;
- ফিতনা-ফাসাদের পরিচয় ও অপকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কর্মবিমুখতা ও অলসতার কুফল বর্ণনা করতে পারব;
- সুদ ও ঘুমের কুফল ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নিজ জীবনে অসদাচরণ পরিহার ও সদাচরণ অনুশীলনে উদ্বৃদ্ধ হব।

পাঠ ১

(الْأَخْلَاقُ الْحَمِيمَيْدَةُ) আখলাকে হামিদাহ

পরিচয়

আখলাক অর্থ চরিত্র, স্বভাব। আর হামিদাহ অর্থ প্রশংসনীয়। সুতরাং আখলাকে হামিদাহ অর্থ প্রশংসনীয় চরিত্র, সচরিত্র। ইসলামি পরিভাষায়, যেসব স্বভাব বা চরিত্র সমাজে প্রশংসনীয় ও সমাদৃত, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল (স.)-এর নিকট প্রিয় সেসব স্বভাব বা চরিত্রকে আখলাকে হামিদাহ বলা হয়।

এককথায়, মানব চরিত্রের সুন্দর, নির্মল ও মার্জিত গুণাবলিকে আখলাকে হামিদাহ বলা হয়। মানুষের সার্বিক আচার-আচরণ যখন শরিয়ত অনুসারে সুন্দর, সুষ্ঠু ও কল্যাণকর হয় তখন সে স্বভাব-চরিত্রকে বলা হয় আখলাকে হামিদাহ।

আখলাকে হামিদাহকে আখলাকে হাসানাহ বা হসনুল খুল্কও বলা হয়। আখলাকে হাসানাহ অর্থ সুন্দর চরিত্র। মানব চরিত্রের উত্তম ও নৈতিক গুণাবলি আখলাকে হামিদাহ এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন- সততা, সত্যবাদিতা, ওয়াদা পালন, মানব সেবা, পরিকার-পরিচ্ছন্নতা, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি।

গুরুত্ব

আখলাকে হামিদাহ মানবীয় মৌলিক গুণ ও জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এর দ্বারাই মানুষ পূর্ণমাত্রায় মনুষ্যত্বের স্তরে উপনীত হয়। মানবিকতা ও নৈতিকতার আদর্শ আখলাকে হামিদাহর মাধ্যমেই পরিপূর্ণতা লাভ করে। মানুষের ইহ ও পরকালীন সুখ, শান্তি উত্তম আখলাকের উপরই নির্ভরশীল। সচরিত্রবান ব্যক্তি যেমন সমাজের চোখে ভালো তেমনি মহান আল্লাহর নিকটও প্রিয়। মহানবি (স.)-এর হাদিসে বলা হয়েছে-

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

অর্থ : আল্লাহ তায়ালার নিকট সেই লোকই অধিক প্রিয়, চরিত্রের বিচারে যে উত্তম (ইবনে হিব্রান)।

এ জন্য মানুষকে আখলাক শিক্ষা দেওয়াও নবি-রাসূলগণের অন্যতম দায়িত্ব ছিল। আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। সব ধরনের সদ্গুণ তাঁর চরিত্রে পাওয়া যায়। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রসঙ্গে বলেছেন-

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

অর্থ : আর নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী (সূরা আল-কালাম, আয়াত ৪)।

রাসূলুল্লাহ (স.) ঘোষণা করেছেন,

إِنَّمَا بَعِثْتُ لِأُتْمِمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ -

অর্থ : উত্তম চারিত্রিক গুণাবলিকে পূর্ণতা দানের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি (বায়হাকি, আল-আদাবুল মুফরাদ)।

রাসূলুল্লাহ (স.) নিজে যেমন উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন তেমনি মানবজাতিকে সচরিত্র গঠনের শিক্ষা দিয়েছেন। পূর্ণাঙ্গ মুমিন হওয়ার জন্য তিনি সৎ ও নৈতিক স্বভাব অনুশীলনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, “মুমিনগণের মধ্যে সেই পূর্ণ ইমানের অধিকারী, যে তাদের মধ্যে চরিত্রের বিচারে সবচেয়ে উত্তম।” (তিরমিয়ি)

প্রকৃতপক্ষে সচরিত্র পরকালীন জীবনেও মানুষের কল্যাণের হাতিয়ার, মুক্তির উপায় হবে। উত্তম আচার-আচরণ মানুষকে পুণ্য বা সাওয়াব দান করে। মহানবি (স.) বলেছেন, **الْبَرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ**

অর্থ : সুন্দর চরিত্রই পুণ্য (মুসলিম)।

প্রশংসনীয় আচরণ ও স্বভাব কিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লা ভারী করবে। একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, “নিশ্চয়ই (কিয়ামতের দিন) মিয়ানে সুন্দর চরিত্র অপেক্ষা ভারী বস্তু আর কিছুই থাকবে না।” (তিরমিয়ি)

দুনিয়ার জীবনেও আখলাকে হামিদাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সচরিত্রবান ব্যক্তিকে সমাজের সবাই ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে, সম্মান দেখায় এবং তাঁর বিপদে-আপদে এগিয়ে আসে।

চরিত্রের কারণে তিনি সমাজে মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হন। মহানবি (স.) এ সম্পর্কে বলেছেন,

خَيَارٌ كُمْ أَحَسَنُكُمْ أَخْلَاقًا -

অর্থ : তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ সকল ব্যক্তি, যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্র বিচারে সুন্দরতম (বুখারি)।

সমাজের সকলে চরিত্রবান হলে সেখানে কোনোরূপ হিংসা-বিদেশ, মারামারি, হানাহানি থাকে না। সমাজ সুখে-শান্তিতে ভরে ওঠে।

সচরিত্র আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ নিয়ামত। দুনিয়ায় আগত সকল নবি-রাসূলই উভয় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। এ ছাড়াও পৃথিবীর স্মরণীয় ও বরণীয় মনীষীগণও উভয় নেতৃত্ব আদর্শ অনুশীলন করতেন। সচরিত্রের মাধ্যমেই ইসলামের যাবতীয় সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। এজন্য ইসলামে আখলাকে হামিদাহ অর্জনের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বারূপ করা হয়েছে।

শিক্ষা : শিক্ষার্থীরা আখলাকে হামিদাহর গুরুত সম্পর্কিত পাঠ্যবইয়ের আয়ত ও হাদিসসমূহ শিক্ষকের সহায়তায় অনুশীলন করবে এবং খাতায় লিখে দেখাবে।

পাঠ ২

তাকওয়া (التَّقْوَى)

পরিচয়

তাকওয়া শব্দের অর্থ বিরত থাকা, বেঁচে থাকা, ভয় করা, নিজেকে রক্ষা করা। ব্যবহারিক অর্থে পরহেজগারি, খোদাতীতি, আতঙ্গি ইত্যাদি বোঝায়। ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহ তায়ালার ভয়ে যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচার ও পাপকাজ থেকে বিরত থাকাকে তাকওয়া বলা হয়। অন্যকথায়, সকল প্রকার পাপাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করাকে তাকওয়া বলা হয়। যিনি তাকওয়া অবলম্বন করেন তাঁকে বলা হয় মুস্তাকি।

মহান আল্লাহকে ভয় করার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। আল্লাহ তায়ালা আমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা। তিনি আমাদের সবকিছু দেখেন, জানেন। তিনি শাস্তিদাতা ও মহাপরাক্রমশালী। হাশরের দিনে তিনি আমাদের সকল কাজের হিসাব নেবেন। অতঃপর পাপকাজের জন্য শাস্তি দেবেন। আল্লাহ-ভীতি হলো আল্লাহ তায়ালার সামনে জবাবদিহি করার ভয়। অতঃপর এরূপ অনুভূতি মনে ধারণ করে সকল পাপ থেকে বেঁচে থাকতে হয়। সকল প্রকার অন্যায়, অত্যাচার, অশ্রীল কথা-কাজ ও চিন্তাভাবনা থেকে বিরত থাকতে হয়। আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করলে এসব পাপ থেকে সহজেই বেঁচে থাকা যায়। ফলে মুস্তাকিগণ পরকালে জাল্লাতে প্রবেশ করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দণ্ডযামান হওয়ার ভয় করবে ও কুপ্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকবে, তার স্থান হবে জাল্লাত।” (সূরা আল-নাফিআত, আয়াত ৪০-৪১)

গুরুত্ব

তাকওয়া একটি মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মানবজীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। তাকওয়া মানুষকে ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জীবনকেই সম্মান-মর্যাদা ও সফলতা দান করে। ইসলামি জীবন দর্শনে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি হলেন মুস্তাকিগণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْلُمُ^٦

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান (সূরা আল-হজুরাত, আয়াত ১৩)।

আল্লাহ তায়ালার নিকট তাকওয়ার মূল্য অত্যধিক। ধন-সম্পদ, শক্তি-ক্ষমতা, গাড়ি-বাড়ি থাকলেই মানুষ আল্লাহ তায়ালার নিকট মর্যাদা লাভ করতে পারে না। বরং যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করতে পারেন সেই আল্লাহ তায়ালার নিকট বেশি মর্যাদাবান। আল্লাহ তায়ালা তাকে ভালোবাসেন। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং বলেছেন-

○ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

অর্থ : নিচয়ই আল্লাহ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন (সূরা আত্-তাওবা, আয়াত ৪)।

পার্থিব জীবনে মুত্তাকিগণ আল্লাহ তায়ালার বহু নিয়মত লাভ করে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা তাকওয়াবানদের সর্বদা সাহায্য করেন। তাদেরকে পাপপচার থেকে রক্ষা করেন ও বরকতময় রিযিক দান করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ করে দেবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করবেন” (সূরা আত্-তালাক, আয়াত ২-৩)।

পরকালেও তাকওয়াবানদের জন্য রয়েছে মহাপুরুষ। আল্লাহ তায়ালা শেষ বিচারের দিন মুত্তাকিদের সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং মহাসফলতা দান করবেন। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, “হে মুমিনগণ! যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর (আল্লাহকে ভয় কর) তবে আল্লাহ তোমাদের ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অতিশয় মঙ্গলময়” (সূরা আল-আনফাল, আয়াত ২৯)।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, ○ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا

অর্থ : নিচয়ই মুত্তাকিগণের জন্য রয়েছে সফলতা (সূরা আন-নাবা, আয়াত ৩১)।

প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া মানব চরিত্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্বভাব। এর মাধ্যমে মানুষ সম্মান, মর্যাদা ও সফলতা লাভ করে।

নৈতিক জীবনে তাকওয়ার প্রভাব

নৈতিক জীবন গঠনে ও নীতি-নৈতিকতা রক্ষায় তাকওয়ার প্রভাব অনন্বীক্ষ্য। তাকওয়া সকল সংগ্রহের মূল। ইসলামি নৈতিকতার মূল ভিত্তি হলো তাকওয়া। তাকওয়া মানুষকে মানবিক ও নৈতিক গুণাবলিতে উদ্বৃক্ষ করে; হারাম বর্জন করতে এবং হালাল গ্রহণ করতে প্রেরণা যোগায়। মুত্তাকি ব্যক্তি সদাসর্বদা আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করেন। আল্লাহ তায়ালা সরকিতু দেখেন, শোনেন, জানেন, এ বিশ্বাস পোষণ করেন। ফলে তিনি কোনোক্রমে অন্যায় ও অনৈতিক কাজ করতে পারেন না। কোনোক্রমে অশ্রীল ও অশালীন কথা, কাজ ও চিন্তাভাবনা করতে পারেন না। কেননা তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, পাপ যত গোপনেই করা হোক না কেন, আল্লাহ তায়ালা তা দেখেন ও জানেন। কোনোভাবেই আল্লাহ তায়ালাকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে তাকওয়াবান ব্যক্তি সকল কাজেই নীতি-নৈতিকতা অবলম্বন করেন এবং অনৈতিকতা ও অশ্রীলতা পরিহার করেন।

তাকওয়া মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে এবং সচরিত্র হিসেবে গড়ে তোলে। সকল সৎ ও সুন্দর গুণ অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করে। ফলে মুত্তাকিগণ সৎ ও সুন্দর গুণ অনুশীলনে অনুপ্রাণিত হন। অন্যদিকে যার মধ্যে তাকওয়া নেই, সে নিষ্ঠাবান ও সৎকর্মশীল হতে পারে না। সে নানা অন্যায় অত্যাচারে লিঙ্গ থাকে। নৈতিক ও মানবিক আদর্শের পরোয়া করে না। ফলে তার দ্বারা সমাজে অনৈতিকতা ও অপরাধের প্রসার ঘটে। বস্তুত তাকওয়া হলো মহৎ চারিত্রিক গুণ। নৈতিক চরিত্র গঠনে এর কোনো বিকল্প নেই। আমরা সকলেই তাকওয়াবান হওয়ার চেষ্টা করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দৈনন্দিন জীবনে তাকওয়ার প্রভাব সম্পর্কে জোড়ায় আলোচনা করবে এবং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের সামনে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৩ (الوفاء بالوعد) ওয়াদা পালন

পরিচয়

আরবি আল-আহ্দু (الْعَهْدُ) এর শাব্দিক অর্থ- ওয়াদা, অঙ্গীকার, প্রতিশ্রূতি, চুক্তি, কাউকে কোনো কথা দেওয়া বা কোনো কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় কারও সাথে কোনোরূপ প্রতিশ্রূতি দিলে, অঙ্গীকার করলে বা কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে রক্ষা করাকে ওয়াদা পালন বলে।

গুরুত্ব

ওয়াদা পালন আখ্লাকে হামিদাহর অন্যতম গুণ। মানবজীবনে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ওয়াদা পালনের ফলে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে তাকে সবাই ভালোবাসে। তার প্রতি সকলের আস্থা ও বিশ্বাস থাকে। সমাজে সে শৰ্কা ও মর্যাদা লাভ করে। ইসলামি জীবন দর্শনে ওয়াদা পালন করা আবশ্যিক। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন,

يَسِّرْ لِهَا الْزِيَّنَ أَمْنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ

অর্থ : হে ইমানদারগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ১)।

অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

অর্থ : আর তোমরা প্রতিশ্রূতি পালন কর। নিশ্চয়ই প্রতিশ্রূতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত ৩৪)।

প্রতিশ্রূতি ও ওয়াদা পালন করা অত্যাবশ্যিক। হাশরের ময়দানে প্রতিশ্রূতির ব্যাপারে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ওয়াদা পালন করে না, আখ্রিতে সে শান্তি ভোগ করবে।

ওয়াদা পালন করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। সৎ ও নৈতিক গুণাবলির অধিকারী ব্যক্তিগণ সর্বদা ওয়াদা রক্ষা করে থাকেন। যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না সে পূর্ণাঙ্গ মুমিন ও দীনদার হতে পারে না। একটি হাদিসে মহানবি (স.) বলেছেন,

لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ -

অর্থ : যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না, তার দীন নেই (মুসনাদে আহমাদ)।

আমাদের প্রিয়নবি (স.) সর্বদাই ওয়াদা পালন করেছেন। সাহাবি ও আউলিয়া কেরামের জীবনী পর্যালোচনা করলেও আমরা দেখতে পাই যে, তাঁরা তাঁদের জীবনে কোনো ওয়াদা ভঙ্গ করতেন না। কেবল ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকের নির্দেশ। মুনাফিকরা ওয়াদা করলে তা পূর্ণ করে না। আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের একপ না করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কেবল মুমিন-মুসলমানের নির্দেশ হলো তারা ওয়াদা পালন করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا إِنَّمَا تَفْعَلُونَ

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা যা পালন করো না এমন কথা কেন বলো? (সূরা আস- সাফ্ফ, আয়াত ২)

সুতরাং কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে, প্রতিশ্রূতি দিলে তা রক্ষা করতে হবে। প্রতিজ্ঞা করলে বা চুক্তি সম্পাদন করলে তা পূর্ণ করতে হবে। তাহলে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হবেন। দুনিয়া ও আধিবাতে শান্তি-সফলতা লাভ করা যাবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ওয়াদা পালনের গুরুত্ব সম্পর্কে আল কুরআন ও হাদিসের উক্তি উল্লেখপূর্বক একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।

পাঠ ৪

সত্যবাদিতা (الصِّدْقُ)

পরিচয়

সত্যবাদিতার আরবি প্রতিশব্দ আস-সিদ্ক। সাধারণভাবে সত্য কথা বলার অভ্যাসকে সত্যবাদিতা বলা হয়। অন্যকথায়, বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনা বা বিষয় প্রকাশ করাকে সিদ্ক বলা হয়। অর্থাৎ কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে কোনোরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বিকৃতি ব্যতিরেকে হ্রবহু বা অবিকল বর্ণনা করাই হলো সিদ্ক। যে ব্যক্তি সত্যবাদী তাকে বলা হয় সাদিক (صَادِقٌ)। আর মহাসত্যবাদীকে সিদিক (صِّدِّيقٌ) বলে।

সত্যবাদিতার বিপরীত হলো মিথ্যাচার। কোনো ঘটনা বা বিষয়কে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হলো মিথ্যাচার। যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে তাকে বলা হয় কায়িব (الْكَاذِبُ) আর চরম মিথ্যাবাদী হলো কায়্যাব (الْكَذَّابُ)।

গুরুত্ব

সত্যবাদিতা একটি মহৎ গুণ। মানবজীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণে সত্যবাদিতা ও সততা অবশ্যই করলে মানুষ দুনিয়া ও আধিরাতে সফলতা লাভ করতে পারে। সদা সর্বদা সত্য, সুন্দর ও সঠিক কথা বলা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ। তিনি বলেন,

○ يَٰٰيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّقُوْلَةَ قَوْلًا سَيِّدًا

অর্থ : হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ও সঠিক কথা বলো (সূরা আল-আহ্যাব, আয়াত ৭০)।

মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী মুমিনগণের একটি অন্যতম নির্দর্শন হলো তাঁরা সত্যবাদী। জীবনের সর্বাবস্থায় তাঁরা সততা ও সত্যবাদিতার চর্চা করেন। শুধু নিজে নিজে সত্য বলার চর্চা করলেই হবে না বরং সত্যবাদীদের সাথে সুসম্পর্ক থাকতে হবে। এতে সবাজে সার্বিকভাবে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, “হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও সত্যবাদীদের সাথি হও” (সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত ১১৯)।

প্রকৃত মুমিন অবশ্যই সত্যবাদী হবেন। আমাদের প্রিয়নবি (স.) ছিলেন সত্যবাদিতার মূর্ত প্রতীক। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি সততা ও সত্যবাদিতার চর্চা করেছেন। তাঁর সাথি হ্যরত আবু বকর (রা.) ও ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী। তাই হ্যরত আবু বকর (রা.)-কে বলা হয় সিদ্ধিক।

যে ব্যক্তি সত্য কথা বলে তাকে সবাই ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী তাকে কেউ ভালোবাসে না, সম্মান করে না। বরং সকলেই তাকে ঘৃণা করে। কেননা মিথ্যা বলা মহাপাপ। এটি সকল পাপের মূল। মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ তায়ালা চরম অসন্তুষ্টি।

প্রভাব ও পরিণতি

মানবজীবনে সত্যবাদিতার প্রভাব সীমাহীন। সত্যবাদিতা মানুষকে নৈতিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। পাপ ও অশালীন কাজ থেকে রক্ষা করে। সত্যবাদী ব্যক্তি কোনোরূপ অন্যায় ও অত্যাচার করতে পারে না। একটি হাদিসে আমরা এর প্রমাণ পাই। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, একদা জনৈক ব্যক্তি মহানবি (স.)-এর নিকট এসে বলল, ‘আমি চুরি করি, মিথ্যা বলি এবং আরও অনেক খারাপ কাজ করি। সবগুলো খারাপ কাজ একসঙ্গে ত্যাগ করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আপনি আমাকে যেকোনো একটি খারাপ কাজ ত্যাগ করতে নির্দেশ দিন।’ মহানবি (স.) বললেন, “তুমি মিথ্যা বলা ছেড়ে দাও।” লোকটি বলল, এ তো খুব সহজ কাজ। মহানবি (স.)-এর কথামতো লোকটি মিথ্যা বলা ছেড়ে দিল। পরে দেখা গেল যে, মিথ্যা বলা ত্যাগ করায় তাঁর পক্ষে আর কোনো খারাপ কাজ করা সম্ভব হলো না। সে সবগুলো খারাপ কাজ ছেড়ে দিল। কেননা সে ভাবল, কেউ তাকে অপরাধের কথা জিজেস করলে সে মিথ্যা বলতে পারবে না। বরং শ্বেতার করতে হবে। এতে সে লজ্জিত হবে ও শাস্তি ভোগ করবে। এভাবে শুধু মিথ্যা ত্যাগ করায় লোকটি সকল খারাপ কাজ থেকে মুক্তি পেল। সত্যবাদিতা এভাবেই মানুষকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে সাহায্য করে।

সত্যবাদিতার পরিণতি হলো সফলতা ও মুক্তি। যেমন বলা হয়,

الصَّدْقُ يُنْجِي وَالْكُنْدُبُ يُهْلِكُ -

অর্থ : সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে।

সত্যবাদিতার ফলে মানুষ দুনিয়াতে সমানিত হয়, মর্যাদা লাভ করে। আর আধিরাতে সত্যবাদিতার প্রতিদান হলো জাহাত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, **هُذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صَدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَاحٌ**

অর্থ : এ তো সেই দিন, যে দিন সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদিতা বিশেষ উপকার দান করবে। তাদের জন্য রয়েছে জাহাত (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ১১৯)।

মহানবি (স.) বলেন, “তোমরা সত্যবাদী হও। কেননা সত্য পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জাহাতের পথে পরিচালিত করে” (বুখারি ও মুসলিম)।

অন্য একটি হাদিসে আছে, একবার মহানবি (স.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কী আমল করলে জাহাতবাসী হওয়া যায়? তিনি উত্তরে বললেন, “সত্য কথা বলা” (মুসনাদে আহমাদ)।

সত্যবাদিতা নৈতিক গুণাবলির অন্যতম প্রধান গুণ। এটি মানুষকে প্রভৃতি কল্যাণ ও সফলতা দান করে। সুতরাং আমাদের সকলেরই সত্যবাদী ও সত্যাশ্রয়ী হওয়া একান্ত কর্তব্য।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সত্যবাদিতার গুরুত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে বাস্তব কিছু দৃষ্টান্ত দলগতভাবে আলোচনা করবে এবং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের নির্দেশনায় উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৫

শালীনতা (الحِيَاءُ)

শালীনতা অর্থ মার্জিত, সুন্দর ও শোভন হওয়া। কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ও চলাফেরায় ভদ্র, সভ্য ও মার্জিত হওয়াকেই শালীনতা বলা হয়। গর্ব-অহঙ্কার, উদ্ধৃত্য ও অশ্লীলতা ত্যাগ করে জীবনাচরণের সকল ক্ষেত্রে ইসলামি নীতি-আদর্শের অনুসারী হওয়ার দ্বারা শালীনতা অর্জন করা যায়।

শালীনতার পরিবি অত্যন্ত ব্যাপক। এটি বহু নৈতিক গুণের সমষ্টি। ভদ্রতা, ন্যৰতা, সৌন্দর্য, সুরুচি, লজ্জাশীলতা ইত্যাদি গুণাবলির সমন্বিত রূপের মাধ্যমে শালীনতা প্রকাশ পায়। অশ্লীলতা হলো শালীনতার বিপরীত। গর্ব-অহঙ্কার, উদ্ধৃত্য, কুরুচি ও কুসংস্কার শালীনতাবিরোধী অভ্যাস। এগুলো থেকে বেঁচে থাকাই শালীনতা অর্জনের উপায়।

শালীনতার গুরুত্ব

ইসলাম সৌন্দর্যের ধর্ম। এটি সুন্দর, সুষ্ঠু ও সুরুচিপূর্ণ জীবনযাপনে উৎসাহিত করে। মার্জিত, ন্যৰ, ভদ্র ও পৃত-পবিত্র হিসেবে মানুষকে গড়ে তোলা ইসলামি শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। আর এ লক্ষ্যে শালীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। বলা যায়, শালীনতাই হলো ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি।

ইসলাম সকল মানুষকেই ন্যূন, অদ্র ও শালীন হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে। যেসব কাজ শালীনতাবিরোধী, ইসলামে সেসব কাজকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা অশ্রীল ও অশালীন কাজকর্ম মানুষের মানবিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিনষ্ট করে দেয়। মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশ্চত্ত্বের অভ্যাস গ্রহণ করে। ফলে সমাজে অনাচার, ব্যভিচার, অশ্রীলতা ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের কৃপ্তবৃত্তি ও কামনা-বাসনা পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ ভেঙ্গে দেয়। যার কারণে সর্বত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

শালীনতার অভাব অনেক সময় সমাজে অশ্রীলতার প্রসার ঘটায়। যৌন হয়রানি, ব্যভিচার ইত্যাদির জন্ম হয়। এজন্য ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়কে পর্দা রক্ষা ও শালীনতা বজায় রাখার জন্য জোর তাপিদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, “আর তোমরা (নারীরা) নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহিলি যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না” (সূরা আল-আহ্যাব, আয়াত ৩৩)।

অতএব, বিনা প্রয়োজনে অশালীনভাবে নারীদের বাইরে ঘুরে বেড়ানো উচিত নয়। বরং প্রয়োজনে বাইরে গেলে পর্দা ও শালীনতা অবলম্বন করে যেতে হবে। পুরুষদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। তাদেরকেও অবশ্যই শালীনভাবে সমাজে বিচরণ করতে হবে।

পৃত-পরিত্রিতা ও শালীনতার অন্যতম বিষয় হলো লজ্জাশীলতা। লজ্জাশীলতা মানুষকে শালীন হতে সাহায্য করে। লজ্জাশীলতার ফলে মানুষ পরকালীন সফলতা লাভ করবে। মহানবি (স.) বলেন, ﴿أَكْيَانُ شَعْبَةٍ مِّنَ الْأَمْرَاءِ﴾ অর্থ : লজ্জাশীলতা ইমানের একটি শাখা (সুনানে নাসাই)।

অর্থ : লজ্জাশীলতার পুরোটাই কল্যাণময় (মুসলিম)।

মহানবি (স.) আরও বলেন, ﴿أَكْيَانُ شَعْبَةٍ مِّنَ الْأَمْرَاءِ﴾ অর্থ : “লজ্জাশীলতা ইমানের একটি শাখা (সুনানে নাসাই)।

রাসূলুল্লাহ (স.) আরও বলেন, “অশ্রীলতা যেকোনো জিনিসকে খারাপ করে এবং লজ্জাশীলতা যেকোনো জিনিসকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে” (তিরমিয়ি)।

সুতরাং চলাফেরা, পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, আচার-আচরণে লজ্জাশীল হওয়া প্রয়োজন। সর্বাবস্থায় রুচিসম্মত, অদ্র, সুন্দর ও মার্জিত গুণাবলির অনুসরণ করার দ্বারা শালীনতা চর্চা করা যায়। শালীনতার ফলে মানুষের মান-সম্মান সুরক্ষিত থাকে, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব, আমরা সকল কাজে শালীনতা রক্ষা করব। অশ্রীল ও অশালীন কাজ ত্যাগ করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শালীনতার গুরুত্ব সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৬

আমানত (الْأَمَانَةُ)

পরিচয়

আমানত আরবি শব্দ। এর অর্থ গচ্ছিত রাখা, নিরাপদ রাখা। সাধারণত কারও নিকট কোনো অর্থ-সম্পদ, কথা গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলা হয়। তবে ব্যাপকার্থে শুধু ধন-সম্পদ নয় বরং যেকোনো জিনিস গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলে। কেউ কারো নিকট কোনো সম্পদ গচ্ছিত রাখলে তা যথাযথ সংরক্ষণ করা এবং সম্পদের মালিককে ফেরত দেওয়াকে আমানতদারিতা বলে। একজনের জান, মাল, সম্মান, কথা-প্রতিজ্ঞা সবকিছুই অন্যের নিকট আমানত স্বরূপ। যিনি গচ্ছিত সম্পদ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেন এবং তা প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেন তাকে বলা হয় আমিন বা আমানতদার।

আমানতের বিপরীত হলো খিয়ানত। খিয়ানত অর্থ আত্মসাং করা, ক্ষতিসাধন করা, ভঙ্গ করা। আমানতকৃত দ্রব্য বা বিষয় যথাযথভাবে প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরিয়ে না দিয়ে আত্মসাং করাকে খিয়ানত বলে। যে ব্যক্তি গচ্ছিত জিনিসের খিয়ানত করে তাকে খায়িন (نَجِيْرٌ) বলা হয়।

আমানত রক্ষার গুরুত্ব

আমানত রক্ষা করা আখলাকে হামিদাহ-র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। সচেরিত্রি ব্যক্তির মধ্যে আমানতদারি বিশেষভাবে বিদ্যমান থাকে। আমানত রক্ষা করা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার মালিকের নিকট প্রত্যাপণ করতে।” (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৫৮)

আমানত রক্ষা করা মুমিনের জন্য আবশ্যিক। প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি কোনো অবস্থাতেই আমানতের খিয়ানত করে না। মহানবি (স.) বলেছেন, لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَمْ يَحْفَظْ

অর্থ : যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ইমান নেই (মুসলাদে আহমাদ)।

আমানত রক্ষা করা ইমানের অঙ্গ স্বরূপ। আমানতের খিয়ানত করা ইমানদারের বৈশিষ্ট্য নয়। বরং এটি মুনাফিকের চিহ্ন। আমাদের প্রিয়নবি (স.) ছিলেন আমানতদারির মূর্ত প্রতীক। ঘোর শক্ররাও তাঁকে আমানতদার হিসেবে জানত, তাঁর নিকট তাদের মূল্যবান ধন-সম্পদ আমানত রাখত। তাঁকে তারা আল আমিন বা বিশ্বাসী তথা আমানতদার নামে ডাকত। রাসুলুল্লাহ (স.) ও সারাজীবন আমানত রক্ষা করে চলেছেন। এমনকি হিজরতের সময় মকার কাফিররা যখন তাঁকে হত্যা করতে বের হয়, তখনও তিনি আমানতের কথা ভোগেননি। তিনি তাদের গচ্ছিত সম্পদ প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ইসলামি জীবন দর্শনে আমানত রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমানতের খিয়ানত করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, হারাম। মহানবি (স.)-এর হাদিসে এসেছে খিয়ানত করা মুনাফিকদের অন্যতম নির্দশন স্বরূপ। আল্লাহ তায়ালা খিয়ানতকারীর প্রতি অসন্তুষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন ۝لَمْ يُحِبِّ اللَّهَ مَنْ لَمْ يَأْمُرْ

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা খিয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না (সূরা আল-আনফাল, আয়াত ৫৮)।

খিয়ানত মানুষের পার্থিব জীবনেও বিপর্যয় ডেকে আনে। মহানবি (স.) বলেছেন, “আমানতদারি সচ্ছলতা ও খিয়ানত দারিদ্র্য ডেকে আনে” (মুসনাদে শিহাব আল-কায়ায়ি)।

খিয়ানতকারী মানুষের আঙ্গু ও বিশ্বাস ভঙ্গ করে। লোকেরা তাকে ঘৃণা করে। এড়িয়ে চলে। তার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন করতে আগ্রহী হয় না। ফলে খিয়ানতকারী আর্থিকভাবেও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

আমানতের ক্ষেত্র

কারও নিকট কোনো দ্রব্য বা জিনিস গচ্ছিত রাখা হলে তা অবশ্যই যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। গচ্ছিত দ্রব্যে কোনোরূপ পরিবর্তন করা যাবে না। তা নিজ কাজে ব্যবহার করা যাবে না। বরং প্রকৃত মালিক যখন চাইবে তখনই তা ফিরিয়ে দিতে হবে। এটাই আমানতের ইসলামি নীতি ও পদ্ধতি।

আমানতের ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। শুধু ধনসম্পদই আমানত নয়, বরং কথা, কাজ, মান-সম্মানও আমানত হতে পারে। মহানবি (স.) বলেছেন, “যখন কোনো লোক কথা বলে অস্থান করে, তখন সে কথাও এক প্রকার আমানত স্বরূপ” (আবু দাউদ)।

অর্থাৎ কেউ বিশ্বাস করে কোনো কথা বললে এবং তা গোপন রাখতে বললে সে কথাও আমানত স্বরূপ। সে কথা অন্যের নিকট বলে ফেললে আমানতের খিয়ানত করা হয়।

বস্তুত ইসলামে মানুষের প্রতিটি দায়িত্ব ও কর্তব্যই আমানত স্বরূপ। ব্যক্তিগত কাজের পাশাপাশি মানুষকে আরও বহু দায়িত্ব পালন করতে হয়। মানুষের এসব পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক দায়িত্ব আমানত হিসেবে গণ্য। নিম্নে আমানতের কতিপয় ক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো-

১. মাতাপিতার নিকট সন্তান আমানত স্বরূপ। সন্তানকে সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করা, তাদের সুশিক্ষা দিয়ে বড় করে তোলা তাদের দায়িত্ব।
২. সন্তানের নিকট মাতাপিতা আমানত। মাতাপিতার আনুগত্য করা, তাদের সেবা করা সন্তানের কর্তব্য ও আমানত।
৩. শিক্ষকের নিকট ছাত্র-ছাত্রী আমানত। তাদের সুশিক্ষা দেওয়া আমানত স্বরূপ।
৪. ছাত্রছাত্রীদের নিকট বিদ্যালয়ের সব আসবাবপত্র আমানত। এগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা তাদের কর্তব্য। শিক্ষকদের সম্মান করা, সুন্দরভাবে গড়াশুনা করা ইত্যাদিও শিক্ষার্থীদের নিকট আমানত স্বরূপ।
৫. কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিকট ঐ প্রতিষ্ঠান আমানত স্বরূপ। ঐ প্রতিষ্ঠানের সরকিছু রক্ষণাবেক্ষণ করা তাদের কর্তব্য।
৬. সরকারের নিকট রাষ্ট্রের সকল সম্পদ ও জনগণের অধিকার আমানত স্বরূপ। এগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহার না করা খিয়ানত হিসেবে গণ্য।
৭. জনগণের নিকট রাষ্ট্র আমানত স্বরূপ। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষা করা, জাতীয় উন্নয়নের চেষ্টা করা জনগণের কর্তব্য। রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় করা খিয়ানত হিসেবে গণ্য।

আমানত একটি মহৎপুণ্য। নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমে মানুষ আমানত রক্ষা করতে পারে। আমরা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে আমানত রক্ষা করতে সচেষ্ট হব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দৈনন্দিন জীবনে আমানত রক্ষার গুরুত সম্পর্কে পরিত্ব কুরআন ও হাদিসের উকৃতিগুলো খাতায় লিখে অনুশীলন করবে এবং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের নিকট তা উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৭

মানবসেবা (إِلَّا نِسَانِيَةٌ) (خِدْمَةُ

পরিচয়

মানবসেবা বলতে মানুষের সেবা করা, পরিচর্যা করা, যত্ন নেওয়া, সাহায্য-সহযোগিতা করা ইত্যাদি বোঝায়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবা করা মানবসেবার আওতাভুক্ত।

মানুষ হলো আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তায়ালা সবকিছুই মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষের কর্তব্য হলো এসব সৃষ্টির প্রতি সদয় হওয়া ও তাদের সাথে যথাযথ ব্যবহার করা। পাশাপাশি অন্য মানুষের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করাও মানুষের অন্যতম দায়িত্ব। কেননা পরম্পরার সেবা ও সহযোগিতার মাধ্যমেই বিশ্বে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হয়।

ইসলামে সবরকমের হক বা অধিকার দু'ভাগে বিভক্ত। তাহলো হাকুল্লাহ ও হাকুল ইবাদ। হাকুল্লাহ হলো আল্লাহ তায়ালার হক। সব রকমের ইবাদত, প্রশংসা, তাসবিহ-তাহলিল এর অন্তর্ভুক্ত। আর হাকুল ইবাদ হলো বান্দার হক। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালোবাসা, সকলের সেবা করা, সাহায্য-সহযোগিতা করা হাকুল ইবাদের অন্তর্ভুক্ত। মানবসেবা হলো হাকুল ইবাদের অন্যতম দিক।

গুরুত্ব

মানবসেবা আখলাকে হামিদাহর অন্যতম বিষয়। মানবসেবা মানুষের উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক। যে ব্যক্তি মানুষের সেবা করেন তিনি মহৎপুণ্য। সমাজে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তায়ালাও একপ ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। যিনি মানুষের সেবা, সাহায্য-সহযোগিতা করেন আল্লাহ তায়ালাও তাঁকে সাহায্য ও দয়া করেন। মহানবি (স.) বলেন—

لَا يَرْكِعُ اللَّهُ مِنْ لَا يَرْكِعُ النَّاسُ -

অর্থ : যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না (বুখারি)।

إِذْ هُوَ أَمَنَ فِي الْأَرْضِ يَرْكِعُ كُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

অর্থ : তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন (তিরমিয়ি)।

অন্য একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যের থাকে ততক্ষণ আল্লাহ তাকে সাহায্য করতে থাকেন” (মুসলিম)।

বস্তুত, সকল মানুষ ভাই ভাই। সকলেই আদম (আ.)-এর সঙ্গান। সুতরাং যে ব্যক্তি অন্য ভাইয়ের সাহায্য করে আল্লাহ তায়ালাও সে ব্যক্তির সাহায্য করেন, তার বিপদাপদ দূর করেন।

মানবসেবা করা মুমিনের অন্যতম গুণ। মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই অন্য মানুষের খেদমতে নিয়োজিত থাকেন। মহানবি (স.) এ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, “তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, ঝগ্ণ ব্যক্তির সেবা কর, বন্দীকে মুক্ত কর এবং খণ্ড-গ্রাসকে খণ্ডমুক্ত কর” (বুখারি)।

নানাভাবে মানুষের সেবা করা যায়। ক্ষুধার্তকে অল্পদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, অসহায়কে আশ্রয় দান, রোগীর সেবা করা, নিঃস্ব-দুঃস্থদের আর্থিক সাহায্য করার মাধ্যমে মানবসেবা করা যায়। ছেট ও বৃক্ষদের সাহায্য করা, দয়া-মায়া-মতা প্রদর্শন করা, তাদের প্রতি ভালোবাসা দেখানো মানবসেবার অন্তর্ভুক্ত।

মানবসেবার প্রতিদান সীমাহীন। আল্লাহ তায়ালা শেষ বিচারের দিন মানুষের সেবাকারীকে প্রভূত পুরস্কার ও নিয়মত দান করবেন। মহানবি (স.) বলেন, “কোনো মুসলমান অন্য মুসলমানকে কাপড় দান করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের পোশাক দান করবেন। ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের সুস্থাদু ফল দান করবেন। কোনো ত্যাগী মুসলমানকে পানি পান করালে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের সিলমোহরকৃত পাত্র থেকে পরিত্র পানীয় পান করাবেন” (আরু দাউদ)।

আমাদের প্রিয় নবি (স.) মানবসেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। ছেট-বড়, ধনী-গরিব, মুসলিম-অমুসলিম সকলকেই তিনি সাহায্য-সহযোগিতা করতেন, সকলের খৌজ খবর নিতেন। বিপদগ্রস্ত, অভাবীদের সহায়তা করতেন। তাঁর দয়া, মায়া ও সহানুভূতি থেকে তাঁর চরম শক্তি বিপ্রিত হতো না। রাসুল (স.)-এর জীবনী পাঠ করলে আমরা এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। রাসুলুল্লাহ (স.)-কে কষ্টদানকারী বুড়ির ঘটনা আমরা সবাই জানি। এক কাফির বৃক্ষ প্রতিদিন রাসুলুল্লাহ (স.)-এর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। এতে মহানবি (স.)-এর পথ চলতে কষ্ট হতো। তারপরও তিনি বুড়িকে কিছু বলতেন না। একদিন তিনি পথে কাঁটা দেখলেন না। দয়ালু নবি (স.) ভাবলেন, নিশ্চয়ই বুড়ি অসুস্থ। এজন্য পথে কাঁটা দিতে পারেনি। তিনি খুঁজে বুড়ির বাড়ি গেলেন। গিয়ে দেখলেন বুড়ি সত্যিই অসুস্থ। তার সেবা করারও কেউ নেই। নবিজি (স.) বুড়ির শিয়রে বসলেন। তার সেবা-যত্ন করলেন। ফলে বুড়ি ভালো হয়ে উঠল। সে তার অপকর্মের জন্য লজ্জিত হলো। সে আর কোনোদিন পথে কাঁটা দেয়নি।

সকল মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা করা রাসুলুল্লাহ (স.)-এর আদর্শ। আমাদের তিনি এজন্য অনুপ্রাণিত করে গেছেন। সুতরাং আমাদের উচিত যথাসম্ভব সকল মানুষের সেবা করা।

কাজ : সকল শিক্ষার্থী একত্রে বসে একজনকে আলোচক মনোনীত করবে। সে মানবসেবার পরিচয় ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করবে। আর সকলে তা শুনবে। শিক্ষক সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

পাঠ ৮

(الأخوة والتعائش المجتمعى) আত্মবোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

আত্মবোধ হলো আত্মসূলভ অনুভূতি প্রকাশ। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তিকে ভাইয়ের ন্যায় মনে করা, আত্মসূলভ আচার-আচরণ করা। সহোদর ভাইয়ের সাথে আমরা ভালো ব্যবহার করি, সবসময় তাদের কল্যাণ কামনা করি, তাদের জন্য নিজেদের নানা স্বার্থ ত্যাগ করি, তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসি। তেমনিভাবে দুনিয়ার সকল মানুষের প্রতি একপ মনোভাব পোষণ ও কর্মের মাধ্যমে এর প্রমাণ উপস্থাপন হই হলো আত্মবোধ।

আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হলো নানা সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যকার সম্প্রীতি ও ভালোবাসা। আমাদের সমাজে বহু ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও জাতির লোক বাস করে। তারা এক একটি সম্প্রদায়। সমাজে বসবাসরত এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর ঐক্য, সংহতি ও সহযোগিতার মনোভাব হই হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।

মানবসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আত্মবোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পর্ক ব্যক্তিগত নিজ জীবনে যথাযথভাবে এগুলোর অনুশীলন করে থাকেন।

আত্মবোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকলে কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না। এতদুভয়ের অনুপস্থিতিতে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়, জাতির উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়, এমনকি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়।

আত্মবোধ মানুষকে ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত করে, মানুষের মধ্যে সহযোগিতা, সহর্মিতা ইত্যাদি গুণের বিকাশ ঘটায়। ফলে মানব সমাজে ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে আত্মবোধ না থাকলে মানুষ একে অন্যকে ভালোবাসে না, অন্যের কল্যাণ কামনা করে না। বরং নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য অন্যের প্রতি অন্যায়, অত্যাচার ও নির্যাতন করতেও দ্বিবাবোধ করে না।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মানুষের মধ্যে ধৈর্য, সহলশীলতা, প্রমতসহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণের বিকাশ ঘটায়। মানুষ একে অন্যকে শুন্দা করতে শিখে। বিভিন্ন ধর্মের, জাতির ও সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে বসবাসের ফলে দেশীয় সভ্যতাও উন্নততর হয়। সকলের প্রচেষ্টায় দেশ ও জাতি উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করে। পক্ষান্তরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকলে দেশে মারামারি হানাহানির সূত্রপাত ঘটে। অনেক সময় গৃহযুদ্ধও শুরু হয়। নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থের জন্য দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতেও মানুষ কৃষ্ণিত হয় না। বহুত দেশের শান্তি ও উন্নতির জন্য আত্মবোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অপরিহার্য উপাদান।

ইসলামে আত্মবোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

ইসলাম কল্যাণের ধর্ম। এর সকল শিক্ষা ও আদর্শ মানবজাতির জন্য চির কল্যাণকর। এজন্য আত্মবোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রেও ইসলাম সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছে। ইসলামে এতদুভয় বৈশিষ্ট্য ও গুণ অনুশীলনের জন্য সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

ইসলামে সকল মুসলমান ভাই ভাই। মুসলমানগণ বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকুক, সে কালো হোক বা সাদা,

ধনী হোক কিংবা গরিব সকলেই ভাই-ভাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ أَخْوَةٌ**

অর্থ : মুমিনগণতো পরম্পর ভাই ভাই (সূরা আল-হজুরাত, আয়াত ১০)।

رَأَسُ الْمُسْلِمِ أَخُو الْمُسْلِمِ

অর্থ : এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই (বুখারি)।

বিশ্বের সকল মুসলমান ভাত্ত বন্ধনে আবদ্ধ। তারা পরম্পরের প্রতি ভাত্তসুলভ আচরণ করবে। এটাই ইসলামের শিক্ষা। একটি হাদিসে মহানবি (স.) মুসলমানদের এ ভাত্তের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, “তুমি মুমিনগণকে পারম্পরিক করণা প্রদর্শন, সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনের ব্যাপারে একটি দেহের মতো দেখতে পাবে। যখন দেহের একটি অঙ্গ কষ্ট পায় তখন গোটা দেহই জ্বর ও নিদ্রাহীনতার মাধ্যমে এর প্রতি সাড়া দেয়” (বুখারি ও মুসলিম)।

মুসলমানদের এ পারম্পরিক ভাত্ত হলো ইসলামি ভাত্ত। ফলে দুনিয়ার দূরতম প্রান্তে কোনো মুসলমান কষ্টে পতিত হলে অন্য মুসলমানও তার সমব্যর্থী হয়, তার সাহায্যে এগিয়ে আসে।

মুসলমানগণের পারম্পরিক ভাত্তের পাশাপাশি ইসলাম আরও এক প্রকার ভাত্তবোধের শিক্ষা প্রচার করেছে। এটি হলো বিশ্বভাত্ত। অর্থাৎ ইসলামের মতে, বিশ্বের সকল মানুষ পরম্পর ভাই-ভাই। এতে দেশ, জাতি, ভাষা ও বর্ণের কোনো পার্থক্য নেই। বরং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ ভাত্তের বন্ধনে আবদ্ধ। এ ভাত্ত হলো মানুষের মৌলিক ভাত্ত। সৃষ্টিগতভাবে মানুষ এ ভাত্ত বন্ধনে আবদ্ধ। কোনো মানুষই এ ভাত্তবোধ লজ্জান করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَرَّةٍ وَّأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُّوبًا وَّقَبَائِيلَ لِتَعَاوَنَفُوا

অর্থ : হে মানবমণ্ডল! আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরম্পর পরিচিত হতে পার (সূরা আল-হজুরাত, আয়াত ১৩)।

মহানবি (স.) বলেছেন, **وَالنَّاسُ بَنُو آدَمْ وَأَدَمُ مِنْ تُرَابٍ**

অর্থ : সকল মানুষই আদম (আ.)-এর বংশধর, আর আদম মাটি থেকে সৃষ্টি (তিরমিয়ি)।

প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে সব মানুষ আদি পিতা হ্যরত আদম (আ.) ও আদি মাতা হ্যরত হাওয়া (আ.)-এর সন্তান। এ হিসেবে সকল মানুষই একই বংশের, একই মর্যাদার ও পরম্পর ভাই-ভাই।

সুতরাং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি ভাত্তসুলভ আচরণ করতে হবে। সকলকে ভাইয়ের মমতায় দেখতে হবে, বিপদে আপদে এগিয়ে আসতে হবে, অন্য ধর্ম বা অন্য জাতি বলে কোনো মানুষের প্রতি অবিচার করা যাবে না। বরং সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, সকল মানুষের উৎস এক এবং সৃষ্টিগতভাবে সকলেই ভাই-ভাই।

ଇହକାଳীନ ଶାନ୍ତିର ଜନ୍ୟ ଭାତ୍ତବୋଧେର ପାଶାପାଶି ସମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସମ୍ପ୍ରତିଓ ବଜାୟ ରାଖା ଅପରିହାର୍ୟ । ସମାଜେ ବସବାସରତ ସକଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟେର ମାନୁଷେର ସାଥେ ଭାଲୋ ବ୍ୟବହାର କରତେ ହବେ । ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟେର ବାହିରେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟେର ଲୋକଦେର ସାଥେସାଥେ ସଦାଚରଣ କରତେ ହବେ । ତାଦେର ସାହାଯ୍ୟ-ସହ୍ୟୋଗିତା କରତେ ହବେ । ତାଦେର ବିପଦେ ଆପଦେ ଏଗିଯେ ଆସତେ ହବେ । ପାରମ୍ପରିକ ମାରାମାରି ହାନାହାନିର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନେ ଏଗିଯେ ଆସତେ ହବେ । ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ବଲେନ, “ତାଦେର ଅଧିକାଂଶ ଗୋପନ ପରାମର୍ଶେ କୋନୋ କଲ୍ୟାଣ ନେଇ । ବରଂ କଲ୍ୟାଣ ଆଛେ ସେ ଦାନ-ଖୟରାତ, ସଂକାଜ ଓ ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ତାତେ । ଆଲ୍ଲାହର ସମ୍ମାନ ଲାଭେର ଆଶ୍ୟା ସେ ଏରାପ କରବେ ଆମି ଅବଶ୍ୟଇ ତାକେ ମହାପୁରସ୍କାର ଦାନ କରବ” (ସୂରା ଆଲ-ନିସା, ଆୟାତ ୧୧) ।

ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟର କାଜ । ଏତେ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ଖୁଶି ହନ ।

ଆମରା ମୁସଲମାନ । ଆମାଦେର ସମାଜେ ଅମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟେର ବହୁ ଲୋକ ବସବାସ କରେନ । ଏଦେର କେଉଁ ଆମାଦେର ସହପାଠୀ, କେଉଁ ସହକର୍ମୀ, କେଉଁ ଖେଳାର ସାଥି, କେଉଁବା ପ୍ରତିବେଶୀ ଆବାର କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ, ବନ୍ଦୁ-ବାନ୍ଦୁ, ପରିଚିତଜନ । ତାଦେର ସକଳେର ସାଥେଇ ଭାଲୋ ବ୍ୟବହାର କରତେ ହବେ । କେନାନ୍ ତାରା ସକଳେଇ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲାର ସୃଷ୍ଟି ।

ଅମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକେ ତାଦେର ଧର୍ମ ପାଲନେ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିତେ ହବେ । ତାଦେର ଧର୍ମଗ୍ରହଣ, ଉପାସନାଲୟ, ଧର୍ମୀୟ ଆଚାର-ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଯେ ଠାଟ୍ଟା-ବିନ୍ଦୁପ କରା ଯାବେ ନା । ଧର୍ମ ପାଲନେ ତାଦେର ବାଧା ଦେଓଯା ଯାବେ ନା । ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାଲା ବଲେ-

○ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِي

ଅର୍ଥ : ତୋମାଦେର ଦୀନ ତୋମାଦେର, ଆମାର ଦୀନ ଆମାର (ସୂରା ଆଲ-କାଫିରମ, ଆୟାତ ୬) ।

ଅନ୍ୟ ଆୟାତେ ଏସେଛେ, تَعْلِمُ الْجَنَاحِيْنَ

ଅର୍ଥ : ଦୀନେର ସ୍ବାପାରେ କୋନୋ ଜବରଦଣ୍ଡି ନେଇ (ସୂରା ଆଲ-ବାକାରା, ଆୟାତ ୨୫୬) ।

ଧର୍ମୀୟ ସ୍ଵାଧୀନତା ପ୍ରଦାନେର ପାଶାପାଶି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରେଓ ସମ୍ପ୍ରତି ବଜାୟ ରାଖିତେ ହବେ । ଏ ଜନ୍ୟ ତାଦେର ପ୍ରତି କୋନୋରାପ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର କରା ଯାବେ ନା, ତାଦେର ସମ୍ପଦ ଦଖଲ କରା ଯାବେ ନା । ବରଂ ତାଦେର ଜାନ-ମାଲ-ଇଞ୍ଜତ ସଂରକ୍ଷଣ କରତେ ହବେ । ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ (ସ.) ଏ ବିଷୟେ ମୁସଲିମଗଙ୍କେ କଠୋରଭାବେ ସତର୍କ କରେ ଦିଯେଛେ । ତିନି ବଲେଛେ, “ସେ ସ୍ଵାପାରେ କୋନୋ ଚତୁର୍ଭବ ଅମୁସଲିମକେ ହତ୍ୟା କରଲ ସେ ଜାଗାତେର ସୁତ୍ୱାଣ୍ଡ ପାବେ ନା । ଅଥଚ ଚାଲିଶ ବହୁରେର ଦୂରତ୍ବେ ଥେକେଓ ଜାଗାତେର ସୁତ୍ୱାଣ୍ଡ ପାଓଯା ଯାଯା” (ବୁଖାରି) ।

ଅନ୍ୟ ହାଦିସେ ତିନି ବଲେନ, “ସାବଧାନ! ସେ ସ୍ଵାପାରେ କୋନୋ ଚତୁର୍ଭବ ଅମୁସଲିମ ନାଗରିକେର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରେ ଅଥବା ତାକେ ତାର ଅଧିକାର ଥେକେ କମ ଦେଇ କିଂବା କ୍ଷମତା ବହିର୍ଭୂତଭାବେ କୋନୋ କାଜ ଚାପିଯେ ଦେଇ ବା ଜୋରପୂର୍ବକ ତାର କୋନୋ ସମ୍ପଦ ନିଯେ ଯାଯା ତବେ କିଯାମତେର ଦିନ ଆମି ସେ ସ୍ଵାପାରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ହବ” (ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୁସଲିମେର ପକ୍ଷ ଅବଲମ୍ବନ କରବ) (ଆବୁ ଦ୍ରାଉଦ) ।

ইসলাম সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি রফ্ফার জন্য নানা বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেছে। আমাদের উচিত জীবনের সকল অবস্থায় এসব নির্দেশ অনুশীলন করা। ভাস্তুবোধ ও সামাজিক সম্প্রতির আদর্শে সকলে পরিচালিত হলে এ গোটা বিশ্ব শান্তিময় হয়ে উঠবে।

কাজ : সকল শিক্ষার্থী একত্রে বসবে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে চারজন শিক্ষার্থীকে বক্তা নির্ধারণ করবে। তারা ইসলামে ভাস্তুবোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি বিষয়ে বক্তৃতা করবে। শিক্ষক সভাপতি ও সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করবেন। যার বক্তৃতা সবচেয়ে ভালো হবে তাকে সকলে অভিনন্দন জানাবে।

পাঠ ৯

নারীর প্রতি সম্মানবোধ (احترام المرأة)

নারীর প্রতি সম্মানবোধ আখ্লাকে হামিদাহ-র অন্যতম। এটি একটি মহৎগুণ। নারীর প্রতি সম্মানবোধ ব্যাপক অর্থবোধক। সাধারণ অর্থে এটি নারীকে সম্মান প্রদর্শনের অনুভূতি বা মনোভাবকে বুঝিয়ে থাকে। আর ব্যাপকার্থে নারীর প্রতি সম্মানবোধ হলো নারী জাতির প্রতি সম্মানজনক মনোভাব। যেমন, স্তুতির বিচারে নর ও নারীর সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রদান, নারী বলে কাউকে ছোট মনে না করা, নারী হিসেবে কাউকে ঠাট্টা-বিন্দুপ না করা। বরং যথাযথভাবে তাদের প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করা, তাদের কাজ করার সুযোগ প্রদান করা, তাদের মাল-সম্পদ, ইজ্জত, সম্মানের সংরক্ষণ করা ইত্যাদি নারীর প্রতি সম্মানবোধের প্রকৃত উদাহরণ।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামে নারীদের প্রভূত সম্মান দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রিয়নবি (স.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে সারা বিশ্বজগৎ বিশেষ করে আরব সমাজ অক্ষতা ও বর্বরতার অঙ্ককারে নিমজ্জিত ছিল। সে সময় নারীদের কোনো মান-মর্যাদা ছিল না। তাদের কোনোরূপ অধিকার ছিল না। সেসময় নারীদের দ্রব্যসামগ্রী মনে করা হতো। তাদের ত্রীতদাসী হিসেবে বাজারে কেনাবেচা করা হতো। তারা ছিল ভোগ্যপণ্য, আনন্দদায়ক, প্রেমদায়িনী, সকল ভাঙ্গনের উৎস, নরকের দরজা, অনিবার্য পাপ ইত্যাদি নামে খ্যাত। এমনকি কোনো সভ্যতায় তাদের বিষধর সাপের সাথে তুলনা করা হতো। অনেক সময় নারীদের মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো না। তৎকালীন আরবের লোকেরা কন্যা সন্তানের জন্যকে অপমানজনক মনে করত ও কন্যা শিশুকে জীবন্ত করব দিত। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা তাদের এ হীন কাজের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন, “যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে

যায় এবং সে অসহ্নীয় মননাপে ঝিল্ট হয় (সূরা আন-নাহল, আয়াত ৫৮)।

ইসলাম নারীদের এহেন অপমানকর অবস্থা থেকে মুক্তি দান করেছে। ইসলামই সর্বপ্রথম নারীদের অধিকার ও মর্যাদা দান করেছে। জীবনের নানা ক্ষেত্রে নারীদের অবদান ও ভূমিকার স্বীকৃতি প্রদান করেছে। মানুষকে নারীর প্রতি সম্মানবোধের আদেশ করেছে। নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা লাভের দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে।

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও সম্মান

সৃষ্টিগতভাবে ইসলামে নর-নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বরং মানুষ হিসেবে তারা উভয়ই সমান মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা নর-নারী উভয়ের মাধ্যমেই মানবজাতির বিস্তার ঘটিয়েছেন। এতে কারও একার কৃতিত্ব নেই। বরং উভয়ই সমান মর্যাদা ও কৃতিত্বের অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَعْلَمُهَا النَّاسٌ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَىٰ

অর্থ : হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে (সূরা আল-হজুরাত, আয়াত ১৩)।

ধর্মীয় স্বাধীনতা, মর্যাদা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রেও ইসলাম নারীকে পুরুষের সমান সম্মান ও অধিকার প্রদান করেছে। ধর্মীয় কর্তব্য পালন ও ফল লাভের ক্ষেত্রে নর-নারীতে কোনোরূপ পার্থক্য করা হয়নি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘‘ইমান এহণ করে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে-ই সংকর্ম করবে সেই জান্মাতে প্রবেশ করবে। এ ব্যাপারে কারও প্রতি বিস্মুত্ত্ব অবিচার করা হবে না।’’ (সূরা আল নিসা, আয়াত ১২৪)

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও ইসলাম নারীদের মর্যাদা ও সম্মানের ঘোষণা প্রদান করেছে। মা হিসেবে নারীকে সন্তানের কাছে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করেছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি চাওয়া এক সাহাবিকে বলেন—

فَالْزَّمْهَا فِإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِنَّهَا

অর্থ : তুমি তোমার মায়ের সাথে থাকো। কেননা জান্মাত তার পায়ের নিচে (নাসাই)।

অন্য একটি হাদিসে এসেছে, একদা জনেক সাহাবি রাসুলুল্লাহ (স.)-কে জিজাসা করলেন, আমার সম্বৰহার পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা, ঐ সাহাবি পুনরায় জিজাসা করলেন, অতঃপর কোন ব্যক্তি? রাসুল (স.) বললেন, তোমার মাতা। এভাবে পরপর তিনবার একাপ প্রশ্ন করলে রাসুল (স.) একই উত্তর দিলেন। চতুর্থবারে রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, তোমার পিতা। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সন্তানের উপর পিতার চাইতেও মাতার অধিকার তিন গুণ বেশি। এটি মা হিসেবে নারীর অনন্য মর্যাদার পরিচায়ক।

কন্যা হিসেবেও নারীর মর্যাদা অপরিসীম। ইসলাম কন্যা সন্তানকে জীবন্ত করব দেওয়া হারাম করেছে। তাদের ভালোভাবে প্রতিপালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেছে। জ্ঞান হিসেবে নারীর মর্যাদা ও সম্মান স্বামীর অনুরূপ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^{۱۰}

অর্থ : আর নারীদের তেমনই ন্যায়সংগত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২২৮)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُهُنَّ^{۱۱}

অর্থ : তারা (নারীগণ) তোমাদের ভূষণ আর তোমরা তাদের ভূষণ (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮৭)।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম নারীদের অধিকার ও মর্যাদা সংরক্ষণ করেছে। নারীগণ স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন করতে পারবে। পিতা-মাতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার হিসেবেও তারা সম্পদ লাভ করবে। তাদের সম্পত্তিতে শুধু তাদেরই কর্তৃত্ব থাকবে। তারা তাদের ধন-সম্পদ স্বাধীনভাবে ব্যয় করতে পারবে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, “পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ, এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ” (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৩২)।

এভাবে মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইসলাম নারী জাতির অধিকার ও মর্যাদা ঘোষণা করেছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রেই ইসলাম নারীদের এ অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে।

নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপায়

নারীর প্রতি সম্মানবোধ মানুষের উন্নত মনমানসিকতার পরিচায়ক। শুধু অন্তর দ্বারা সম্মান ও মর্যাদা দেখালেই চলবে না বরং নিজ কাজকর্ম ও আচার ব্যবহার দ্বারা এর প্রমাণ দিতে হবে। আমাদের পরিবারে ও আত্মায়সজনের মধ্যে যেমন মা, মেয়ে, বোন, ভূটী, দাদি, ফুরু, খালা রয়েছেন, তেমনি শিক্ষিকা, সহপাঠী ও নারী সহকর্মী রয়েছেন। এদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা, যথাযথ শ্রদ্ধা-সম্মান ও মায়ামমতা প্রদর্শন, জীবন ও সন্ত্রমের নিরাপত্তা ও অধিকার প্রদান করা ইত্যাদি নারীর প্রতি সম্মানবোধের নির্দর্শন। আল-কুরআন ও হাদিসে এ ব্যাপারে আমাদের নানা নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন—

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ

অর্থ : অতঃপর তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করে চলবে (মুসলিম)। অর্থাৎ তাদের সাথে খারাপ আচরণ করবে না, যথাযথভাবে তাদের হক আদায় করবে। বিদায় হজের ভাষণেও মহানবি (স.) নারী জাতির অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন।

স্ত্রীদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

وَعَائِشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^{۱۲}

অর্থ : আর তোমরা স্ত্রীদের সাথে উন্নত ব্যবহার করে জীবনযাপন করবে (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৯)।

রাসুলুল্লাহ (স.) স্ত্রীদের প্রতি ভালো ব্যবহারকারীদের উন্নম উন্মত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন-

خَيْرٌ كُمْ خَيْرٌ كُمْ لَا هُلْهَـ

অর্থ : তোমাদের মধ্যে সেই উন্নম, যে তার স্ত্রীর নিকট উন্নম (তিরমিয়ি)।

অন্য একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “নিশ্চয়ই পূর্ণাঙ্গ ইমানের অধিকারী ঐ মুমিন ব্যক্তি, যে তাদের মধ্যে উন্নম চরিত্রের অধিকারী ও নিজ পরিবারের প্রতি অধিক সদয়” (তিরমিয়ি)।

বস্তুত নারীদের প্রতি উন্নম ব্যবহার করা মুমিনের নির্দর্শন। নারীর প্রতি সম্মানবোধ না থাকলে ইমান পূর্ণ হয় না।

আমাদের প্রিয়নবি (স.) নারীদের শ্রদ্ধা করতেন, সম্মান করতেন এবং স্ত্রী ও মেয়েদের ভালোবাসতেন। একদা তিনি সাহাবিগণকে নিয়ে বসা ছিলেন। এ সময় হ্যরত হালিমা (রা.) তাঁর নিকট আসলেন। হ্যরত হালিমা ছিলেন মহানবি (স.)-এর দুধমাতা। নবি করিম (স.) তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। নিজ চাদর বিছিয়ে দিয়ে তাঁকে বসতে দিলেন। তাঁর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। এভাবে প্রিয়নবি (স.) তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখালেন।

কন্যা সন্তান প্রসঙ্গে নবি করিম (স.) বলেছেন, “যে ব্যক্তির কোনো কন্যা সন্তান থাকে আর সে তাকে জীবন্ত করব দেয় না, তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে না, অন্য সন্তান অর্থাৎ ছেলে সন্তানকে কন্যা সন্তানের ওপর আধান্ত দেয় না, সে ব্যক্তি জাগ্রাতে থবেশ করবে” (আবু দাউদ)।

অন্য একটি হাদিসে এসেছে, “একদা জনৈক সাহাবি রাসুলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের উপর স্ত্রীদের কী অধিকার রয়েছে? তিনি উন্নরে বললেন, তুমি যা খাবে তাদেরও তা-ই খাওয়াবে, যা পরিধান করবে তাদেরও তা-ই পরিধান করাবে, তাদের মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না, তাদের গালিগালাজ করবে না, আর গৃহ ব্যতীত অন্য কোথাও তাদের বিচ্ছিন্ন রেখো না” (আবু দাউদ)।

নারীর প্রতি সম্মানবোধ আখলাকে হামিদাহ-র অন্যতম। পূর্ণাঙ্গ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের জন্য এ শুণ থাকা আবশ্যিক। অন্তর থেকে নারীদের সম্মান করতে হবে, মায়া-মমতা-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে এবং স্ত্রী ও মেয়েদের ভালোবাসতে হবে। পাশাপাশি নিজ আচরণ ও কাজকর্ম দ্বারাও এর প্রমাণ দিতে হবে। নারীদের কোনোরূপ অত্যাচার করা যাবে না, ঠাট্টা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা যাবে না, ইভিজিং করা যাবে না, তারা মনে কষ্ট পায় বা তাদের সম্মানহানি হয় এরূপ কোনো কাজ করা যাবে না। বরং সদাসর্বদা তাদের প্রাপ্য ও অধিকার আদায় করতে হবে। প্রয়োজনমতো তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। তাদের মেধা বিকাশের সুযোগ দিতে হবে। উন্নতি ও অঞ্চলগতির জন্য তাদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে হবে। এভাবে নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যায়। এতে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন। তাহলে আমরা দুনিয়া ও আধিরাতে সফলতা লাভ করতে পারব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা পবিত্র কুরআন ও হাদিসের উন্নতি উল্লেখপূর্বক নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপায় সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।

পাঠ ১০

স্বদেশপ্রেম (حُبُّ الْوَطَنِ)

স্বদেশ হলো নিজ দেশ বা নিজ মাতৃভূমি। যে দেশে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, যে স্থানের আলো-বাতাসে প্রতিপালিত হয় এবং বড় হয়ে ওঠে সে স্থানকেই তার স্বদেশ বলা হয়। স্বদেশ হলো কারও জন্মভূমি বা মাতৃভূমি।

স্বদেশের প্রতি মায়া-মমতা, আকর্ষণই হলো স্বদেশপ্রেম। নিজ দেশ ও মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা মানুষের সহজাত স্বভাব। কেননা মানুষ স্বদেশে জন্ম নেয়, সেখানের আলো-বাতাস গ্রহণ করে, সেখানের ফল-ফসল, খাদ্য-পানীয় দ্বারা তার দেহের পুষ্টি হয়। সেখানকার পরিবেশ, পাহাড়, পর্বত, নদী, সাগর, আবহাওয়া, ঝাতুবৈচিত্র্য দেখে সে বড় হয়। মানুষের প্রতি স্বদেশ বা মাতৃভূমির অবদান অনস্বীকার্য। সুতরাং স্বভাবগতভাবেই স্বদেশের প্রতি এক ধরনের মায়ামমতা, ভালোবাসা জন্ম নেয়। এ আকর্ষণ মানুষের অঙ্গের থেকে উৎসারিত। আজীবন মানুষ এ আকর্ষণ ও ভালোবাসা অনুভব করে। কোনো কারণে দেশ ছেড়ে বাইরে গেলেও দেশপ্রেমের এ অনুভূতি হ্রাস পায় না। বরং স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা, শৰ্ক্ষা সর্বক্ষণই মানবমনকে আচ্ছান্ন করে রাখে। স্বদেশ ও জন্মভূমির প্রতি এ আকর্ষণই স্বদেশপ্রেম।

গুরুত্ব

স্বদেশপ্রেম একটি মহৎ মানবিক গুণ। ইসলামে স্বদেশকে ভালোবাসার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি নিজ জন্মভূমিকে ভালোবাসেন। দেশের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করেন। অপরদিকে যারা দেশকে ভালোবাসে না, তারা চরম অকৃতজ্ঞ। তারা দেশদ্রোহী ও জগন্য চরিত্রের অধিকারী। আর এরূপ ব্যক্তিরা কখনো প্রকৃত ধার্মিক ও মুমিন হতে পারে না।

আমাদের প্রিয়নবি (স.) ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। কাফিরদের অত্যাচারে তিনি প্রিয় জন্মভূমি মক্কা নগরী ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মক্কা ত্যাগকালে তিনি বারবার অশ্রাসজল নয়নে মক্কার দিকে ফিরে ফিরে তাকাছিলেন আর বলছিলেন, “হে আমার স্বদেশ! তুমি কত সুন্দর। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমার নিজ গোত্রের লোকেরা যদি ঘৃঢ়যত্ন না করত, আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।”

দেশপ্রেম ও দেশের সেবা করা ইবাদতস্বরূপ। আল্লাহ তায়ালা পরকালে দেশরক্ষীদের বিরাট কল্যাণ দান করবেন। একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “দেশরক্ষার জন্য সীমান্ত পাহারায় আল্লাহর রাস্তায় বিনিদ্র রঞ্জনী যাপন করা দুনিয়া ও এর মধ্যকার সরকিছু থেকে উন্নত” (তিরমিয়ি)।

স্বদেশপ্রেমের উপায়

স্বদেশপ্রেম বা দেশের প্রতি ভালোবাসা অনুভূতির বিষয়। এটি প্রকাশ্যে দেখা যায় না। নিজের কাজ ও সেবার দ্বারা এ ভালোবাসা প্রকাশ করতে হয়। দেশের স্বার্থে কাজ করার দ্বারা দেশপ্রেম প্রমাণিত হয়।

দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় কাজ করা, জাতীয় উন্নতিতে অবদান রাখা, দেশের স্বার্থবিরোধী কাজে কাউকে সাহায্য না করা, দেশের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা, দেশের স্বার্থে ত্যাগ স্মীকার করা ইত্যাদি দ্বারা দেশকে ভালোবাসা যায়। দেশের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করা দেশপ্রেমের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

দেশের মানুষকে ভালোবাসা, মানুষের জন্য কাজ করাও স্বদেশপ্রেমের পরিচয়ক। দেশের কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদির উন্নতিতে অবদান রাখার দ্বারাও দেশপ্রেমের নির্দর্শন প্রকাশ করা যায়।

আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসব। নিজেকে শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞানে-গুণে সুন্দর ও যোগ্য করে তুলব। অতঃপর দেশের উন্নতির জন্য একথোগে কাজ করব। দেশের স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ হতে দেব না। দেশের সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার করব। অপচয়, অপব্যয় ও বিনষ্ট করব না। দেশের প্রয়োজনে নিজ প্রাণ উৎসর্গ করতেও ছিদ্রাবোধ করব না।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ইসলামের আলোকে স্বদেশপ্রেমের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ নিজ খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১১

কর্তব্যপরায়ণতা (إِلَّا خَلَاصٌ فِي إِلَّادِ) (اللَّ

আখলাকে হামিদাহ-র অন্যতম হলো কর্তব্যপরায়ণতা। মানুষের সার্বিক উন্নতি ও সফলতার জন্য এর কোনো বিকল্প নেই। কর্তব্যপরায়ণতা হলো যথাযথভাবে কর্তব্য আদায় করা, দায়িত্বসমূহ পালন করা ইত্যাদি।

মানুষ হিসেবে আমাদের উপর নানাবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এসব দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন থাকা, সময়মতো সুন্দর ও সুচারুভাবে এগুলো পালন করা এবং এক্ষেত্রে কোনোরূপ অবহেলা বা উদাসীনতা প্রদর্শন না করাকেই কর্তব্যপরায়ণতা বলা হয়। মহান আল্লাহ বলেন, “প্রত্যেকে যা করে তদনুসারে তার স্থান রয়েছে এবং তারা যা করে সে সমস্কে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন।” (সূরা আল-আনআম, আয়াত ১৩২)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

○ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَأَنْصِبُ أَجْرًا مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً

অর্থ : নিশ্চয়ই যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে— আমি তো তার শ্রমফল নষ্ট করি না— যে উত্তমরূপে কার্য সম্পাদন করে (সূরা আল-কাহফ, আয়াত ৩০)।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, “প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারও ভার গ্রহণ করবে না” (সূরা আল-আনআম, আয়াত ১৬৪)।

অন্য আয়াতে রয়েছে, “যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না; কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়— এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কেই কৈফিয়ত তলব করা হবে” (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৩৬)।

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র এসেছে,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ

অর্থ : আল্লাহ কারও উপর এমন কোনো কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত। সে ভালো যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই এবং সে মন্দ যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৮৬)।

কর্তব্যপরায়ণতার নানা দিক

কর্তব্যপরায়ণতা মানবজীবনে সফলতা লাভের প্রধানতম হাতিয়ার। আল্লাহ তায়ালা তার ইবাদতের জন্য আমাদের সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তার ইবাদত করা আমাদের কর্তব্য। আমরা সবাই পরিবারের মধ্যে বসবাস করি। সুতরাং পরিবারের সদস্য যথা মাতা-পিতা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি সকলের প্রতি আমাদের নানা দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সমাজবন্ধ জীব হিসেবে আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বন্ধুব, পাঢ়া-প্রতিবেশীর প্রতিও আমাদের নানা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। শিক্ষার্থী হিসেবে বিদ্যালয়, শিক্ষক ও অন্য শিক্ষার্থীর প্রতি আমাদের নানা কর্তব্য রয়েছে। এ ছাড়াও রাষ্ট্রীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য আসলেও আমাদের পালন করতে হয়। এসব কর্তব্য সঠিক সময়ে যথাযথভাবে পালন করা উচিত। এগুলোর প্রতি সচেতন থাকা ও এগুলো সম্পাদনে সচেষ্ট হওয়াই কর্তব্যপরায়ণতা।

গুরুত্ব

মানবজীবনে কর্তব্যপরায়ণতার গুরুত্ব অপরিসীম। যে ব্যক্তি কর্তব্যপরায়ণ সকলেই তাঁকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে। তিনি সকলের আহ্বা ও বিশ্বাস অর্জন করেন। কর্তব্যপরায়ণতা মানুষকে সফলতা দান করে। ছাত্রজীবনে শিক্ষার্থীর কর্তব্য হলো শিক্ষকদের সম্মান করা, তাঁদের কথা মেনে চলা, ঠিকমতো লেখাপড়া করা, বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সংরক্ষণ করা ইত্যাদি। যে শিক্ষার্থী এসব কর্তব্য ভালোভাবে পালন করে সে সবার ভালোবাসা লাভ করে। শিক্ষকগণ তাকে পছন্দ করেন। সে পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়। ভবিষ্যৎ জীবনেও সে সফলতা লাভ করে। অন্যদিকে যে শিক্ষার্থী কর্তব্যপরায়ণ নয়, তাকে কেউ পছন্দ করে না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সে ব্যর্থ হয়।

কর্তব্যপরায়ণতা মুমিনের অন্যতম গুণ। মুমিন ব্যক্তি তাঁর সকল কর্তব্য সম্পাদন করেন। আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করার পাশাপাশি তিনি বাস্তবজীবনের সব দায়িত্ব কর্তব্যও পালন করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর একনিষ্ঠ বাস্তাদের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, “তারা কর্তব্য পালন করে এবং সে দিনের ভয় করে যে দিনের অনিষ্ট হবে ব্যাপক।” (সূরা আদ-দাহর, আয়াত ৭)

কর্তব্যে অবহেলা করলে পরকালে সে জন্য জবাবদিহি করতে হবে। একটি হাদিসে মহানবি (স.) বলেছেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

অর্থ : তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে (বুখারি)।

আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে আমাদের পরীক্ষা করার জন্য নানা দায়িত্ব কর্তব্য দিয়েছেন। পরকালে তিনি আমাদের সকলকে কর্তব্য পালনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন। সেদিন কর্তব্যপরায়ণগণ সহজেই মুক্তি লাভ করবে। তাদের জন্য রয়েছে সফলতা ও জান্মাত। অন্যদিকে, যারা দুনিয়াতে কর্তব্যকাজে অবহেলা করেছে, ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করেনি তারা বিপদগ্রস্ত হবে। তারা শান্তি ভোগ করবে। তাদের জন্য রয়েছে চিরশান্তির জাহানাম।

আমরা কর্তব্যপরায়ণ হতে সচেষ্ট হব। নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করব। তবেই আমরা দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা লাভ করব।

কাজ: শিক্ষার্থীরা পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে যে সব কাজের মাধ্যমে কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিতে পারে-
তার একটি তালিকা প্রণয়ন করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১২

পরিচ্ছন্নতা (النَّظَافَةُ)

পরিক্ষার, সুন্দর ও পরিপাটি অবস্থাকে পরিচ্ছন্নতা বলে। শরীর, মন ও অন্যান্য ব্যবহার্য বস্তু সুন্দর ও পবিত্র
রাখা, ময়লা-আবর্জনা ও বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে মুক্ত রাখাকে পরিচ্ছন্নতা বলা হয়। দুনীতিমুক্ত, ভেজালমুক্ত
ও বামেলামুক্ত অবস্থাও পরিচ্ছন্নতার অন্যতম রূপ। পরিচ্ছন্নতার আরবি প্রতিশব্দ হলো নাজাফাত (النَّظَافَةُ)।
ইসলামি শরিয়তে পরিক্ষার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্থে সাধারণত তাহারাত শব্দটিই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
ইসলামি পরিভাষায় শরিয়ত নির্দেশিত পদ্ধতিতে দেহ, মন, পোশাক, খাদ্য, বাসস্থান ও পরিবেশ পরিক্ষার ও নির্মল
রাখাকে তাহারাত বলা হয়।

গুরুত্ব

মানবজীবনে পরিক্ষার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার গুরুত্ব অপরিসীম। পরিচ্ছন্ন থাকা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। নোংরা,
ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত থাকা ইমানদারগণের স্বভাব নয়। বরং মুমিনগণ সদা সর্বদা পরিক্ষার ও পবিত্র থাকেন।
রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, **الظَّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ**

অর্থ : পবিত্রতা ইমানের অংশ (মুসলিম)।

প্রকৃত ইমানদার হওয়ার জন্য পবিত্র থাকা অপরিহার্য। কেননা পবিত্রতা ব্যতীত কোনো ইবাদত করুল হয়
না। সালাত আদায়ের জন্য মানুষের শরীর, পোশাক ও সালাতের স্থান পরিক্ষার ও পবিত্র হতে হয়। এগুলো
নাপাক থাকলে সালাত শুরু হয় না। তেমনি আল-কুরআন তিলাওয়াতের জন্যও পাক-পবিত্র হতে হয়।
অপবিত্র অবস্থায় আল-কুরআন স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ۝لَا يَمْسِسُهُ إِلَّا الْمُظْهَرُونَ
অর্থ : “আর এটা (আল-কুরআন) পবিত্রগণ ব্যতীত আর কেউ স্পর্শ করবে না” (সূরা আল-ওয়াকিয়াহ,
আয়াত ৭৯)।

পরিক্ষার ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিদের সবাই ভালোবাসে। আল্লাহ তায়ালা ও তাদের ভালোবাসেন, পছন্দ
করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَمُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরও ভালোবাসেন (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২২২)।

ইসলামি শরিয়তে পরিকার-পবিত্র থাকার জন্য ওয়, গোসল ও তায়াম্মুমের বিধান প্রদান করা হয়েছে। দৈনিক পাঁচবার সালাতের পূর্বে ওয় করার দ্বারা মানুষের সকল অপবিত্রতা ও অপরিচ্ছন্নতা দূরীভূত হয়।

দৈহিক পরিচ্ছন্নতা

দৈহিক পরিচ্ছন্নতা মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দৈহিক পরিচ্ছন্নতা হলো হাত, পা, মুখ, দাঁত ও গোটা শরীর পরিকার ও পরিচ্ছন্ন থাকা। কারও হাত, পা, মুখ, দাঁত, তথা গোটা শরীর অপরিকার ও ময়লাযুক্ত থাকলে তা থেকে দুর্গন্ধি বের হয়। এসব ময়লা, দুর্গন্ধি থেকে পরিকার-পরিচ্ছন্ন থাকা দরকার। কেননা অপরিচ্ছন্ন মানুষকে সকলে ঘৃণা করে। গোসল করার দ্বারা আমরা নিজেদের শরীর পরিচ্ছন্ন রাখতে পারি; শরীরের ময়লা ও দুর্গন্ধি দূর করতে পারি।

রাতের বেলা ঘুমানোর পর সকালে আমাদের মুখমণ্ডল পরিচ্ছন্ন, সতেজ ও নির্মল থাকে না। চোখে পিচুটি লেগে থাকে, দাঁত দুর্গন্ধযুক্ত হয়। খাদ্য গ্রহণ করলেও আমাদের দাঁতে ময়লা লাগে। সুতরাং দাঁত মুখ সর্বদা পরিকার রাখতে হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) দাঁত পরিকারের জন্য মিসওয়াক করতেন। আমাদেরও তিনি মিসওয়াক করতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, “আমার উম্মতের কষ্টের আশঙ্কা না করলে আমি তাদের প্রত্যেক সালাতের আগে মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম।” (বুখারি)

আমাদের অনেকে চুল ও নখ বড় রাখে। এতে দেখতে খারাপ লাগে। নখ বড় হলে এতে ময়লা জমে। অতএব, নখ কেটে ছেট ও পরিকার রাখতে হবে। চুল পরিপাটি করে রাখতে হবে। এটাই ইসলামের বিধান। মহানবি (স.) একবার এলোমেলো চুলের এক লোককে দেখে বললেন, এ ব্যক্তি কি চুল ঠিক করার কিছু পেল না?

প্রস্তা-প্যায়খানা করে ভালোভাবে পরিকার-পরিচ্ছন্ন হওয়াও ইসলামের বিধান। এজন্য প্রথমে চিলা-কুলুখ ব্যবহার করতে হবে। এখন সহজলভ্য টিসু ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। অতঃপর পানি ব্যবহার করে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হতে হবে। মহানবি (স.) বলেছেন, “নিশ্চয় প্রস্তা-বেশির ভাগ কবর আয়াবের কারণ হয়ে থাকে।” (মুসনাদে আহমাদ)

অপর একটি হাদিসে এসেছে, “তোমরা প্রস্তা-বেশির ছিটাফেঁটা থেকে বেঁচে থাক। কারণ কবরের বেশিরভাগ আয়াব প্রস্তা-বেশির ছিটাফেঁটা থেকে বেঁচে না থাকার কারণে হবে” (দারাকুতনি)।

দৈহিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার গুরুত্ব সীমাহীন। সুতরাং আমরা প্রতিদিন গোসল করব। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পূর্বে ভালোভাবে ওয় করব। আমাদের হাত, পা, নখ, চুল, দাঁত, চোখ সবকিছু পরিকার-পরিচ্ছন্ন রাখব।

পোশাকের পরিচ্ছন্নতা

দৈহিক পরিচ্ছন্নতার মতো পোশাক পরিচাদের পবিত্রতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাপড়-চোপড় পরিকার থাকলে দেহ মন ভালো থাকে, কাজে উৎসাহ পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ﴿وَمَنْ يَعْبُدْ كَفَرْتُهُ﴾ অর্থ : “আর আপনার পরিচাদ পবিত্র রাখুন” (সূরা আল মুদ্দাস্সির, আয়াত ৪)।

আমাদের প্রিয়নবি (স.) সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরতেন। কাপড়-চোপড় অল্প মূল্যের হতে পারে, ছেঁড়া ফাটা হতে পারে, কিন্তু তা পরিষ্কার হওয়া উচিত। এজন্য সবসময় কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে।

পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা

আমাদের চারপাশে যা কিছু রয়েছে সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। ঘরবাড়ি, গাছপালা, হাট বাজার, স্কুল-মাদ্রাসা, দোকানপাট, রাস্তাঘাট এসবই আমাদের পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আমাদের কর্তব্য। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন না থাকলে নির্মল জীবনযাপন করা সম্ভব নয়।

যেখানে সেখানে কফ-থুথু, মলমৃত্তি ফেললে পরিবেশ নোংরা হয়। বিভিন্ন উচ্চিষ্ঠ, ময়লা-আবর্জনা, রাসায়নিক বর্জ্য ডাস্টবিনে না ফেলে রাস্তাঘাটে ফেলা উচিত নয়। এতে রাস্তাঘাট ময়লা হয়। নোংরা-আবর্জনা আমাদের শরীরে ও পোশাকে লাগে। নানা রকম রোগজীবাগু জন্মে। আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি।

পানি ও বায়ু পরিবেশের অন্যতম উপাদান। এ দুটো মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা পানি পান করি, পানিতে গোসল করি, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করি। সুতরাং পানি ও বায়ু সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। পানিতে ময়লা-আবর্জনা ফেলা যাবে না। অনেকে পানিতে মলমৃত্তি ত্যাগ করে। এটা ঠিক নয়। আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় মলত্যাগ করব। ফলে আমাদের বায়ুও দুর্গন্ধযুক্ত হবে না।

পরিবেশ আমাদের। এ পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব আমাদেরই। সুতরাং আমরা এ ব্যাপারে সতর্ক হব। আমাদের ঘরবাড়ি, স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখব। সঙ্গে আস্তত একদিন পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাব। যানবাহন, বাসস্টেশন, ফেরিঘাট, খেলার মাঠ, হাট-বাজারও পরিষ্কার রাখা দরকার। আমরা এ ব্যাপারেও সচেষ্ট হব। এলাকার পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সাহায্য করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দৈনন্দিন জীবনে পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনাগুলো জোড়ায় আলোচনা করবে এবং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের সামনে তা উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১৩

মিতব্যয়িতা (الإِقْتَصَادُ فِي الْإِنْفَاقِ)

মিতব্যয়িতা আখলাকে হামিদাহ-র অন্যতম দিক। মিতব্যয়িতা হলো প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করা, পরিমিতিবোধ, কথাবার্তা, কাজকর্মে যথার্থতা, মাল-সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ইত্যাদি। সাধারণত ধনসম্পদের যথাযথ ও প্রয়োজন মাফিক ব্যবহারকে মিতব্যয়িতা বলা হয়। অর্থাৎ যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই খরচ করা, কম বা বেশি না করা।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের স্বষ্টা ও প্রতিপালক। তিনি আমাদের বহু নিয়ামত দান করেছেন। এ সমস্ত নিয়ামত ও ধনসম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য। এক্ষেত্রে অপব্যয়-অপচয় বা ক্লিপগতা করা যাবে না। বরং যখন যা প্রয়োজন সেরূপ ব্যয় করার মধ্যেই সফলতা রয়েছে। প্রয়োজনমাফিক সম্পদের এই ব্যবহারই মিতব্যয়িতা; এটি অপচয় ও ক্লিপগতার মাঝামাঝি পন্থ।

মিতব্যয়িতার গুরুত্ব

মিতব্যয়িতা একটি গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক গুণ। এটি মানবসমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে। পক্ষান্তরে কৃপণতা ও অপচয় সমাজে নানা অশান্তির সৃষ্টি করে। অপচয়কারীর সম্পদ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে সে নানা অভাব-অন্টন, দুঃখকষ্টে পতিত হয়। অন্যদিকে কৃপণতা মানুষের মধ্যে মনোমালিন্য ও শক্তির জন্য দেয়। সমাজে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে। মিতব্যয়িতা মানুষকে অপচয় ও কৃপণতার কুফল থেকে রক্ষা করে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন—

مِنْ فِقَهِ الرَّجُلِ رِفْقَهُ فِي مَعِيشَتِهِ

অর্থ : ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপথ অবলম্বন করা ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ (মুসলাদে আহনাদ)।

মিতব্যয়ী ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতের যথাযথ ব্যবহার করেন। ফলে তিনি বহু সাওয়াবের অধিকারী হন। একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সংকাজে খরচ কর, তবে তোমার কল্যাণ হবে। আর যদি তা আটকে রাখ তবে তোমার অকল্যাণ হবে। তবে তোমার প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ রেখে দিলে তোমাকে তিরক্ষার করা হবে না” (তিরমিয়ি)।

মিতব্যয়িতা মুমিনের গুণ। প্রকৃত ইমানদারগণ শুধু নিজ প্রয়োজনমাফিক খরচ করেন। তারা কৃপণতাও করেন না; আবার অপচয়ও করেন না। তাঁরা মিতব্যয়ী। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দ্বারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করেন। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা তাঁর একনিষ্ঠ বাস্তাদের পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَهُمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوْمًا

অর্থ : আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপচয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না। বরং তারা এতদুভয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করে (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত ৬৭)।

আল্লাহ আরও বলেন, “তুমি তোমার হাত তোমার ঝীবায় আবদ্ধ করে রেখো না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিত ও করো না, তাহলে তুমি তিরক্ত ও নিঃশ্ব হয়ে পড়বে” (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ২৯)।

আমাদের প্রিয়নবি (স.) ছিলেন মিতব্যয়িতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর ও পরিবারের জন্য প্রয়োজনমাফিক খরচ করতেন। এতে তিনি যেমন আরাম আয়েশ ও বিলাসিতা করতেন না, তেমনি কৃপণতাও করতেন না। অতিরিক্ত সম্পদ তিনি দান করে দিতেন। সাহাবিগণ, ওলিগদের জীবনী থেকেও আমরা এ শিক্ষা লাভ করি। একটি হাদিসে মহানবি (স.) বলেছেন, “সুসংবাদ এ ব্যক্তির জন্য যাকে ইসলামের দিকে হিদায়াত করা হয়েছে, তার প্রয়োজনমাফিক জীবনোপকরণ আছে এবং সে এতে তুষ্ট রয়েছে” (তিরমিয়ি)।

মিতব্যয়িতা মানুষকে নানা সংগ্রহে ভূষিত করে। লোভ-লালসা, অপচয়-অপব্যয়, কৃপণতা, অলসতা, আরামপ্রিয়তা ইত্যাদি খারাপ অভ্যাস থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখে। মিতব্যয়িতা আল্লাহ তায়ালার নিকট পছন্দনীয়। আমরা সকলে জীবনযাপনে মিতব্যয়ী হব। সবধরনের অপচয়, কৃপণতা ও বিলাসিতা থেকে দূরে থাকব। তাহলে আমাদের জীবন সুন্দর হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা মিতব্যয়িতার গুরুত সম্পর্কে আল-কুরআন ও হাদিসের উজ্জ্বল উল্লেখপূর্বক একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।

পাঠ ১৪

আত্মনির্দিষ্ট (تَزْكِيَةُ النَّفْسِ)

আত্মনির্দিষ্ট অর্থ হলো নিজের সংশোধন, নিজেকে খাঁটি করা, পরিশুম্ব করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় সর্বপ্রকার অনেসলামিক কথা ও কাজ থেকে নিজ অন্তরকে মুক্ত ও নির্মল রাখাকে আত্মনির্দিষ্ট বলা হয়। আল্লাহ তায়ালার স্মরণ, আনুগত্য ও ইবাদত ব্যতীত অন্য সমস্ত কিছু থেকে অন্তরকে পরিত্র রাখাকেও আত্মনির্দিষ্ট বলা হয়।

আত্মনির্দিষ্টির আরবি পরিভাষা হলো ‘তায়কিয়াতুন নাফস’। একে সংক্ষেপে ‘তায়কিয়াহ’ও বলা হয়। স্বীয় আত্মাকে সবধরনের পাপ-পঞ্চিলতা ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত রাখাই তায়কিয়াহ-এর উদ্দেশ্য।

আত্মনির্দিষ্টির প্রয়োজনীয়তা

মানুষের জন্য আত্মনির্দিষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনঙ্গীকার্য। বস্তুত দেহ ও অন্তরের সমস্তয়ে মানুষ গঠিত। দেহ হলো মানুষের হাত-পা, মাথা, বুক ইত্যাদি নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমষ্টি। আর অন্তর হলো আত্মা বা কাল্ব। এ দুটোর মধ্যে কাল্বের ভূমিকাই প্রধান। মানুষের অন্তর যেরূপ নির্দেশনা প্রদান করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তদ্বপরী কাজ করে থাকে। সুতরাং মানুষের কাজকর্মের শুল্কতার জন্য প্রথমেই কাল্বের সংশোধন প্রয়োজন। আর কাল্বের সংশোধনই হলো আত্মনির্দিষ্টি। কাল্ব যদি সৎ ও ভালো কাজের নির্দেশ দেয় তবে দেহও ভালো কাজ করে। একটি হানিসে মহানবি (স.) সুন্দরভাবে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, “জেনে রেখো! শরীরের মধ্যে একটি গোশতগিণ রয়েছে। যদি তা সংশোধিত হয়ে যায়, তবে গোটা শরীরই সংশোধিত হয়। আর যদি তা কল্পিত হয়, তবে গোটা শরীরই কল্পিত হয়ে যায়। মনে রেখো তা হলো কাল্ব বা অন্তর।” (বুখারি ও মুসলিম)

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর ইবাদতের পূর্বশর্ত হলো পরিত্রাতা। কেননা আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং পরিত্র। তিনি পরিত্রাতা ব্যতীত কোনো জিনিসই কবুল করেন না। সুতরাং ইবাদতের জন্যও দেহ-মন পরিত্র হওয়া আবশ্যিক। দৈহিক পরিত্রাতা লাভ করলেই হবে না বরং অন্তরকেও পরিত্র করতে হবে। অন্য সবকিছু থেকে মনকে পরিত্র রেখে কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করতে হবে। আর অন্তরাত্মার পরিত্রাতা আত্মনির্দিষ্টির মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।

মানুষের আত্মিক প্রশাস্তি, উন্নতি ও বিকাশ সাধনের জন্যও আত্মনির্দিষ্টির গুরুত্ব অপরিসীম। আত্মনির্দিষ্টি মানুষের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটায়। সদা সর্বদা ভালো চিন্তা ও সংকর্মে উৎসাহিত করে। আত্মনির্দিষ্টি মানুষের চরিত্রে প্রশংসনীয় গুণাবলি চর্চার সুযোগ করে দেয়। পক্ষান্তরে যার আত্মা কল্পিত সে নানাবিধ পাপ চিন্তা ও অশীল কাজে লিঙ্গ থাকে। সে অন্যায়-অত্যাচার, সন্ত্রাস-নির্বাতন করতে দ্বিধাবোধ করে না। ফলে সামাজিক শাস্তি-শৃঙ্খলাও বিনষ্ট হয়। অতএব, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষা ও বিকাশের জন্য আত্মনির্দিষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনঙ্গীকার্য।

আত্মনির্দিষ্টির গুরুত্ব

আত্মনির্দিষ্টি মানুষকে বিকশিত করে, সফলতা দান করে। ইহজীবনে আত্মনির্দিষ্টি মানুষকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করে। এক্রপ মানুষ সবধরনের কুপ্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকে, সকল পাপাচার ও অনৈতিক কাজ থেকে

দুরে থাকে। ফলে সমাজে সে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে সকলের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করে।

বস্তুত আত্মশুদ্ধি হলো সফলতা লাভের মাধ্যম। যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে ব্যর্থ, সে দুর্ভাগ। সে কখনোই সফলতা লাভ করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قُدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقُدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا

অর্থ : নিচয়ই যে ব্যক্তি আত্মকে পূত-পবিত্র রাখবে সেই সফলকাম হবে, আর সে ব্যক্তিই ব্যর্থ হবে যে নিজেকে কল্পিত করবে (সূরা আশ-শাম্স, আয়াত ৯-১০)।

পরকালীন জীবনের সফলতা এবং মুক্তি ও আত্মশুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নিজ আত্মকে পবিত্র রাখবে পরকালে সেই মুক্তি লাভ করবে। তার জন্য পুরকার হবে জান্নাত। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنْوَةٌ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقُلْبٍ سَلِيمٍ

অর্থ : সেদিন ধনসম্পদ কোনো কাজে আসবে না, আর না কাজে আসবে সন্তান-সন্ততি। বরং সেদিন সে ব্যক্তিই মুক্তি পাবে, যে আল্লাহর নিকট বিশুদ্ধ অন্তর্করণ নিয়ে আসবে (সূরা আশ-শাম্স, আয়াত ৮৮-৮৯)।

মূলত ইহ ও পরকালীন সফলতা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমেই অর্জন করা যায়। এজন্যই ইসলামে আত্মশুদ্ধির প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

আত্মশুদ্ধির উপায়

মানুষের অন্তর হলো স্বচ্ছ কাঁচের মতো। যখনই মানুষ কোনো খারাপ কাজ করে তখনই তাতে একটি কালো দাগ পড়ে। এভাবে বারংবার পাপ কাজ করার দ্বারা মানুষের অন্তর পুরোপুরি কল্পিত হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে বলেছেন,

كَلَّا بْلَىٰ رَأَنَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

অর্থ : কখনোই নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে (সূরা আল-মুতাফ্ফিফিন, আয়াত ১৪)।

মানুষের কাজের কারণেই মানুষের অন্তর কল্পিত হয়। সুতরাং আত্মশুদ্ধির প্রধান উপায় হলো খারাপ কাজ ত্যাগ করা এবং কুচিত্তা, কুঅভ্যাস বর্জন করা। সদাসর্বদা সৎকর্ম, সৎচিত্তা, নৈতিক ও মানবিক আদর্শে নিজ চরিত্র গড়ে তোলার দ্বারা আত্মশুদ্ধি অর্জন করা যায়।

মহানবি (স.) বলেছেন, “প্রত্যেক বস্তুরই পরিশোধক যত্ন রয়েছে। আর অন্তর পরিষ্কারের যত্ন হলো আল্লাহর যিকির” (বায়হাকি)।

বেশি বেশি আল্লাহ তায়ালা স্মরণ ও যিকিরের মাধ্যমে অন্তরের কালো দাগ ও মরিচা দূর করা যায়। যিকিরের মাধ্যমে আত্মা প্রশান্ত ও পরিশুद্ধ হয়। এ ছাড়াও তওবা, ইস্তিগফার, তাওয়াকুল, যুহুদ, ইখলাস, সবর, শোকর, কুরআন তিলাওয়াত, সালাত ইত্যাদির মাধ্যমেও আত্মশুদ্ধি অর্জন করা যায়।

আমরা আত্মকে পরিশুদ্ধ করব, আত্মশুদ্ধি অর্জন করব এবং মহান আল্লাহর প্রিয়পাত্র হব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও আত্মশুদ্ধি অর্জনের উপায় সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ নিজের খাতায় বাড়ি থেকে লিখে আনবে এবং শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৫

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ

(الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ)

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ এর আরবি পরিভাষা হলো ‘আমর বিল মারফ’ ওয়া নাহি আনিল মুনকার’। ইসলামি জীবনদর্শনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এটি মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য। সৎকাজের আদেশ বা ‘আমর বিল মারফ’ বলতে সাধারণত কাউকে কোনোরূপ ন্যায় ও ভালো কাজের নির্দেশ দান করা বোঝায়। তবে ব্যাপকার্থে কোনো ব্যক্তিকে ইসলামসম্মত কাজের নির্দেশ দেওয়া, উৎসাহিত করা, অনুপ্রাণিত করা, অনুরোধ করা, পরামর্শ দেওয়া ইত্যাদি সবই সৎকাজের আদেশের মধ্যে গণ্য। অসৎকাজে নিষেধ বা ‘নাহি আনিল মুনকার’ হলো যাবতীয় মন্দ, খারাপ ও অশুল কাজ থেকে কাউকে বিরত রাখা। যেসব কাজ ইসলাম সমর্থন করে না এবং যেসব কাজ নীতিনৈতিকতা ও বিবেকবিরোধী সেসব কাজ থেকে কাউকে নিষেধ করা, বিরত রাখা, নিরুৎসাহিত করা, বাধা দেওয়া ইত্যাদি ‘নাহি আনিল মুনকার’ এর অন্তর্ভুক্ত। শুধু মৌখিক নিষেধের দ্বারা নয় বরং নানাভাবেই অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা যায়। একটি হাদিসে রাসূল (স.) বলেছেন, “তোমাদের কেউ যখন কোনো খারাপ কাজ হতে দেখে তবে সে যেন তা হাত দ্বারা প্রতিরোধ করে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে মুখের দ্বারা প্রতিরোধ করে। যদি সে এ ক্ষমতাও না রাখে তবে সে যেন অন্তর দ্বারা এর প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। আর এটা হলো ইমানের দুর্বলতম স্তর” (মুসলিম)। এ হাদিসে মহানবি (স.) হাত, মুখ ও অন্তর দ্বারা ‘নাহি আনিল মুনকার’ বা খারাপ কাজ প্রতিরোধ করার কথা বলেছেন। হাদিস বিশারদগণের মতে, হাত দ্বারা বলতে এখানে নিজ শক্তি ক্ষমতা ও প্রভাব দ্বারা প্রতিরোধ করার কথা বোঝায়। মুখ দ্বারা প্রতিরোধ হলো নিষেধ করা, নিরুৎসাহিত করা, জনমত গঠন করে প্রতিরোধ করা। আর অন্তর দ্বারা প্রতিরোধ হলো মনে মনে ঐ কাজকে ঘৃণা করা, ঐ কাজ বন্ধ হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করা, প্রতিরোধের জন্য চিন্তা করা, পরিকল্পনা করা এবং পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত অন্তরে উদ্বেগ উৎকর্ষ থাকা ইত্যাদি। নানাভাবে মানুষকে অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করাই ‘নাহি আনিল মুনকার’।

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলামে আমর বিল মারফ ও নাহি আনিল মুনকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা এর ওপরই প্রতিষ্ঠিত। সমাজে সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ করার জন্য সবসময়ই কিছুসংখ্যক লোক থাকতে হয়। অন্যথায় সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে না। সমাজে অন্যায়, অত্যাচার, সত্ত্বাস, নির্যাতন ছড়িয়ে পড়ে। সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়ে যায়। সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ ব্যবস্থার জন্য একপ লোকদের প্রয়োজনীয়তা অন্যীকার্য।

সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ করা অত্যন্ত মহৎ কাজ। এ মহৎ কাজ যারা সম্পাদন করবেন আল্লাহ তায়ালা তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা দান করবেন। পরিত্র কুরআনে সৎকাজের আদেশদানকারী এবং অসৎকাজের নিষেধকারীকে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

كُنْثُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِ جَتْ لِلَّنَّا إِسْ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ط

অর্থ : তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০)।

আমর বিল মাঝক ও নাহি আনিল মুনকার মুমিনগণের বৈশিষ্ট্য। এ কাজ ব্যতীত কোনো ব্যক্তিই পূর্ণসং মুমিন হতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা মুমিনগণের পরিচয় দিয়ে বলেছেন-

الَّذِينَ إِنْ مَكَنُوهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوَةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلَّهِ عَاقِبَةٌ
○ الْأُمُورِ

অর্থ : আর তারা এমন লোক, আমি তাদের পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা সালাত কার্যেম করবে, যাকাত প্রদান করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। আর কর্মের প্রতিফলতো আল্লাহরই নিকট (সূরা আল-হাজ, আয়াত ৪১)।

সৎকাজের আদেশ সৎ ও ন্যায় কার্যাবলির প্রসার ঘটায়। এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সদাচরণ ও নেতৃত্ব গুণাবলি বিকশিত হয়। আর অসৎ কাজের নিষেধ সমাজ থেকে অন্যায়, অশ্রীলতা ও নির্যাতনের মূলোৎপাটন করে। মানুষ এর মাধ্যমে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ বুৰুতে শিখে ও ধীরে ধীরে সত্য ও ন্যায়ের পথ অনুসরণ করে। অন্যদিকে সমাজে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ না থাকলে সমাজ ধ্বংসের দ্বারপাঞ্জে উপনীত হয়। একটি হাদিসে মহানবি (স.) একটি উপমার মাধ্যমে এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, “আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থানকারী ও সীমালংঘনকারীদের উদাহরণ হলো একদল লোকের ন্যায়, যারা জাহাজের যাত্রী। লটারির মাধ্যমে এদের একদল উপর তলায় ও অপর দল নিচতলায় স্থান পেল। নিচতলার লোকজন পানির প্রয়োজন হলে উপর তলার লোকদের নিকট পানি আনতে যায়। এমতাবস্থায় তারা (নিচতলার লোকজন) বলল, আমরা যদি নিচেই একটা ছিদ্র করে নেই তবে উপর তলার লোকদের কষ্ট দেওয়া থেকে বাঁচা যেত। এখন যদি তারা (উপর তলার লোকজন) তাদের বাধা দেয় তবে নিজেরাও বাঁচতে পারে এবং সবাইকে বাঁচাতে পারবে” (বুখারি)।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ মানুষকে ধ্বংস থেকে বিরত রাখে। এতে সমাজে ধীন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যে ব্যক্তি এ কাজ করে সে আরও গভীরভাবে সৎকাজে উৎসাহী হয়। নিজ জীবনে সে ব্যক্তি সকল অন্যায় ও অসুস্মর কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

আমর বিল মার়ফ ও নাহি আনিল মুনকার ত্যাগের পরিণতি

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা আবশ্যিকীয় কর্তব্য। এ কর্তব্যে অবহেলা করার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ শাস্তি। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতেই এ জন্য শাস্তি প্রদান করেন। আর পরকালে এরপ ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে যত্নগাদায়ক আয়াব। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “বনি ইসরাইলের মধ্যে যারা কুফরি করেছে তাদেরকে দাউদ (আ.) ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের মুখ দিয়ে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। কেননা তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল ও অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছিল। তারা পরম্পরাকে মন্দকাজ থেকে বিরত রাখত না। বস্তুত অত্যন্ত জয়ন্য কর্মনীতিই তারা অবলম্বন করেছিল” (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৭৮-৭৯)।

মহানবি (স.) বলেছেন, “লোকেরা যখন কোনো অত্যাচারীকে (অত্যাচার করতে) দেখে, কিন্তু তারা তার হাত ধরে না (প্রতিরোধ করে না) এরূপ লোকদের উপর অচিরেই আল্লাহ শাস্তি পাঠাবেন” (তিরমিয়ি)।

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “সেই সন্তার শপথ যার হাতে আমার থ্রাণ। তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। অন্যথায় অচিরেই আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দেবেন। তখন তোমরা দোয়া করবে কিন্তু তা করুণ করা হবে না” (তিরমিয়ি)।

প্রকৃতপক্ষে, আমর বিল মার়ফ ও নাহি আনিল মুনকার মানব জীবনের অপরিহার্য কাজ। দুনিয়া ও আধিরাতের সফলতা এর উপরই নির্ভরশীল। তবে অন্যকে সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ করে বসে থাকলে চলবে না। বরং নিজেও তদনুযায়ী আমল করতে হবে। কেননা নিজে আমল না করে অন্যকে আদেশ দিলে পরকালে ভীষণ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। মহানবি (স.) বলেছেন, “কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিষ্কেপ করা হবে। এতে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে আসবে। সে এটা নিয়ে চারপাশে চক্র দিতে থাকবে যেমনভাবে গাঢ়া চক্রের মধ্যে ঘূরে থাকে। তখন জাহান্নামিরা তার চারপাশে সমবেত হবে এবং জিজ্ঞাসা করবে, হে অমুক! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি কি সৎকাজের আদেশ দিতে না এবং অসৎকাজে নিষেধ করতে না? উভয়ে সে বলবে, হ্যাঁ আমি সৎকাজের আদেশ দিতাম, কিন্তু নিজে তা করতাম না। আর অন্যদের খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করতাম, কিন্তু নিজে তা থেকে বিরত থাকতাম না” (বুখারি ও মুসলিম)।

অতএব, আমরা নিজেরা সৎকাজ করব ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকব। অতঃপর নিজ পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠী, প্রতিবেশী, সকলকে সৎকাজে উৎসাহিত করব। সৎকাজে সাহায্য-সহযোগিতা করব। আর অসৎকাজ থেকে তাদের বিরত রাখতে চেষ্টা করব। আমাদের সমাজে প্রচলিত অন্যায়, অসত্য ও অশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলব। সকলে মিলে সকল অন্যায় ও অত্যাচার দূর করে সুন্দর ও শাস্তিময় সমাজ গঠনে সচেষ্ট হব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার গুরুত ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করবে এবং আল-কুরআন ও হাদিসের উকৃতি উল্লেখপূর্বক একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।

পাঠ ১৬

আখলাকে যামিমাহ

(الْأَخْلَاقُ الدَّمِيْمَةُ)

পরিচয়

আখলাকে যামিমাহ অর্থ নিন্দনীয় স্বভাব। মানুষের সব চরিত্রিক বৈশিষ্ট্যই ভালো নয়। বরং মানব চরিত্রে এমন কিছু দিক রয়েছে যা অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয়। মানব চরিত্রের এসব নিন্দনীয় স্বভাবগুলোকে আখলাকে যামিমাহ বলা হয়। আখলাকে যামিমাহ হলো আখলাকে হামিদাহ-র সম্পূর্ণ বিপরীত। আখলাকে যামিমাহ-র অপর নাম আখলাকে সায়িয়াহ। আখলাকে সায়িয়াহ অর্থ অসংচরিত, মন্দ স্বভাব ইত্যাদি।

মানব চরিত্রে বহু নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন- মিথ্যা বলা, প্রতারণা, ঠাট্টা, বিশ্঵াসঘাতকতা, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, পরনিন্দা, পরচর্চা, অপব্যয়-ক্রপণতা, ক্রোধ, গর্ব-অহংকার ইত্যাদি। এসব স্বভাব আখলাকে যামিমাহ-র অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী পাঠগুলোতে আমরা আখলাকে যামিমাহ এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানব।

কুফল বা অপকারিতা

মানব সমাজে আখলাকে যামিমাহ-র কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ। এটি যেমন ব্যক্তি জীবনে অশান্তি দেকে আনে তেমনি সমাজ জীবনেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। অসংচরিত বা চরিত্রহীন ব্যক্তি পশুর চেয়েও অধম। তার মধ্যে নীতি, নেতৃত্বকা ও মানবিক মূল্যবোধের বিন্দুমাত্রও পাওয়া যায় না। সে শুধু গড়ন-আকৃতিতে মানুষ, কিন্তু তার স্বভাব-চরিত্র হয় পশুর ন্যায়। নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য সে মানবিক আদর্শসমূহকে বিসর্জন দেয়। আখলাকে যামিমাহ-র ফলে সে সবরকমের অন্যায়, অত্যাচার ও অশালীন কাজে লিঙ্গ হয়ে পড়ে। এমনকি হত্যা-রাহজানি, যুদ্ধ-বিশ্বাস ইত্যাদিতেও জড়িয়ে পড়ে। ফলে শান্তি, নিরাপত্তা, সামাজিক ঐক্য, সংহতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। সমাজে অরাজকতা ও অশান্তি বিস্তার লাভ করে।

মন্দ চরিত্রের মানুষ সমাজে ঘৃণার পাত্র। কেউ তাকে ভালোবাসে না, বিশ্বাস করে না। সকলেই তাকে ঘৃণা করে, এড়িয়ে চলে। তার বিপদাপদেও কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না। অসংচরিত মানুষকে পরকালীন জীবনে শোচনীয় পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। চরিত্রহীন ব্যক্তি সকল প্রকার পাপাচারে লিঙ্গ থাকে, সে আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হয়। আল্লাহ তায়ালা তাকে ভালোবাসেন না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা এরূপ অসংচরিত ব্যক্তিকে কঠিন শান্তি প্রদান করবেন। মহানবি (স.) বলেছেন—

لَا يَنْهُنْ حُلُلُ الْجَنَّةِ الْجَوْاْظُ وَلَا اجْعَظَرُ

অর্থ : দুশ্চরিত ও কৃত স্বভাবের মানুষ জান্মাতে প্রবেশ করতে পারবে না (আবু দাউদ)।

বক্তৃত আখলাকে যামিমাহ অত্যন্ত ঘৃণিত ও বর্জনীয় স্বভাব। এর ফলে দুনিয়া ও আধিবাতে মানুষ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সকলেরই এসব স্বভাব থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

আমরা অসংচরিত ত্যাগ করে সচরিত অবলম্বন করব। সত্যিকার মানুষ হিসেবে সকলের প্রিয়প্রিয় হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা আখলাকে যামিমাহের কুফল সম্পর্কে একটি চার্ট তৈরি করবে এবং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের
সামনে তা উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১৭

প্রতারণা (الغُصْنُ)

পরিচয়

প্রতারণা অর্থ ঠকানো, ফাঁকি দেওয়া, ধোকা দেওয়া, বিশ্বাস ভঙ্গ করা। এটি মিথ্যাচারের একটি বিশেষ রূপ। ইসলামি পরিভাষায়, প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে ফাঁকি বা ধোকার উপর ভিত্তি করে নিজ স্বার্থ হাসিল করাকে প্রতারণা বলা হয়। প্রতারণার মাধ্যমে অন্যকে ভুল বুঝিয়ে ঠকানো হয়।

প্রতারণা নানাভাবে হতে পারে। সাধারণত আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতারণার দৃষ্টান্ত বেশি পরিলক্ষিত হয়। যেমন- ওজনে কম দেওয়া, জাল মুদ্রা চালিয়ে দেওয়া, পণ্ড্রব্যের দোষ গোপন করা, ভালো জিনিস দেখিয়ে বিক্রির সময় খারাপ জিনিস দিয়ে দেওয়া, বেশি দামের দ্রব্যের সাথে কম দামের দ্রব্য মিশিয়ে বিক্রি করা, ভেজাল মেশানো, ফলে ও মাছে রাসায়নিক দ্রব্য দেওয়া, পণ্ড্রব্যের মিথ্যা প্রচারণা চালানো ইত্যাদি।

এ ছাড়াও মানবজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রতারণা হতে পারে। যেমন, পরীক্ষায় নকল করা, মিথ্যা সাক্ষ দিয়ে অন্যের হক নষ্ট করা, বিশ্বাস ভঙ্গ করা, ভুল ও মিথ্যা তথ্য দেওয়া, পথচারীকে ভুল রাস্তা বলে দেওয়া, সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ, এমনকি নিজ নিজ দায়িত্ব ঠিকমতো পালন না করাও প্রতারণার শামিল।

প্রতারণা বর্জনের গুরুত্ব

প্রতারণা অত্যন্ত গর্হিত ও ঘৃণিত কাজ। এটি মিথ্যাচারের শামিল। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণা মিথ্যা অপেক্ষাও জঘন্য। কেননা প্রতারণা করার দ্বারা দুটো পাপ হয়। একটি মিথ্যা বলা ও অপরটি বিশ্বাস ভঙ্গ করা। সুতরাং সর্বাবস্থায় প্রতারণা বর্জন করা আবশ্যিক। যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে প্রকৃত মুমিন নয়। কেননা ইহান ও প্রতারণা এক ব্যক্তির মধ্যে একত্রে থাকতে পারে না। প্রকৃত মুমিন কখনোই প্রতারণার আশ্রয় নেন না। নিজ স্বার্থের বিরোধী হলেও মুমিন ব্যক্তি সতত ও সত্যবাদিতার উপর অটল থাকেন। আমাদের প্রিয়নবি (স.) বলেছেন, “যে আমাদের বিরুদ্ধে আন্ত্র ধারণ করে সে আমার উম্মত নয়। আর যে কারণ সাথে প্রতারণা করে সে মুসলিম দলভুক্ত নয়।” (মুসলিম)। রাসুলুল্লাহ (স.) অন্য হাদিসে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থ : যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয় (তিরমিয়ি)।

ইসলামি শরিয়তে প্রতারণা করা, ধোকা দেওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম। ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, আচার-ব্যবহার ও আর্থ-সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডে কোনো অবস্থাতেই প্রতারণা জায়েজ নয়। কোনো কাজেই প্রতারণা করা যাবে না, সত্য- মিথ্যার মিশ্রণ করা যাবে না এবং সত্য ও প্রকৃত অবস্থা গোপন করা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا كُثُرُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থ : আর তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ করো না এবং জেনেশুনে সত্য গোপন করো না
(সূরা আল বাকারা, আয়াত ৪২)।

ব্যবসা-বাণিজ্যে পণ্যদ্রব্য সঠিকভাবে লেনদেন করতে হবে। পণ্যের দোষ ক্রটি ক্রেতার নিকট পরিচারভাবে বর্ণনা করতে হবে। পণ্যের সঠিক অবস্থা না জানিয়ে লেনদেন করা প্রতারণা, এটা হারাম বা অবৈধ। একটি হাদিসে বর্ণিত আছে, “একদা রাসুলুল্লাহ (স.) একটি খাদ্যদ্রব্যের স্তুপের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। এসময় তিনি স্তুপের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, স্তুপের ভিতরের দ্রব্য ভিজা ও বাইরেরগুলো শুকলো। তিনি বললেন, হে খাদ্যের মালিক! এটা কী? লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসুল! বৃষ্টির দরুণ এগুলো ভিজে গেছে। অতঃপর রাসুল (স.) বললেন, তবে তুমি ভিজা খাদ্যশস্য কেন উপরে রাখলে না? তাহলে ক্রেতারা এর অকৃত অবস্থা জানতে পারত (ফলে প্রতারিত হতো না)। বক্তৃত যে ধোঁকা দেয় সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য হবে না” (মুসলিম)।

প্রতারণা একটি সমাজদ্রোহী অপরাধ। এর দ্বারা পরস্পরের আস্থা ও বিশ্বাস নষ্ট হয়। সমাজে শক্তি জন্ম নেয়। প্রতারণাকারীকে কেউ পছন্দ করে না। সে যেমন মানবসমাজে ঘৃণিত তেমনি আল্লাহ তায়ালার নিকটও ঘৃণিত। মহানবি (স.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি দোষযুক্ত পণ্য বিক্রি করে এবং ক্রেতাকে দোষের কথা জানায় না, এমন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট ঘৃণিত। ফেরেশতাগণ সর্বদা তাকে অভিশাপ দিতে থাকেন” (ইবনে মাজাহ)।

অকৃতপক্ষে, প্রতারণাকারী দুনিয়াতেও ঘৃণিত, লজিজ ও অপদষ্ট হয়। আর আধিরাতে তার জন্য রয়েছে দুর্ভোগ ও ধৰ্ম। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَيْلٌ لِّلْمُكَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا كُتَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتُونُ فُؤَنَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ زَنْهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

অর্থ : ধৰ্ম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকের নিকট থেকে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তারা মেপে বা ওজন করে দেয় তখন কম দেয় (সূরা আল-মুতাফ্ফিল, আয়াত ১-৩)।

প্রতারণা আখলাকে যামিমাহ-র অন্যতম। এটি মারাত্মক অপরাধ। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এর কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ। অতএব, আমাদেরকে সকল কথা ও কাজে প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা প্রতারণা বর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে আল-কুরআন ও হাদিসের উন্নতি উল্লেখপূর্বক একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।

পাঠ ১৮

গিবত (الغَيْبَةِ)

পরিচয়

গিবত আরবি শব্দ। এর অর্থ পরানিদা, পরচর্চা, অসাক্ষাতে দুর্বাম করা, সমালোচনা করা, অপরের দোষ অকাশ করা, কুৎসা রটনা করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় কারও অনুপস্থিতিতে অন্যের নিকট এমন কোনো কথা বলা যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায় তাকে গিবত বলে। প্রচলিত অর্থে অগোচরে কারও দোষ বলাকে গিবত বলা হয়।

একটি হাদিসে মহানবি (স.) সুন্দরভাবে গিবতের পরিচয় বর্ণনা করেছেন। একদা নবি (স.) বললেন, তোমরা কি জানো গিবত কী? সাহাবিগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, “গিবত হলো-তুমি তোমার ভাইয়ের এমনভাবে আলোচনা করবে যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায়। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (স.)-কে বলা হলো, আমি যা বলব তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রেও কি তা গিবত হবে? উত্তরে রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে থাকে তবে তা গিবত হবে। আর যদি তা তার মধ্যে না পাওয়া যায় তবে তা হবে অপবাদ” (মুসলিম)।

গিবতের স্বরূপ

আমরা অনেক সময় অলস বসে থাকি। হাতে কোনো কাজ থাকে না। বন্ধুবাদৰ মিলে গল্ল করি। এসময় কথায় কথায় অন্যের সমালোচনা করি। সহপাঠী, বন্ধু-বাক্স, আত্মীয়-স্বজনের দোষ খুঁজে বেড়াই। তাদের নিয়ে ঠাট্টা করি। বস্তুত এসবই গিবত। ঠাট্টাছলে গল্ল করার সময় এসব কথার দ্বারা অনেক বড় গুনাহ হয়। তবে শুধু কথার মাধ্যমেই নয় বরং আরও নানা ভাবে গিবত হতে পারে। যেমন, লেখার মাধ্যমে, ইশারা-ইঙ্গিতে বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে কারও সমালোচনা করা। কারও কোনো অভ্যাস নিয়ে চিত্র, লেখা বা কার্টুনের মাধ্যমেও গিবত করা যায়।

কারও কোনো দোষ আলোচনা করা গিবতের সবচেয়ে পরিচিত রূপ। এ ছাড়াও শারীরিক দোষ-ক্রটি, পোশাক-পরিচ্ছদের সমালোচনা, জাত-বংশ নিয়ে ঠাট্টা করা, কারও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও অভ্যাস নিয়ে সমালোচনা করা ইত্যাদি গিবতের অন্তর্ভুক্ত।

গিবতের কুফল ও পরিণাম

ইসলামি শরিয়তে গিবত বা পরনিন্দা করা অবৈধ। আল্লাহ বলেছেন—

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۝ أَكْيَبْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلْ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۝

অর্থ : আর তোমরা একে অন্যের গিবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে ভালোবাসবে? বস্তুত তোমরা নিজেরাই তা অপছন্দ করে থাকো (সূরা আল-হজুরাত, আয়াত ১২)।

গিবত করাকে আল-কুরআনে নিজ মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং গিবত খুবই অপছন্দনীয় কাজ। সুস্থ বিবেকবান কোনো মানুষই এরূপ কাজ পছন্দ করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালাও গিবত করা পছন্দ করেন না।

পরিত্র হাদিসে মহানবি (স.) আমাদের গিবতের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “গিবত ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্ক। সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! গিবত কীভাবে ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্ক অপরাধ হয়? রাসূল (স.) বললেন, কোনো ব্যক্তি ব্যভিচার করার পর তওবা করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু গিবতকারীকে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ মাফ করবেন না, যতক্ষণ না যার গিবত করা হয়েছে সে ব্যক্তি মাফ করবে।” (বায়হাকি)

ইসলামি শরিয়তে গিবত সম্পূর্ণরূপে হারাম। কারও গিবত করা যেমন হারাম তেমনি গিবত শোনাও হারাম। গিবত না করার পাশাপাশি গিবত শোনা থেকেও বিরত থাকতে হবে। গিবতকারীকে গিবত বলা থেকে বিরত থাকার জন্য বলতে হবে। নতুবা যেসব স্থানে গিবতের আলোচনা হবে সেসব স্থান এড়িয়ে চলতে হবে।

গিবতের পাপ অত্যন্ত ভয়াবহ। আমরা অনেক সময় এমন ব্যক্তির গিবত করে থাকি যার নিকট ক্ষমা চাওয়ারও সুযোগ নেই। ফলে গিবতের এ পাপ আল্লাহও ক্ষমা করবেন না। সুতরাং আমরা গিবত করা থেকে বিরত থাকব। যদি কোনো কারণে তা হয়ে যায় তবে সাথে সাথে গিবতকৃত ব্যক্তির নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নেব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা গিবতের পরিচয়, কুফল ও পরিগাম সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ বাঢ়ি থেকে লিখে এনে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৯

হিংসা (الحسد)

হিংসা আখলাকে যামিমাহ-র অন্যতম দিক। হিংসা-বিদ্বেষ মানে অন্যের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করা, নিজেকে বড় মনে করা, অন্যকে ঘৃণা করা, শক্রতাবশত অন্যের ক্ষতি কামনা করা, অন্যের উন্নতি, সুখ সহ্য করতে না পারা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় অন্যের সুখ-সম্পদ, শান্তি-সাফল্য ধ্বংস হওয়া ও নিজে এর মালিক হওয়ার কামনাকে হিংসা বলা হয়। আরবি ভাষায় হিংসার প্রতিশব্দ হলো হাসাদ (الحسد)।

হিংসার কুফল

হিংসা-বিদ্বেষ মানব চরিত্রের অত্যন্ত নিন্দনীয় অভ্যাস। এটি মানব চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়। হিংসুক ব্যক্তি কখনোই সচরিত্বান হতে পারে না। কেননা গর্ব-অহংকার, প্রশংসনীয়তা, শক্রতা, অন্যের অনিষ্ট কামনা ইত্যাদি হিংসার সাথে অঙ্গজিভাবে জড়িত। হিংসুক ব্যক্তির মধ্যে এসব অভ্যাসও গড়ে উঠে।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের সকলের সাথে সে মিলেমিশে চলে। সামাজিক শান্তিই তার প্রধান লক্ষ্য। সামাজিক শান্তির জন্য প্রয়োজন সাম্য, মৈত্রী, ভালোবাসা, ভাতৃত্ব, পরম্পর সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। একটি হাদিসে মহানবি (স.) বলেছেন, “পরম্পর কল্যাণকামিতাই হলো দীন।” হিংসা এসব সদ্গুণ ধ্বংস করে দেয়। হিংসুক ব্যক্তি নিজেকে বড় মনে করে, নিজের স্বার্থকে সবচেয়ে বড় করে দেখে। সে অন্যকে ঘৃণা করে, অন্যের প্রতি শক্রতা পোষণ করে, অন্যের অনিষ্ট কামনা করে। এতে মানবসমাজে ঐক্য, সংহতি বিনষ্ট হয়, শান্তি-শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়।

হিংসা-বিদ্বেষ জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও উন্নতির পথে অন্তরায়। এর ফলে জাতির মধ্যে বিভেদ বৈষম্য দেখা দেয়, শক্রতা বৃদ্ধি পায়। এতে মুসলিম জাতির ঐক্য ও ভাতৃত্ব নষ্ট হয়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মুগ্ধনকারী (ধ্বংসকারী) রোগ- ঘৃণা ও হিংসা তোমাদের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। আমি চুল মুগ্ধনের কথা বলছি না, বরং তা হলো দীনের মুগ্ধনকারী” (তিরমিয়ি)।

হিংসা বিদ্বেষ পরকালীন জীবনেও মানুষের ক্ষতির কারণ। হিংসা মানুষের সকল নেক আমলকে ধ্বংস

করে দেয়। মহানবি (স.) বলেছেন—

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فِيَّنَ الْحَسَدَ يَا كُلُّ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارَ الْحَطَبَ

অর্থ : তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা আগুন যেমন কাঠকে খেয়ে ফেলে (পুড়িয়ে দেয়), হিংসাও তেমনি মানুষের সৎকর্মগুলোকে খেয়ে ফেলে (নষ্ট করে দেয়) (আবু দাউদ)।

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “তিনি ব্যক্তির গুণাহ মাফ হয় না। তন্মধ্যে একজন হচ্ছে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী” (আদাবুল মুফরাদ)।

হিংসার ব্যাপারে ইসলামের বিধান

ইসলামি শরিয়তে হিংসা বিদ্বেষ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি কখনোই হিংসুক হতে পারে না। বরং অন্যের কল্যাণ কামনা ও পরম্পর সাহায্য-সহযোগিতা করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা হিংসা থেকে আশ্রয় চাওয়ার জন্য আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

وَمِنْ شَرِّ حَسِيلٍ إِذَا حَسَلَ

অর্থ : আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে (পানাহ চাই) যখন সে হিংসা করে (সুরা আল-ফালাক, আয়াত ৫)।

মহানবি (স.) বলেছেন, “তোমরা পরম্পর হিংসা করবে না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করবে না ও পরম্পর বিরুদ্ধাচরণ করবে না। বরং সবাই আল্লাহর বান্দা, ভাই-ভাই হয়ে থাকবে।” (বুখারি ও মুসলিম)

হিংসা-বিদ্বেষ অত্যন্ত মারাত্মক সামাজিক অপরাধ। এটি মানুষের নেক আমল ও সচরিত্রসমূহ বিনষ্ট করে দেয়। ব্যক্তিগত সাফল্য ও জাতীয় উন্নতির জন্য সকলেরই হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করা উচিত।

কাজ : শিক্ষার্থীরা হিংসার কুফল সম্পর্কে মহানবি (স.)-এর একটি বাণী লিখে পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করবে।

পাঠ ২০

الْفِتْنَةُ وَالْفَسَادُ

পরিচয়

ফিতনা ও ফাসাদ উভয়টি আরবি শব্দ। ফিতনা (**الْفِتْنَةُ**) অর্থ অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, কলহ ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় ফিতনা-ফাসাদ বলতে বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় সৃষ্টি বুঝায়। অর্থাৎ সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ অবস্থার বিপরীত অরাজক পরিস্থিতিই ফিতনা-ফাসাদ। মানবসমাজে ভয়-ভীতি, অত্যাচার-অনাচার ইত্যাদির মাধ্যমে নানা বিপর্যয়

সৃষ্টি করা যায়। এরপ অস্থিতিশীল পরিস্থিতিই ফিতনা-ফাসাদ। সন্ত্রাস, ছিনতাই, রাহাজানি, গুম, খুন, অপহরণ, জঙ্গিবাদ ইত্যাদি ফিতনা-ফাসাদের অন্তর্ভুক্ত। অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, কলহ, ঘড়বংশ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদিও ফিতনা-ফাসাদের অন্যরূপ।

কুফল

ইসলাম শাস্তির ধর্ম, সুশৃঙ্খল ও সুন্দর জীবনব্যবস্থা। এতে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার কোনো স্থান নেই। বরং ঐক্য, আত্মত্ব, মেঝী, উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা ইত্যাদি ইসলামের ভিত্তি। ইসলামের সকল আচার-আচরণ, বিধি-বিধান বিজ্ঞানসম্মত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। জামাআতে সালাত আদায় এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা, সাদা-কালো সবাই সারিবদ্ধতাবে এক ইমামের নেতৃত্বে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে দাঁড়ায়। সকলে একই সাথে রকু-সিজদাহ করে, সালাত আদায় করে। এতে শৃঙ্খলাহীনতার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তায়ালার অন্যান্য বিধি-বিধানও তদ্রুপ। এমনকি এ গোটা মহাবিশ্বও আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত সুশৃঙ্খল পছাড় পরিচালিত। কোথাও কোনোরূপ অরাজকতা ও অব্যবস্থাপনা নেই।

আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনও এরপ শৃঙ্খলাপূর্ণ হওয়া উচিত। এটাই ইসলামের লক্ষ্য। কিন্তু ফিতনা-ফাসাদ এ লক্ষ্য পূরণের প্রধান অন্তরায়। ফিতনা-ফাসাদের ফলে জীবনের সর্বস্তরেই বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় নেমে আসে। মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দুর্বিধ হয়ে পড়ে।

যে সমাজে ফিতনা-ফাসাদ প্রসার লাভ করে সে সমাজ কখনো উন্নতি করতে পারে না। সমাজের ঐক্য-সংহতি বিনষ্ট হয়। এরপ সমাজে মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মুখের কোনো নিরাপত্তা থাকে না। মানুষ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে না। শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান সুস্থুভাবে সম্পন্ন করা যায় না। ফিতনা-ফাসাদ সমাজে ভয়-ভীতি ও আতঙ্কের জন্ম দেয়। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়ে। এককথায়, ফিতনা-ফাসাদের ফলে সমাজে ও দেশে অরাজকতা দেখা দেয়। শাস্তি ও উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

বস্তুত ফিতনা-ফাসাদ অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ। এর দ্বারা সমাজে সকল অন্যায়-অত্যাচারের দরজা খুলে যায়। অরাজক পরিস্থিতিতে অসৎ মানুষেরা সব ধরনের পাপ কাজের সুযোগ পায়। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنِ الْقَتْلِ

অর্থ : আর ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৯১)।

ফিতনা-ফাসাদ সমাজে অনৈতিকতার জন্ম দেয়, নিদর্শনীয় চরিত্র চর্চার প্রসার ঘটায়। ফিতনা-ফাসাদ সমাজের নেতৃত্বিক ও মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে।

ফিতনা-ফাসাদ সম্পর্কে ইসলামি বিধান

ফিতনা-ফাসাদ সম্পূর্ণরূপে ইসলামি আদর্শের বিরোধী। এটি হারাম বা নিষিদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করাকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَغْرِإِصْلَاحِهَا

অর্থ : আর পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাতে তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না (সূরা আল-আরাফ, আয়াত ৫৬)।

পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ মানুষেরই সৃষ্টি। মানুষ তার অন্যায় ও মন্দকর্মের মাধ্যমে পৃথিবীতে নানা ধরনের ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে। যারা ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে তারা খুবই জগন্য চরিত্রের অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা তাদের ঘৃণা করেন, তিনি বলেন,

وَلَا تَبْعِثُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

অর্থ : আর তুমি পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা করতে চাইবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না (সূরা আল-কাসাস, আয়াত ৭৭)।

মানবজীবনে ফিতনা-ফাসাদের কুফল ও পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আমরা সদাসর্বদা এ থেকে বেঁচে থাকব। উন্নমণি গুণবলির অনুসরণ ও সৎকর্মের মাধ্যমে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করব। যেকোনো প্রকার সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও অরাজকতার বিরুদ্ধে সকলে মিলে প্রতিরোধ গড়ে তুলব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ফিতনা-ফাসাদের কুফলগুলো লিখে একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করবে।

পাঠ ২১

কর্মবিমুখতা (الكسل)

কর্মবিমুখতা বলতে কাজ না করার ইচ্ছাকে বোঝায়। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোনো কাজ না করে অলস বা বেকার বসে থাকাকে কর্মবিমুখতা বলা হয়। কোনো অক্ষম ব্যক্তি যদি কোনো কাজ করতে না পারে তবে তা কর্মবিমুখতা নয়। যেমন- অদ্ব, বধির বা প্রতিবন্ধীরা শারীরিক কারণে সবধরনের কাজ করতে সমর্থ নয়। বরং যোগ্যতা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অলসতা বা অন্য কোনো কারণে স্বেচ্ছায় কোনো কাজ না করে বেকার বসে থাকা হলো কর্মবিমুখতা।

কুফল

মানবজীবনে কাজের কোনো বিকল্প নেই। জীবনে বড় হওয়ার জন্য, জীবিকা উপর্যুক্তের জন্য মানুষকে বহু কাজ করতে হয়। সময়মতো যথাযথভাবে এসব কাজ সম্পাদনের উপরই মানুষের উন্নতি ও সফলতা নির্ভর করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বা জাতি কর্মবিমুখ সে ব্যক্তি বা জাতি কখনো উন্নতি করতে পারে না। কর্মবিমুখতা একটি জাতির জন্য দুর্ভাগ্য, কলঙ্কস্বরূপ।

কর্মবিমুখতা মানুষের মধ্যে অলসতা সৃষ্টি করে। এতে মানুষ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। মানুষের কর্মসূহা, কর্মক্ষমতা লোপ পায়। বলা হয় ‘অলস মন্তিক শয়তানের কারখানা’। অলস ব্যক্তিরা নানা অসৎ ও

অনেক চিন্তা ও কর্মে ব্যাপ্ত থাকে। অনেক সময় সন্ধাস সৃষ্টি, ছিলতাই, রাহাজানি ইত্যাদি অসৎ ও পাপকার্যে জড়িয়ে পড়ে। ফলে সামাজিক অবক্ষয় দেখা দেয়।

কর্মবিমুখতার ফলে মানুষের মেধা, শক্তি ও সময়ের অপচয় হয়। কর্মবিমুখ বেকারকে কেউ ভালোবাসে না। কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব বা আত্মায়তার সম্পর্ক করতে চায় না। কর্মবিমুখতা মানুষের আত্মসম্মানবোধ লোপ করে। অন্যের অর্থে জীবনযাপন করার মানসিকতা তৈরি হয়। এতে মানুষ হতাশ হয়ে পড়ে। অনেক সময় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

কর্মবিমুখতা পরিহারের গুরুত্ব

ইসলাম কল্যাণের ধর্ম। মানুষের অকল্যাণ হয় এমন কোনো বিধান বা আচার-আচরণ ইসলাম সমর্থন করে না। কর্মবিমুখতা মানবজীবনে অভিশাপ স্বরূপ। ইসলামে এর কোনো স্থান নেই। ইসলামে মানুষকে কাজ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইবাদত পালনের পরপরই কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَأَنْتَ شُرُّوْفَ وَأَبْتَغُوْفَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

অর্থ : অতঃপর সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর (সূরা আল-জুমুআ, আয়াত ১০)।

হাদিসে জীবিকা অর্জনের জন্য কাজকেও ফরজ ঘোষণা করা হয়েছে। মহানবি (স.) বলেছেন—

طَلَبَ كَسْبِ الْخَالِلِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ

অর্থ : হালাল উপায়ে জীবিকা অন্ধেষণ করা ফরজের পর আরও একটি ফরজ কাজ (বায়হাকি)।

জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করার প্রয়োজন অনন্তীকার্য। এজন্য বসে থাকলে চলবে না। বরং নিজ উদ্যোগে কাজ করার জন্য ইসলামে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উন্নত খাদ্য কেউ কোনোদিন খায়নি” (বুখারি)।

ইসলামে কর্মবিমুখতার কোনো সুযোগ নেই। বরং জীবিকা অর্জনের জন্য যেকোনো হালাল শ্রমকেই উৎসাহিত করা হয়েছে। নবি-রাসূলগণের জীবনী পড়লে জানা যায় যে, তাঁরা জীবিকা উপার্জনের জন্য নানা কাজ করেছেন। হ্যরত আদম (আ.) কৃষি কাজ করতেন, হ্যরত দাউদ (আ.) কামারের কাজ করতেন, আমাদের নবি (স.) ব্যবসা করতেন। জীবিকার প্রয়োজনে তাঁরা ছাগলও চরিয়েছেন। সুতরাং কোনো শ্রমই ছেট নয়। হ্যরত উমর (রা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন জীবিকা উপার্জনের চেষ্টায় নিরুৎসাহিত হয়ে বসে না থাকে। আমাদের অনেকে পড়ালেখা শেষ করে বেকার বসে থাকে। এক্ষণ বেকারত্ব ঠিক নয়। বরং যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করা দরকার। এতে শরীর মন ভালো থাকে। আল্লাহ তায়ালা ও সন্তুষ্ট হন।

কাজ: একজন প্রকৃত মুমিন কিছুতেই কর্মবিমুখ হতে পারে না- শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের নির্দেশনায় কুরআন ও হাদিসের আলোকে এ উক্তির যথার্থতা নিরূপণ করবে।

পাঠ ২২

(الزِّيَّا وَالرَّشْوُهُ) সুদ ও ঘূষ

সুদ

সুদ এর আরবি প্রতিশব্দ রিবা (الرِّبُوُّ)। কাউকে প্রদত্ত খণ্ডের মূল পরিমাণের উপর অতিরিক্ত আদায় করাকে রিবা (الرِّبُوُّ) বা সুদ বলা হয়। ইসলাম পূর্বকালে আরব দেশে এটি একধরনের ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছিল। আরবসহ বিশ্বের অনেক সমাজে এ পথা প্রচলিত ছিল। যার ফলে ধনী আরও ধনী হতো আর গরিব ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব হয়ে যেত। এটা ছিল শোষণের নামান্তর। তাই ইসলাম এটাকে হারাম ঘোষণা করে। অনেকে সুদ ও মুনাফা বা লভ্যাংশকে সমরূপ মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদুটো এক নয়। কেননা সুদে শোকসানের কোনো বুঁকি থাকে না। আর মুনাফা বা লভ্যাংশে বুঁকি থাকে। সুদের সংজ্ঞা দিয়ে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন—

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبُوٌ

অর্থ : যে খণ্ড কোনো লাভ নিয়ে আসে তা-ই রিবা (সুদ) (জামি সগির)।

খণ্ডাতা কর্তৃক খণ্ডহীতা থেকে মূলধনের অতিরিক্ত কোনো লাভ নেওয়াই হলো সুদ। যেমন কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে একশত টাকা এ শর্তে খণ্ড দিল যে গ্রহীতা একশত দশ টাকা পরিশোধ করবে। এক্ষেত্রে একশত টাকার অতিরিক্ত দশ টাকা হলো সুদ। কেননা এর কোনো বিনিময় মূল্য নেই।

শুধু টাকা পয়সা বা মাল সম্পদ বিনিময়েই সুদ সীমাবদ্ধ নয়। বরং একই শ্রেণিভুক্ত পণ্যদ্রব্যের লেনদেনে কম-বেশি করা হলেও তা সুদের আওতাভুক্ত হবে। যেমন- এক কেজি চালের বিনিময়ে দেড় কেজি চাল নেওয়া কিংবা এক কেজি চাল ও অতিরিক্ত অন্য কিছু নেওয়াও সুদ হবে। মহানবি (স.) স্পষ্ট করে বলেছেন, “সোনার বিনিময়ে সোনা, ঝুঁপার বিনিময়ে ঝুঁপা, ঘবের বিনিময়ে ঘব, আটার বিনিময়ে আটা, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ, এমনিভাবে সমজাতীয় দ্রব্যের নগদ আদান-প্রদানে অতিরিক্ত কিছু হলেই তা সুদ হবে” (মুসলিম)।

ঘূষ

ঘূষ অর্থ উৎকোচ। স্বাভাবিক প্রাপ্ত্যের পরও অসদুপায়ে অতিরিক্ত সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করাকে ঘূষ বলে। কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী তাদের কাজের জন্য নির্দিষ্ট বেতন-ভাতা পায়। কিন্তু তারা যদি ঐ কাজের জন্যই অন্যায়ভাবে আরও বেশি কিছু গ্রহণ করে তা হলো ঘূষ। যেমন কারও কোনো কাজ আটকে রেখে তার নিকট থেকে টাকা পয়সা আদায় করা। অন্য কথায়, অধিকার নেই একুপ বস্তু বা বিষয় লাভের জন্য দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষকে অন্যায়ভাবে কোনো সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধা দেওয়া কিংবা নেওয়াকে ঘূষ বলা হয়।

সমাজে নানাভাবে ঘূষের প্রচলন দেখা যায়। সাধারণত মানুষ অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য টাকা-পয়সা ঘূষ দিয়ে থাকে। এছাড়া উপহারের নামে নানা দ্রব্যসামগ্ৰী যেমন, তিতি, ফ্রিজ, গহনা, ফ্ল্যাট ইত্যাদিও ঘূষ

হিসেবে দেওয়া হয়। বক্তৃত দ্রব্যসামগ্ৰী যে মূল্যমানেরই হোক, টাকা-পয়সা কম হোক বা বেশি হোক, ঘুষ হিসেবে ব্যবহৃত হলে তা হারাম হবে।

কুফল ও পরিণতি

সুদ ও ঘুষ অত্যন্ত জঘন্য অর্থনৈতিক অপরাধ। এর কুফল ও অপকারিতা অত্যন্ত ভয়াবহ। সুদ মানবসমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্ম দেয়। ধনী আরও ধনী হয়। গরিব আরও গরিব হয়। ফলে সমাজের মধ্যে শ্রেণিভেদ গড়ে উঠে। পারম্পরিক মারা-মরতা, ভালোবাসা ও সহযোগিতার পথ রুক্ষ হয়ে যায়। সুদের কারণে জাতীয় প্ৰবৃত্তি ও অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয়। লোকেরা বিনিয়োগে উৎসাহী হয় না। বৰং সম্পদ অনুৎপাদনশীলভাবে সুদি কারবারে লাগায়। ফলে দেশের বিনিয়োগ কমে যায়, জাতীয় উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়।

ঘুষ ও মানবসমাজে অশান্তি ডেকে আনে। ঘুষখোর ব্যক্তি নিজ দায়িত্ব কর্তব্যে অবহেলা করে, আমানতের খিলানত করে। নিজ ক্ষমতা ও দায়িত্বের অপব্যবহার করে। ঘুষদাতা ও ঘুষখোর অন্য লোকের অধিকার হৰণ করে। ফলে অধিকার বাধিতদের সাথে তাদের শক্তা সৃষ্টি হয়। সমাজে মারামারি-হানাহানির সূত্রপাত ঘটে।

বক্তৃত সুদ ও ঘুষের অপকারিতা অত্যন্ত মারাত্মক। এটি সমাজে নৈতিক অবক্ষয় ডেকে আনে। সুদ ও ঘুষের প্রভাবে মানুষ নৈতিক ও মানবিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। বৰং অসৎ চৰিত্ব ও মন্দ অভ্যাসের চৰ্চা শুরু করে। মানুষের মধ্যে লোভ-লালসা, অপচয় ও পাপাচারের প্ৰসার ঘটে। অনেক সময় সুদ-ঘুষের অতিরিক্ত অর্থের জন্য মানুষ নানা রূপ অপরাধমূলক কৰ্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। সন্তাস, ছিনতাই, রাহাজানি, খুন ইত্যাদি বৃক্ষি পায়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “যে সমাজে জিনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে তার অধিবাসীরা দুর্ভিক্ষের কৰাল থাসে নিপত্তি হয়। আর যে সমাজে ঘুষ লেনদেন প্ৰসাৱ লাভ কৰে সে সমাজে ভীতি ও সন্তাস সৃষ্টি হয়ে থাকে” (মুসলাদে আহমাদ)।

আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সুদ ও ঘুষের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর। ধৰ্মীয় দিক থেকেও এর কুফল অত্যন্ত ব্যাপক। সুদ-ঘুষের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ হারাম বা অবৈধ। আৱ হারাম কোনো অবস্থাতেই গ্ৰহণযোগ্য নয়। যাৱ শৱীৰ হারাম খাদ্যে গঠিত, যাৱ পোশাক পৱিছদ হারাম টাকায় অৰ্জিত এৱল ব্যক্তিৰ কোনো ইবাদত কৰুল হয় না, এমনকি তাৱ কোনো দোয়াও আল্লাহ তায়ালা কৰুল কৰেন না। সুদ ও ঘুষের লেনদেনকাৰী যেমন মানুষের নিকট ঘৃণিত তেমনি সে আল্লাহ ও তাৱ রাসুল (স.)-এৰ নিকটও ঘৃণিত। আল্লাহ ও তাৱ রাসুল (স.) সুদ ও ঘুষের লেনদেনকাৰীকে অভিসম্পাত কৰেন, লানত দেন। একটি হাদিসে উল্লেখ কৰা হয়েছে—

لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا وَمُوْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهُ

অর্থ : নবি করিম (স.) সুদখোর, সুদ দাতা, সুদ চৰ্কি লেখক ও সুদি লেনদেনের সাক্ষীকে অভিশাপ দিয়েছেন (মুসলিম)।

নবি করিম (স.) অন্যত্র বলেছেন, **لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاِثِي وَالْمُرْتَشِي**

অর্থ : ঘুষ প্রদানকারী ও ঘুষ গ্রহণকারী উভয়ের উপরই আল্লাহর অভিসম্পত্তি (বুখারি ও মুসলিম)।

সুদ ও ঘুষ লেনদেন করার পরিণতিও অত্যন্ত ভয়াবহ। এর ফলে মানুষ আল্লাহ তায়ালার শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় দুনিয়াতেও আল্লাহ তায়ালা তাদের পাকড়াও করেন। মহানবি (স.) বলেন-

إِذَا ظَهَرَ الرِّبُّوْفِيْ فَقَدْ أَحَلُّواْ بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

অর্থ : কোনো গ্রামে বা দেশে যখন জিনা ব্যভিচার ও সুদ ব্যাপকতা লাভ করে তখন সেখানকার অধিবাসীদের উপর আল্লাহর আঘাত আসা অনিবার্য হয়ে পড়ে (মুসতাদরাকে হাকিম)।

পরকালে সুদ ও ঘুষের লেনদেনকারীর স্থান হবে জাহান্নাম। কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। সুদখোরদের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, “যারা সুদ খায় তারা সে ব্যক্তির ন্যায় দণ্ডয়ামান হবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এজন্য যে তারা বলে, বেচা-কেনা তো সুদের মতোই” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৭৫)।

أَلَّا يَشْفَعُ وَالْمُرْتَبَىٰ كَلَامًا فِي النَّارِ

অর্থ : ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহিতা উভয়ই জাহান্নামি (তাবারানি)।

অন্য হাদিসে বাসুলুল্লাহ (স.) ঘুষখোরদের অভিনব শাস্তির বিষয় বর্ণনা করেছেন। হাদিস শরিফে এসেছে, আয়ত গোত্রের এক ব্যক্তিকে নবি করিম (স.) যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োগ করলেন। তার ডাকনাম ছিল ইবনুল লুতবিয়া। সে (যাকাত আদায় করে) ফিরে এসে মহানবি (স.)-কে বলল, এই মাল আপনাদের আর এই মাল আমাকে উপটোকন দেওয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (স.) মিস্তারে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ প্রকাশ করার পর বলেন- যেসব পদের অভিভাবক আল্লাহ আমাকে করেছেন, তার মধ্য থেকে কোনো পদে আমি তোমাদের কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করি। সে আমার কাছে ফিরে এসে বলে, এগুলো আপনাদের, আর এগুলো আমাকে উপটোকন দেওয়া হয়েছে। এ ব্যক্তি তার বাবা-মায়ের ঘরে বসে থাকে না কেন? যদি সে সত্যবাদী হয় তবে সেখানেই তো তার উপটোকন পৌছে দেওয়া হবে। আল্লাহর শপথ। তোমাদের কোনো ব্যক্তি অনধিকারে (বা অবৈধভাবে) কোনো কিছু গ্রহণ করলে, কিয়ামতের দিন সে তা বহন করতে করতে আল্লাহর সামনে হাজির হবে। অতএব আমি তোমাদের কাউকে আল্লাহর দরবারে এই অবস্থায় উপস্থিত হতে দেখতে চাই না যে, সে উট বহন করবে আর তা আওয়াজ করতে থাকবে অথবা গাভী (বহন করে নিয়ে আসবে আর তা) হাস্বা হাস্বা করতে থাকবে অথবা বকরি (বোঝা বহন করে নিয়ে আসবে আর তা) ভ্যা ভ্যা করতে থাকবে। অতঃপর তিনি তাঁর দু'হাত এত উপরে উঠালেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আমি কি (তোমার হৃকুম) পৌছে দিয়েছি? তিনবার তিনি এ কথা বলেন (বুখারি ও মুসলিম)।

ইসলামের আলোকে সুদ-ঘুষের বিধান

ইসলামে সুদ ও ঘুষকে স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এগুলো অবৈধ, কোনো অবস্থাতেই সুদ-ঘুষের লেনদেন বৈধ নয়।

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبُّوْا

অর্থ : আর আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৭৫)।

অন্য আয়াতে এসেছে, “হে ইমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃন্দি হারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। তাহলে তোমরা সফলকাম হতে পারবে” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩০)।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, “হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৭৮)।

ঘুষের আদান প্রদানও হারাম বা অবৈধ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “তোমরা পরম্পরের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে জেনেশুনে বিচারকদের নিকট পেশ করো না” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮৮)।

সুদ ও ঘুষ সর্বাবস্থায় হারাম। এগুলো গ্রহণ করা যেমন হারাম তেমনি দেওয়াও হারাম। তেমনিভাবে সুদ দেওয়া ও সুদ নেওয়া উভয়টি সমান অপরাধ। এমনকি সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকাও অপরাধ। রাসূল (স.) সুদি কারবারে বা সুদি লেনদেনে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন। বস্তুত সুদ ও ঘুষ খুবই জঘন্য অপরাধ। রাসূলুল্লাহ (স.) বহু হাদিসে মানুষকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন।

সুদ ও ঘুষের লেনদেন অত্যন্ত গর্হিত কাজ। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পর্ক ব্যক্তিগণ এরূপ কাজ কখনোই করতে পারে না। আমরাও জীবনের সর্বাবস্থায় সুদ ও ঘুষের লেনদেন থেকে বিরত থাকব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সুদ ও ঘুষের কুফল ও পরিণতি সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি

১. আখলাকে হামিদাহ অর্থ কী?

- ক. নিদর্শনীয় চরিত্র
- খ. সচরিত্র
- গ. খোদাভীতি
- ঘ. আত্মশুন্দি

২. সত্যবাদিতা-

- i. রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভে সহায়তা করে
- ii. সমাজে বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে
- iii. মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়তা করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ত ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

জনাব 'ক' খাদ্যে ভেজাল ও ওজনে কম দিয়ে অনেক ধন সম্পদের মালিক হয়ে যায়। একসময় তিনি উপলব্ধি করেন অসততার লাভ সাময়িক। তাই তিনি সকল অসৎ কাজ ছাড়ার জন্য আল্লাহর নিকট তওবা করেন। 'ক'-এর বন্ধু জনাব 'খ' জমিতে চাষ দেওয়ার সময় একটি পুরোনো বাক্সে মূল্যবান সোনার অলঙ্কার দেখতে পান। তার এক বন্ধু সোনার অলঙ্কার নিজের কাছে রাখার পরামর্শ দেন। উভরে 'খ' বলেন অন্যের সম্পদ আত্মসাংকরা হারাম। এ কাজের জন্য তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

৩. জনাব 'ক'-এর কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদাহ'র কোন গুণটি ফুটে উঠেছে?

- | | | | |
|----|------------------|----|------------|
| ক. | তাকওয়া | খ. | আত্মগুণ্ডি |
| গ. | কর্তব্যপ্রয়োগতা | ঘ. | সত্যবাদিতা |

৪. জনাব 'খ'-এর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আখলাকে হামিদাহ'র যে গুণটি প্রতিফলিত হয়েছে, তার ফলে-

- i. পরিশুল্ক মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা যায়
- ii. রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করা যায়
- iii. মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

(১)

দৃশ্যপট-১ : জনাব 'ক' একজন তরুণ প্রকৌশলী। বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার পর তার অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগানোর জন্য তিনি দেশে ফিরে আসেন। তিনি একটি প্রযুক্তিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠানে বহু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি চাষাবাদের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি তৈরি করে। এই যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কৃষকগণ সহজেই ফসল ঘরে তুলে আনেন।

দৃশ্যপট-২ : জনাব 'খ' একজন শুন্দি ব্যবসায়ী। তিনি দোকানে যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গিয়ে তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়েন। ঘটনা শুনতে পেয়ে 'খ'-এর বন্ধু জনাব 'গ' হাসপাতালে ছুটে যান। সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত 'খ'-এর পরিবারের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন। 'খ' সুস্থ হলে 'গ' তাকে ব্যবসার জন্য বিনা সুদে নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা ধর দেন।

দৃশ্যপট-৩ : 'ক' অঞ্চলে নানা ধর্মের লোক বসবাস করে। তাদের প্রত্যেক ধর্মের লোকদের জন্য রয়েছে আলাদা উপাসনালয়। এই উপাসনালয়ে তারা নিজ নিজ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করেন। সকল ধর্মের লোক শান্তিপূর্ণভাবে তাদের ধর্মীয় উৎসব পালন করেন। 'ক' অঞ্চলের সকল মানুষ একে অন্যকে সম্মান করেন।

- ক. মিতব্যযিতা কী?
- খ. 'পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক' ব্যাখ্যা কর।
- গ. দৃশ্যপট-১-এ জনাব 'ক' এর কর্মকাণ্ডে আখলাকে হামিদাহ'র কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. দৃশ্যপট-২ ও দৃশ্যপট-৩-এ আখলাকে হামিদাহ'র যে গুণসমূহ ফুটে উঠেছে তা চিহ্নিত করে দেশের শান্তি ও উন্নয়নের জন্য কোনটি ভূমিকা রাখে বলে তুমি মনে করো? উভরের স্বপনকে যুক্তি দাও।

(২)

দৃশ্যপট-১ : জনাব 'ক' ঢাকায় ব্যবসা করে। গ্রাম থেকে বদ্ধ জনাব 'খ' তার বাসায় বেড়াতে আসে। 'ক' 'খ'-কে জানায় সে এমন একটি ব্যবসার খোঁজ পেয়েছে যেখানে অন্ন পুঁজিতে অনেক লাভ পাওয়া যায়। 'খ' তার জমানো নগদ সব টাকা এবং গ্রামের জমি বিক্রি করে সব টাকা 'ক'-কে দেয়। কিছুদিন পর 'ক' টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যায়।

দৃশ্যপট-২ : 'গ' ও 'ঘ' গ্রামের প্রতিবেশী। তাদের মধ্যে খুব ভালো বন্ধুত্ব তৈরি হয়। 'গ' খুবই মিশ্রক প্রকৃতির মেয়ে। সে গ্রামের সবার সাথে মিশতে পছন্দ করে। অন্যদিকে 'ঘ' চাপা স্বভাবের মেয়ে। সে সবার সাথে মিশতে পারতো না। 'গ'-কে গ্রামের সবাই পছন্দ করতো। 'গ'-এর এই জনপ্রিয়তা 'ঘ'-এর ভালো লাগতো না। তার মন খারাপ হয়ে যেতো।

দৃশ্যপট-৩ : 'ঙ' বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে গ্রামে ফিরে আসে। সে সারাদিন বন্ধুদের সাথে আড়তা দিয়ে সময় কাটায়। তার মা তাকে বাবার ব্যবসায় সাহায্য করতে বলেন। 'ঙ' বলে, ব্যবসা তার ভালো লাগে না। বাবা তাকে চাকুরির চেষ্টা করতে বলেন। 'ঙ' বলে, চাকুরি হলো গোলামি। তাই তার দ্বারা এই গোলামি করা সম্ভব না।

- ক. শালীনতা কাকে বলে?
- খ. ওয়াদা রক্ষা করা জরুরি কেন? ব্যাখ্যা কর।
- গ. দৃশ্যপট-১-এ জনাব 'ক'-এর কর্মকাণ্ডে আখলাকে যামিমাহ'র কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. দৃশ্যপট-২-এ 'ঘ'-এর ও দৃশ্যপট-৩-এ 'ঙ'-এর কর্মকাণ্ডে আখলাকে যামিমাহ'র যে বিষয়সমূহ ফুটে উঠেছে তা চিহ্নিত করে সামাজিক অনাচার সূচির জন্য উভয়ই দায়ী বলে তুমি মনে করো? বিশ্লেষণসহ তোমার মতামত দাও।

সংক্ষিঙ্গ-উত্তর প্রশ্ন

১. 'ইসলামি নৈতিকতার মূল ভিত্তি হলো তাকওয়া।' ব্যাখ্যা কর।
২. 'সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ধৰ্ম ডেকে আনে।' ব্যাখ্যা কর।
৩. শালীনতা অর্জন জরুরি কেন?
৪. 'যার মধ্যে আমানতদারিতা নেই, তার ইমান নেই।' ব্যাখ্যা কর।
৫. 'মানবসেবা মুমিনের অন্যতম গুণ।' ব্যাখ্যা কর।
৬. 'নারীদের প্রতি উত্তম ব্যবহার মুমিনের নির্দর্শন।' ব্যাখ্যা কর।
৭. কর্তব্যপরায়ণতা মানবজীবনে সফলতার হাতিয়ার কেন?
৮. ব্যয় করার ফেত্তে মধ্যপদ্ধা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় কেন?
৯. গিবত বর্জনীয় কেন?
১০. 'আর ফিতনা হত্যার চেয়ে জঘন্য।' ব্যাখ্যা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

আদর্শ জীবনচরিত (السِّيَرَةُ الْمَتَّالِيَّةُ)

আদর্শকে আরবিতে ‘উহওয়া’ (أَسْوَى) বলে। আদর্শ বলতে অনুকরণীয়, অনুসরণীয় ও গ্রহণযোগ্য চালচলন এবং রীতিনীতিকে বোঝায়। মানুষের সামগ্রিক জীবন সুন্দর ও সফল করতে মনীষীদের যেসব জীবনকর্ম অনুসরণ করা হয় তা-ই হলো জীবনাদর্শ। শেষ নবি ও রাসূল হ্যরত মুহাম্মদ (স.) হলেন আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন- *لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ*

অর্থ : অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে উন্নত আদর্শ (সূরা আল-আহ্যাব, আয়াত ২১)।

হ্যরত মুহাম্মদ (স.)- এর দেখানো পথ অনুসরণ করে যাঁরা শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন এবং তাঁদের জীবনাদর্শ দ্বারা মানবজাতিকে সঠিক পথে চলতে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছেন, তাঁদের জীবনের ভালো দিকগুলোই হলো আমাদের জন্য আদর্শ।

আদর্শ জীবনচরিতের বৈশিষ্ট্য : আদর্শ জীবনচরিতে দু'ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। যেমন, (ক) গ্রহণীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং (খ) বর্জনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

গ্রহণীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো হলো : (ক) মানুষের মাঝে সততা, বিশ্বস্ততা, উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার সমন্বয় থাকা, (খ) আত্মসংহ্যম, পরোপকারিতা, বদান্যতা, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, বিনয় ও ন্মতা থাকা এবং (গ) শৃঙ্খলা, পারম্পরিক সম্প্রীতি, নিরপেক্ষতা, ক্ষমা ও ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি গুণের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যমান থাকা।

বর্জনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- (ক) মানুষের মাঝে হিংসা, বিদ্রোহ, জিঘাংসা ও গোড়ামি থাকা; (খ) আড়ম্বরতা, ধোকাবাজি, প্রতারণা, পরিনিদা ও অসত্য থাকা এবং (গ) অসহনশীলতা, দলাদলি, সাম্প্রদায়িকতা, অন্যায়, অত্যাচার, ব্যভিচার ও বেহায়াপনাসহ অশোভন সকল খারাপ আচরণে লিঙ্গ থাকা।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- আদর্শ জীবনচরিতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব;
- প্রাক-ইসলামি যুগে আরবের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারব;
- মহানবি (স.)-এর কিশোর বয়সের সততা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার অনন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে পারব;
- মহানবি (স.)-এর যৌবনকালের সুউচ্চ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বর্ণনা করতে পারব;
- মহানবি (স.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তি ও ইসলাম প্রচার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- মহানবি (স.)-এর মাদানি জীবনের ঘটনাবলি বর্ণনা করতে পারব;
- মহানবি (স.)-এর মদিনা সনদ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বর্ণনা করতে পারব;
- মহানবি (স.)-এর বিদায় হজের ভাষণ ও ভাষণে প্রতিফলিত মানবাধিকার ও সাম্যের ধারণা, নারীর প্রতি সম্মানবোধ এবং বিশ্বাত্মক প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- মহানবি (স.)-এর মক্কা বিজয় ও ক্ষমার আদর্শ বর্ণনা করতে পারব;
- খুলাফায়ে রাশেদিনের পরিচয় ও জীবনাদর্শ বর্ণনা করতে পারব;

- খুলাফায়ে রাশেদিনের চরিত্রে প্রস্ফুটিত গুণাবলি : মানবসেবা, দানশীলতা, উদারতা, জ্ঞানচর্চা, প্রজাবাংসল্য, ন্যায়বিচার ও সুশাসন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- মুসলিম মনীষীগণের চরিত্রে প্রস্ফুটিত গুণাবলি : সমাজসেবা, সাম্য, গণতান্ত্রিক চেতনা, আত্মবোধ, সহমর্মিতা, সৌহার্দ্য, বিশ্বত্বা, ত্যাগ ও ক্ষমা, দেশপ্রেম, পরোপকারিতা ও শিক্ষাবিভাবে অবদান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ চিকিৎসা, রসায়ন, ভূগোল ও গণিত শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ ১

মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর সমকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত নবি ও রাসুলগণের মধ্যে মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে আরবের মানুষ চরম বর্বরতা ও অজ্ঞতার মাঝে ভুবে ছিল। তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল চরমভাবে অধঃগতিত। তারা অসংখ্য মূর্তি তৈরি করত এবং মূর্তির পূজা করত। গোত্রের ভিন্নতার পাশাপাশি তাদের মূর্তি ও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তারা পৰিত্র কাবাঘরে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করেছিল। কালের এই চরম অবক্ষয়ের কারণে একজন পথপ্রদর্শক হিসেবে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণ করেন। আল্লাহ তাঁর নিকট মহাগ্রহ আল-কুরআন অবতীর্ণ করেন। মহানবি (স.) মানুষকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন।

সামাজিক অবস্থা

মহানবি (স.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব সমাজের লোকেরা নবি ও রাসুল এর শিক্ষা ভুলে অসামাজিক কার্যকলাপে লিঙ্গ হয়ে পড়েছিল। তাদের আচার ব্যবহার ও চালচলন ছিল বর্বর ও মানবতাবিরোধী। তাই সে যুগকে ‘আইয়্যামে জাহিলিয়া’ বা অজ্ঞতার যুগ বলা হয়। সুষ্ঠু ও সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। মানুষের জ্ঞান, মাল, ইজতের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। নরহত্যা, রাহাজানি, খুন-খারাবি, ডাকাতি, মারামারি, কল্যা সন্তানকে জীবন্ত করার দেওয়া, জুয়াখেলা, মদ্যপান, সুদ, ঘৃষ, ব্যভিচার ছিল তখনকার অচলিত ব্যাপার। তৎকালীন সমাজে নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না। নারীদের সামাজিক জীব মনে করা হতো না; বরং দাসী হিসেবে তাদের বিক্রি করা হতো, তোগ বিলাসের বস্তু মনে করা হতো। যার বর্ণনা পৰিত্র কুরআনে সুন্পষ্টভাবে এসেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “তাদের কাউকে যখন কল্যা সন্তানের (ভূমিষ্ঠ হওয়ার) সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তাদের মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্পদায় থেকে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সন্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা খুবই নিকৃষ্ট” (সূরা আন-নাহল, আয়াত ৫৮-৫৯)।

এক কথায় অপরাধের এমন কোনো দিক ছিল না, যা তারা করত না।

সাংস্কৃতিক অবস্থা

জাহিলি যুগে আরবের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর ও অশিক্ষিত থাকলেও সাহিত্যের প্রতি তাদের খুব অনুরাগ ছিল। তাদের অনেকেই মুখে মুখে গীতিকবিতা চর্চা করত। তৎকালীন আরবে উকায় মেলা নামে বাণসরিক একটি মেলা বসত। মেলায় তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ কবিগণ তাদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করত। যেসব কবিতা সেরা বিবেচিত হতো তা সোনালি বর্ণে লিখে পবিত্র কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। আরবি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ‘আস-সাবউল মুআল্লাকাত’(সাতটি ঝুলন্ত গীতিকবিতা) জাহিলি যুগেই রচিত। কবিতা রচনার কারণে আরবরা জাহিলি যুগেই বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাদের কবিতা মানের দিক থেকে ছিল খুব উন্নত। হ্যারত ইবনে আববাস (রা.) বলেন, “যখন তোমরা আল্লাহর কিতাবের কোনো কিছু বুঝতে না পার, তবে তার অর্থ আরবদের কবিতায় তালাশ কর। কারণ কবিতা তাদের জীবনালেখ” (আল-মুফাচ্ছাল)।

এতে বোঝা যায় প্রাচীন আরবের সাংস্কৃতিক জীবনে অসংখ্য প্রবাদ-প্রবচন, নানা কিংবদন্তি ও মুখরোচক কাহিনী এবং বাণিজ্যিক প্রচলন ছিল, তবে তাদের সংস্কৃতি চর্চার প্রধান মাধ্যম ছিল কবিতা।

পাঠ ২

মহানবি হ্যারত মুহাম্মদ (স.)-এর জন্ম, শৈশব ও কৈশোর

জন্ম ও শৈশব

আরব যখন চরম জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত তখন আরবের কুরাইশ বংশে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি হ্যারত মুহাম্মদ (স.) এর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ। দাদার নাম আব্দুল মুতালিব। মাতার নাম আমিনা। নানার নাম ওয়াহাব। জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা ইস্তিকাল করেন। দাদা আব্দুল মুতালিব তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মদ। আর তাঁর মাতা নাম রাখেন আহমাদ।

জন্মের পর মহানবি হ্যারত মুহাম্মদ (স.) ধাত্রী মা হালিমার ঘরে লালিত-পালিত হন। হালিমা বনু সাদ গোত্রের লোক ছিলেন। আর বনু সাদ গোত্র বিশুদ্ধ আরবিতে কথা বলত। ফলে মহানবি হ্যারত মুহাম্মদ (স.) ও বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় কথা বলতেন। শৈশবকাল থেকে মহানবি হ্যারত মুহাম্মদ (স.)-এর মাঝে ন্যায় ও ইনসাফের নজির দেখা যায়। তিনি ধাত্রী হালিমার একটি স্তন পান করতেন অন্যটি তাঁর দুখভাই আব্দুল্লাহর জন্য রেখে দিতেন।

হালিমা মহানবি হ্যারত মুহাম্মদ (স.)-কে পাঁচ বছর লালন-পালন করে তাঁর মা আমিনার নিকট রেখে যান। তাঁর বয়স যখন ছয় বছর তখন তাঁর মাতা ইস্তিকাল করেন। প্রিয়নবি (স.) অসহায় হয়ে পড়লে তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব নেন দাদা আব্দুল মুতালিব। আর আট বছর বয়সে তাঁর দাদা ও মারা যান। এরপর লালন-পালনের দায়িত্ব নেন চাচা আবু তালিব।

কৈশোর

চাচা আবু তালিব অত্যন্ত আদর স্নেহ দিয়ে হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-কে লালন-পালন করতে থাকেন। আবু তালিবের আর্থিক অবস্থা ছিল অসচ্ছল। হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এ অবস্থা অবলোকন করে চাচার সহযোগিতায় কাজ করা শুরু করেন। তিনি মেষ চরাতেন। মেষপালক রাখাল বালকদের জন্য তিনি ছিলেন উন্নত আদর্শ। তাদের সাথে তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতেন। কখনোই তাদের সাথে কলহ বা ঝাগড়া-বিবাদ করতেন না। তিনি ১২ বছর বয়সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে চাচার সঙ্গে সিরিয়া যান। যাত্রাপথে ‘বুহায়রা’ নামক এক পাদ্রির সাথে দেখা হলে বুহায়রা মুহাম্মদকে অসাধারণ বালক বলে উল্লেখ করেন এবং ভবিষ্যত্বাণী করে বলেন যে, ‘এ বালকই হবে আর্থের নবি (শেষ নবি)।’

শৈশবকাল থেকেই মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সত্যবাদী ও শান্তিকামী। সিরিয়া থেকে ফিরে এসে তিনি ফিজার যুদ্ধের বিভীষিকা দেখলেন। যুদ্ধটি শুরু হলো নিষিদ্ধ মাসে। তাছাড়া কায়স গোত্র অন্যায়ভাবে কুরাইশদের উপর এ যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল। এ জন্য একে ‘হারবুল ফিজার’ বা অন্যায় যুদ্ধ বলা হয়। পাঁচ বছর যাবৎ এ যুদ্ধ স্থায়ী হয়। হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এ যুদ্ধে সত্ত্বিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেননি। তবে যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ যুদ্ধে বহু মানুষ আহত ও নিহত হয়। তাতে তাঁর কোমল হৃদয় কেঁদে ওঠে। আহতদের আর্তনাদ শুনে তিনি অস্ত্রি হয়ে পড়লেন। শান্তিকামী মানুষ হিসেবে এ অশান্তি তাঁর সহ্য হলো না। তাই তিনি আরবের শান্তিকামী যুবকদের নিয়ে ‘হিলফুল ফুয়ুল’ (শান্তি সংঘ) গঠন করলেন। এই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল আর্তের সেবা, অত্যাচারীকে প্রতিরোধ ও অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং গোত্রে শান্তি, সম্প্রীতি বজায় রাখা। বর্তমান আধুনিক বিশ্বের জাতিসংঘ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শান্তিসংঘ হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর ঐ হিলফুল ফুয়ুলের কাছে অনেকাংশে ঝাগী। তারাও হিলফুল ফুয়ুলের মতো যুদ্ধ বন্ধ করে সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট।

মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর চারিত্রিক গুণবলি—আমানতদারি, সত্যবাদিতা, ন্যায়নির্ণয় ও দায়িত্বশীলতার কারণে তৎকালীন আরবের লোকজন তাঁকে আল-আমিন (বিশ্বাসী) উপাধি দিয়েছিল। নবৃত্য প্রাপ্তির পর যারা তাঁকে অঙ্গীকার করেছিল তারাও তাঁকে মিথ্যবাদী বলতে পারেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শৈশব-কৈশোর থেকে শিক্ষণীয় বিষয়ের একটি
তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৩

হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর যৌবনকাল, নবৃত্য প্রাপ্তি ও ইসলাম প্রচার

যৌবনকাল

যুবক মুহাম্মদ (স.)-এর সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও চারিত্রিক গুণবলির সংবাদ মকার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তখনকার আরবের শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী বিদূষী ও বিধবা মহিলা হ্যরত খাদিজা (রা.) তাঁর ব্যবসার দায়িত্ব হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর অর্পণ করেন। হ্যরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর ব্যবসায়িক কাজে সিরিয়া যান। তিনি এ ব্যবসায় আশাতীত লাভবান হয়ে দেশে ফিরে আসেন। যৌবনকালে খাদিজা (রা.)-এর ব্যবসায় হ্যরত মুহাম্মদ (স.) যে দায়িত্বশীলতা ও সততার পরিচয় দিয়েছিলেন তা সর্বকালে সকল ব্যবসায়ী যুবকের

জন্য আদর্শ। খাদিজা হয়েরত মুহাম্মদ (স.)-এর গুণাবলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী 'মাইসারা'কে মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে সিরিয়া পাঠান। মাইসারা সিরিয়া থেকে ফিরে এসে হয়েরত মুহাম্মদ (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলির বর্ণনা খাদিজা (রা.)-কে দেন। তাতে মুঝ হয়ে খাদিজা নিজেই হয়েরত মুহাম্মদ (স.)-এর নিকট তাঁর বিবাহের প্রস্তাৱ পাঠান। চাচা আবু তালিবের অনুমতি নিয়ে হয়েরত মুহাম্মদ (স.) খাদিজাকে বিবাহ করেন। এ সময় হয়েরত মুহাম্মদ (স.)-এর বয়স ছিল পঁচিশ বছর। আর খাদিজা (রা.)-এর বয়স ছিল চাল্লিশ বছর। বিবাহের পর খাদিজার আন্তরিকতায় ও সৌজন্যে হয়েরত মুহাম্মদ (স.) প্রচুর সম্পদের মালিক হন। কিন্তু হয়েরত মুহাম্মদ (স.) এ সম্পদ নিজের ভোগ-বিলাসে ব্যয় না করে অসহায়, দুঃখী, পীড়িত ও গরিব-মিসকিনদের সেবায় ব্যয় করেন।

আজকের সমাজে আমরা যদি মহানবি হয়েরত মুহাম্মদ (স.)-এর ন্যায় আর্তমানবতার সেবায় সম্পদ ব্যয় করি, তাহলে সমাজের দুঃস্থ, অসহায় ও গরিব-দুঃখীদের কষ্ট লাঘব হবে, সমাজে শান্তি বিরাজ করবে।

মহানবি হয়েরত মুহাম্মদ (স.)-এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর তখন কাবা শরিফ পুনর্নির্মাণ করা হয়। হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) স্থাপন নিয়ে আরবের বিভিন্ন গোত্রে বিরোধ দেখা দেয়। সবাই হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের গৌরব অর্জন করতে চায়। তাতে কেউ ছাড় দিতে রাজি নয়। ফলে গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হয়। অতঃপর সকলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, পরের দিন সর্বথথম যে ব্যক্তি কাবা ঘরে প্রবেশ করবে তার ফয়সালা মেনে নেওয়া হবে। দেখা গেল পরের দিন সকলের আগে হয়েরত মুহাম্মদ (স.) কাবা ঘরে প্রবেশ করলেন। সবাই এক বাক্যে বলে উঠল, এই এসেছেন আল-আমিন, আমরা তাঁর প্রতি আহ্মাদীল ও সন্তুষ্ট। হয়েরত মুহাম্মদ (স.) অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও নিরপেক্ষতার সাথে যে ফয়সালা দিলেন, সকলে তা নির্বিধায় মেনে নিল। ফলে তারা অনিবার্য রক্তপাত থেকে মুক্তি পেল। এভাবে বর্তমান সময়েও বিচক্ষণতা ও নিরপেক্ষতার সাথে বিচারকার্য পরিচালনা করলে দেশে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। জাতি অনেক অনিবার্য দুর্দ-সংঘাত ও রক্তপাত থেকে মুক্তি পাবে।

নবুয়ত প্রাণ্তি

হয়েরত খাদিজা (রা.)-এর সাথে বিবাহের পর হয়েরত মুহাম্মদ (স.) মৰ্কার অদূরে হেরা পর্বতের গুহায় গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। দীর্ঘদিন ধ্যানে মগ্ন থাকার পর ৪০ বছর বয়সে ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র রম্যান মাসের কদরের গ্রাতে হয়েরত জিবরাইল (আ.) তাঁর নিকট ওহি নিয়ে আসেন এবং তিনি নবুয়ত প্রাণ্তি হন। জিবরাইল (আ.) বললেন,

إِنَّ رَبَّكَ الَّذِي خَلَقَ

অর্থ : পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন (সুরা আল-আলাক, আয়াত ১)।

উভয়ে মহানবি হয়েরত মুহাম্মদ (স.) বললেন, আমি পড়তে জানি না। জিবরাইল (আ.) তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, পড়ুন! তিনি বললেন, আমি পড়তে জানি না। এভাবে তিনবার প্রিয়নবি (স.)-কে জড়িয়ে ধরলেন। অতঃপর তৃতীয়বারের সময় তিনি পড়তে সক্ষম হলেন। বাড়ি ফিরে হয়েরত মুহাম্মদ (স.) হয়েরত খাদিজা (রা.)-এর নিকট সব ঘটনা খুলে বললেন এবং জীবনের আশংকা করলেন। তখন হয়েরত খাদিজা (রা.) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন- না, কথনো না। আল্লাহর শপথ! তিনি আপনাকে কথনো অপদৃষ্ট করবেন না। কারণ আপনি আত্মায়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, দুঃস্থ ও দুর্বলদের থাকা-যাওয়ার ব্যবস্থা করেন, নিঃস্ব ও অভিবীদের

উপর্যুক্ত করেন। মেহমানদের সেবায়ত্ত করেন এবং প্রাকৃতিক দুর্ঘোগে (লোকদের) সাহায্য করেন।

এতে বোঝা যায় যে, নবৃত্তির প্রাণ্তির পূর্বেও হযরত মুহাম্মদ (স.) কী রকম আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে মানবিক মহৎ গুণবলি অনুশীলন করতেন এবং মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। আমাদের উচিত বাস্তবজীবনে মহানবি (স.)-এর এসব আদর্শ অনুশীলন করা।

ইসলাম প্রচার

নবৃত্তির পর মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বিপথগামী মঙ্গাবাসীর নিকট ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল। তিনি আরও ঘোষণা করেন, ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম, আল-কুরআন এ ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ। আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, নিয়ামক এবং সবকিছুর মালিক। তিনি সকল সৃষ্টির জীবন ও মৃত্যুদানকারী।

প্রথম তিনি বছর তিনি গোপনে তাঁর আত্মিয়স্বজনকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। পরে আল্লাহর নির্দেশে প্রকাশ্যে ইসলামের পথে দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন। এতে মৃত্তি পূজারিয়া তাঁর বিরোধিতা করতে শুরু করল। নবিকে তারা ধর্মদ্রোহী, পাগল বলে ঠাট্টা করতে লাগল। তারা তাঁর উপর শারীরিক, মানসিক নির্যাতন চালাল, পাথর ছুড়ে আঘাত করল, আবর্জনা নিক্ষেপ করল, অপমানিত ও লাঞ্ছিত করল। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে নেতৃত্ব, ধন-সম্পদ ও সুন্দর নারীর লোভ দেখাল। তিনি বললেন, আমার এক হাতে চন্দ্র আর অন্য হাতে সূর্য এনে দিলেও আমি এস্ত প্রচার করা থেকে বিরত হব না। স্ত্য প্রচারে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) যে আত্ম্যাগ, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন তা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদেরও স্ত্য ও ন্যায়ের পথে আত্ম্যাগী, দৃঢ়সংযোগী, ধৈর্যশীল ও কষ্ট-সহিষ্ণু হওয়া উচিত।

পাঠ ৪

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মাদানি জীবন

মকার কাফিররা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে ইসলাম প্রচার থেকে বিরত রাখতে না পেরে তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে হযরত মুহাম্মদ (স.) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরত করলেন। মকার তুলনায় মদিনায় শাস্তি ও নির্মল পরিবেশে এসে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) গুরুত্বপূর্ণ অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করলেন, আওস ও খায়রাজ গোত্রদ্বয়ের মাঝে চলমান দীর্ঘ দিনের যুদ্ধ বন্ধ করলেন। মুহাজির (ইসলামের উদ্দেশ্যে মঙ্গা থেকে মদিনায় হিজরতকারী) ও আনসারদের (মুহাজিরদেরকে সার্বিকভাবে সাহায্যকারী মদিনাবাসী) মাঝে ভাতৃত্ব বন্ধন ও সৌহার্দ্য স্থাপন করলেন। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হলো। গড়ে তুললেন ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা। সকল মুসলিমের মিলনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুললেন মসজিদে নববি।

মদিনা সনদ

মদিনা ছিল বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের লোকজনের আবাস। হয়রত মুহাম্মদ (স.) এই সকল জাতিকে এক করে সেখানে একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা নিলেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি সকল গোত্রের নেতাদের সাথে বৈঠক করে একটি লিখিত সনদ প্রণয়ন করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে ‘মদিনা সনদ’ নামে খ্যাত। এই সনদে মোট ৪৭টি ধারা ছিল। তার মধ্যে প্রধান ধারাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

১. সনদে স্বাক্ষরকারী মুসলমান, ইহুদি ও পৌত্রিক সম্প্রদায়সমূহ সমানভাবে নাগরিক অধিকার ভোগ করবে।
২. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) হবেন প্রজাতন্ত্রের প্রধান এবং সর্বোচ্চ বিচারালয়ের কর্তা।
৩. মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে।
৪. কেউ কুরাইশ বা অন্য কোনো বহিঃশক্তির সাথে মদিনাবাসীর বিরুদ্ধে কোনোরূপ ঘড়্যব্রহ্মে লিঙ্গ হতে পারবে না।
৫. স্বাক্ষরকারী কোনো সম্প্রদায় বহিঃশক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হলে সকল সম্প্রদায়ের সমবেত প্রচেষ্টায় তা প্রতিহত করা হবে।
৬. বহিঃশক্তি কর্তৃক মদিনা আক্রান্ত হলে সকলে সম্মিলিতভাবে শক্তির মোকাবিলা করবে এবং প্রত্যেকে স্ব-স্ব গোত্রের যুদ্ধভার বহন করবে।
৭. কোনো ব্যক্তি অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হবে। তার অপরাধের জন্য গোটা সম্প্রদায়কে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না।
৮. মদিনা পরিত্র নগরী বলে ঘোষণা করা হলো। এখন থেকে এই শহরে রাজপাত, হত্যা, ব্যক্তিচার এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলো।
৯. ইহুদি সম্প্রদায়ের মিত্রাও সমান স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা ভোগ করবে।
১০. হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর অনুমতি ব্যতীত মদিনার কোনো গোত্র কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।
১১. স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে কখনো বিরোধ দেখা দিলে হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তা মীমাংসা করবেন।
১২. সনদের ধারা ভঙ্গকারীর উপর আল্লাহর অভিসম্প্রাপ্ত বর্ষিত হবে।

এই মদিনা সনদ হলো মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান, যার মাধ্যমে ইসলাম ও মহানবি (স.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠেছে।

আমাদের উচিত রাষ্ট্রের কল্যাণে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করে সুন্দর সমৃদ্ধ গণপ্রজাতাত্ত্বিক রাষ্ট্র গঠন করা।

কাজ : শিক্ষার্থীরা জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করে মদিনা সনদের প্রধান ধারাগুলো খাতায় লিখবে এবং শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৫

হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর মক্কা বিজয় ও বিদায় হজ

মক্কা বিজয়

অনুকূল পরিবেশ পাওয়ায় মদিনায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার খুব দ্রুত ঘটতে লাগল। ষষ্ঠি হিজরিতে মক্কার কুরাইশরা মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) ও মুসলমানদের সাথে ছদ্যবিয়ার সঙ্গি করে। কুরাইশরা সঙ্গির শর্ত ভঙ্গ করলে রাসুল (স.) ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে ১০০০০ (দশ হাজার) মুসলিম নিয়ে মক্কা অভিযান পরিচালনা করেন। মক্কার আদৃতে হ্যরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর স্থাপন করেন। কুরাইশরা মুসলিমদের এই বাহিনী দেখে ভীত সন্তুষ্ট হলো। তারা কোনো প্রকার বাধা দেওয়ার সাহস করল না। বিনা রক্তপাতে ও বিনা বাধায় মুসলিম বাহিনী মক্কা বিজয় করল। মক্কা বিজয়ের পর মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। বললেন—

لَا تُنْهِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اذْهَبُوْ فَإِنْتُمُ الْظَّلَقَاءُ

অর্থ : আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই, যাও তোমরা মুক্ত ও স্বাধীন।

সে সময়ে তিনি ইসলামের চরম শক্তি আবু সুফিয়ানসহ সকলকে হাতের নাগালে পেয়েও যেভাবে ক্ষমা করে দিয়েছেন মানবতার ইতিহাসে তা বিরল। ভুল বুঝতে পারার পর আমাদের শক্তিরা অনুত্তম হলে আমরাও তাদের বিনা শর্তে ক্ষমা করে দেব। ক্ষমা একটি মহৎ গুণ।

বিদায় হজ ও এর ভাষণ

মক্কা বিজয়ের পর দলে দলে গোক ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। আরবের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইসলাম পৌছে গেল। হ্যরত মুহাম্মদ (স.) বুঝলেন আর বেশিদিন পৃথিবীতে তাঁর থাকা হবে না। তাই তিনি ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে (দশম হিজরিতে) হজ করার ইচ্ছা করলেন। এ উদ্দেশ্যে উভ সালের যিলকদ মাসে লক্ষ্মাধিক সাহাবি নিয়ে হজ করতে গেলেন, যা বিদায় হজ নামে পরিচিত। এ হজে রাসুল (স.)-এর সহধর্মীগণও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। যুল হুলাইফা নামক স্থানে এসে সকলে ইহরাম (হজের পোশাক) বেঁধে বাইতুল্লাহর উদ্দেশে রওনা হন। জিলহজ মাসের নবম তারিখে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত জনসমুদ্রের উদ্দেশে মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এক যুগান্তকারী ভাষণ দেন। এ ভাষণে বিশ্ব মানবতার সকল কিছুর দিকনির্দেশনা ছিল। আরাফাতের ময়দানের পার্শ্বে ‘জাবালে রহমত’ নামক পাহাড়ে উঠে মহানবি (স.) প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেন—

১. হে মানব সকল! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। কারণ আগামী বছর আমি তোমাদের সাথে এখানে সমবেত হতে পারব কিনা জানি না।
২. আজকের এ দিন, এ স্থান, এ মাস যেমন পবিত্র, তেমনই তোমাদের জীবন ও সম্পদ পরম্পরের নিকট পবিত্র।

৩. মনে রাখবে অবশ্যই একদিন সকলকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে। সেদিন সকলকে নিজ নিজ কাজের হিসাব দিতে হবে।
৪. হে বিশ্বাসীগণ! দ্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে। তাদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে তেমনই তোমাদের উপরও তাদের অধিকার রয়েছে।
৫. সর্বদা অন্যের আমানত রক্ষা করবে এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে ও সুন্দ খাবে না।
৬. আল্লাহর সাথে কাউকে শর্করিক করবে না। আর অন্যায়ভাবে একে অন্যকে হত্যা করবে না।
৭. মনে রেখ! দেশ, বর্গ-গোত্র, সম্পদায় নির্বিশেষে সকল মুসলমান সমান। আজ থেকে বংশগত শ্রেষ্ঠত্ব বিলুপ্ত হলো। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাটি হলো আল্লাহভীতি ও সৎকর্ম। সে ব্যক্তিই সবচেয়ে সেরা, যে নিজের সৎকর্ম দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।
৮. ধর্ম নিয়ে বাড়াবাঢ়ি করো না; পূর্বের অনেক জাতি এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে। নিজ যোগ্যতা বলে ত্রীতদাস যদি নেতো হয় তার অবাধ্য হবে না। বরং তার আনুগত্য করবে।
৯. দাস-দাসীদের প্রতি সম্মত ব্যবহার করবে। তোমরা যা আহার করবে ও পরিধান করবে তাদেরকেও তা আহার করাবে ও পরিধান করাবে। তারা যদি কোনো অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলে, তবে তাদের মৃত্যু করে দেবে, তবুও তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে না। কেননা তারাও তোমাদের মতোই মানুষ, আল্লাহর সৃষ্টি। সকল মুসলিম একে অন্যের ভাই এবং তোমরা একই ভাতৃত্বের বক্তনে আবদ্ধ।
১০. জাহিলি যুগের সকল কুসৎকার ও হত্যার প্রতিশোধ বাতিল করা হলো। তোমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর বাণী এবং তার রাসূলের আদর্শ রেখে যাচ্ছি। এগুলো যতদিন তোমরা আঁকড়ে থাকবে ততদিন তোমরা বিপথগামী হবে না।
১১. আমিই শেষ নবি। আমার পর কোনো নবি আসবে না।
১২. তোমরা যারা উপস্থিত আছ তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার বাণী পৌছে দেবে।

তারপর হ্যরত মুহাম্মদ (স.) আকাশের দিকে তাকিয়ে আওয়াজ করে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমি কি তোমার বাণী সঠিকভাবে জনগণের নিকট পৌছাতে পেরেছি? সাথে সাথে উপস্থিত জনসমূহ থেকে আওয়াজ এলো, হ্যাঁ। নিশ্চয়ই পেরেছেন। অতঃপর হ্যরত মুহাম্মদ (স.) বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। এরপরই আল্লাহ তায়ালা নাজিল করলেন—

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَكْمَلْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينًا ۚ

অর্থ : আজ আমি তোমাদের দীন (জীবনবিধান)-কে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম ও আমার নিয়ামত তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৩)।

মহানবি (স.) কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। উপস্থিত জনতাও নীরব থাকল। অতঃপর সকলের দিকে করণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, ‘আল-বিদা’ (বিদায়)। একটো অজ্ঞান বিঘোগ-ব্যথা উপস্থিত সকলের

অন্তরকে ভারাক্রান্ত করে তুলল ।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর ভাষণের মাধ্যমে যে দিকনির্দেশনা তুলে ধরেছিলেন বাস্তব জীবনে তিনি তা অনুশীলন করেছেন । আমরাও আমাদের ভাষণে বা বক্তব্যে যা বলব বাস্তব জীবনে তা অনুশীলন করব । তাহলে আমাদের দেশ ও জাতি আরও সুন্দর, সমৃদ্ধ ও উন্নত হবে ।

কাজ : ‘সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় মদিনা সনদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে’—শিক্ষার্থীরা এ উকিল সমর্থনে
দশটি বাক্য লিখবে ।

খুলাফায়ে রাশেদিনের জীবনাদর্শ

খুলাফায়ে রাশেদিন অর্থ ‘সঠিক পথ নির্দেশপ্রাপ্ত খলিফাগণ’। এর দ্বারা ইসলামের প্রথম চারজন খলিফাকে বোঝায় । তাঁরা হলেন- হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলি (রা.) । তাঁরা সকলেই মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) থেকে সরাসরি ইসলামের শিক্ষা প্রাপ্ত করেছেন । বাস্তব জীবনে তা যথাযথভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করেছেন । তাই তাঁদের জীবনকর্ম আমাদের আদর্শ ।

পাঠ ৬ হযরত আবু বকর (রা.)

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মকার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের তায়িম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর নাম আবুলুল্লাহ এবং তাঁর উপাধি সিদ্দিক ও আতিক । ছোটকাল থেকেই মহানবি (স.)-এর সাথে তাঁর ছিল গভীর বন্ধুত্ব । বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম করুল করেন । সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে সর্বদা তিনি মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে থাকতেন ।

তাঁর যুদ্ধের সময় তিনি তাঁর সমুদয় সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেন । সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় এরপ সর্বস্ব ব্যয়ের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল ।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি হযরত আবু বকর (রা.)-এর ছিল অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা । তিনি রাসুলুল্লাহ (স.)-এর মুখে মি'রাজের ঘটনা শোনামাত্র নিঃসন্দেহে তা বিশ্বাস করেন । তাই তাঁকে সিদ্দিক (মহাসত্যবাদী) উপাধি দেওয়া হয়েছিল ।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইস্তিকালের পর খলিফা নির্বাচন, রাসুলুল্লাহ (স.)-এর ওফাতের পর দাফন ও রাসুলের উত্তরাধিকারীর বিষয়ে তাঁর থেকে বর্ণিত হাদিস দ্বারা সমাধা হয় । ফলে মুসলমানগণ এক অবশ্যিক্তবী বিশ্বজ্ঞালা থেকে রক্ষা পান । খলিফা নির্বাচিত হয়ে তিনি জনতার উদ্দেশে বললেন, “যতদিন আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.)-এর অনুসরণ করি ততদিন তোমরা আমার অনুসরণ করবে এবং আমাকে সাহায্য করবে । আর ভুল পথে চললে তোমরা আমাকে সাথে সাথে সংশোধন করে দেবে । তোমাদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদের হক আদায় না করা পর্যন্ত তারা আমার নিকট শক্তিশালী । আর যারা সবল তাদের নিকট থেকে পাওনাদারের হক আদায় না করা পর্যন্ত তারা আমার নিকট দুর্বল ।”

হয়েরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর শাসন সর্বকালের শাসকদের জন্য আদর্শ। মহানবি হয়েরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইতিকালের পর মুসলিম রাষ্ট্র কতিপয় সমস্যা দেখা দেয়। কেউ কেউ মিথ্যা নবুয়াতের দাবি করে, কতিপয় লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করে, আবার কতিপয় লোক ইসলাম ত্যাগ করে। হয়েরত আবু বকর (রা.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এসব মোকাবিলা করেন, ইসলাম ও মুসলমানদের বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করেন। আমাদেরও উচিত হয়েরত আবু বকর (রা.)-এর মতো অত্যন্ত দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার সাথে শাসনকাজ পরিচালনা করে দেশ ও জাতিকে বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রক্ষা করা।

আল-কুরআন সংরক্ষণ

ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের অনেক হাফিয় শাহাদাতবরণ করেন। এতে কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দিলে তিনি পৰিব্রত কুরআনকে একত্র করে গ্রহাকারে প্রকাশ করেন। এসব যুগান্তকারী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করার কারণে তাঁকে ইসলামের ‘ত্রাণকর্তা’ বলা হয়।

খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পরও হয়েরত আবু বকর (রা.) ব্যবসা করতেন। নিজ হাতের উপার্জন খেতেন। পরবর্তীতে মুসলমানদের দাবির মুখে তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সামান্যমাত্র ভাতা নিতেন। মুসলিম জাহানের খলিফা হয়েও হয়েরত আবু বকর (রা.) রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যয় করার ফেরে যে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, তা সকল রাজা-বাদশাহ ও রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ।

কাজ : শিক্ষার্থীরা হয়েরত আবু বকর (রা.)-এর উন্নম চরিত্র সম্পর্কে একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৭

হয়েরত উমর (রা.)

মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা হয়েরত উমর ফারুক (রা.) ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে আরবের মক্কা নগরীতে কুরাইশ বংশের আদি গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খাত্বাব। মাতার নাম হানতামা। তিনি ছিলেন শিক্ষিত, মার্জিত ও সৎ চরিত্রের অধিকারী। যুবক বয়সে নামকরা কুন্তিগির, সাহসী যৌদ্ধা, কবি ও সুবজ্ঞা ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ

হয়েরত উমর ফারুক (রা.) প্রথম দিকে ইসলামের ঘোর শক্তি ছিলেন। একদা মহানবি হয়েরত মুহাম্মদ (স.)-কে হত্যার জন্য তিনি খোলা তরবারি হাতে নিয়ে বের হলেন। পথে শুলনেন যে, তাঁর বোন ফাতিমা ও ভগ্নিপতি সাদেদ মুসলমান হয়ে গেছেন। তিনি তাঁদের হত্যা করার জন্য তাঁদের বাড়ি যান। তাঁদের উপর অনেক অত্যাচার চালান। তাঁদের ইসলাম ত্যাগ করতে বলেন, কিন্তু তাঁরা প্রাণের বিনিময়েও ইসলাম ত্যাগ করতে চাইলেন না। তাঁদের অনড় অবস্থা দেখে তাঁর ভাবান্তর ঘটে। তিনি তাঁদের মাধ্যমে কুরআন মজিদের সূরা ত্বকার কিছু আয়াত শ্রবণ করেন। কুরআনের বাণী তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। তিনি ইমান আনার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তিনি মহানবি হয়েরত মুহাম্মদ (স.)-এর দরবারে গিয়ে নিজের তরবারিটি মহানবি (স.)-এর পায়ের কাছে রেখে মুসলমান হয়ে গেলেন। হয়েরত উমর ফারুক (রা.) মহানবি (স.)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনি যে দাওয়াত দিচ্ছেন

তা কি সত্য? মহানবি (স.) বললেন, হ্যাঁ। তখন হ্যরত উমর (রা.) বললেন- তাহলে আর গোপন নয়, এখন থেকে আমরা প্রকাশ্যে কাবাথরের সামনে সলাত আদায় করব। মহানবি অত্যন্ত খুশি হয়ে তাঁকে 'ফারুক' (সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকরী) উপাধি দিলেন। তিনি নবুয়তের ষষ্ঠ বছরে ৩৩ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হ্যরত উমর ফারুক (রা.) ইসলামের জন্য নির্বিদিতপ্রাণ ছিলেন। তিনি ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য স্বীয় ধন-সম্পদ অকাতরে ব্যয় করেন। তাবুক অভিযানে হ্যরত উমর ফারুক (রা.) তাঁর সমুদয় সম্পদের অর্দেক আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন। হ্যরত উমর ফারুক (রা.)-এর ন্যায় সাহসী হয়ে আমরাও সত্য পথে চলব ও সত্য কথা বলব।

ন্যায় বিচারক

হ্যরত উমর ফারুক (রা.) ছিলেন ন্যায় ও ইনসাফের এক মৃত্ত প্রতীক। আইনের চোখে তিনি ধনী-গরিব, উচ্চ-নিচু, আপন-পরের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করতেন না। মদ্যপানের অপরাধে স্বীয় পুত্র আবু শাহমাকে তিনি অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। হ্যরত উমর (রা.) ছিলেন উদারমন্বা। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং তাঁদের মতামতের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন।

চরিত্র

হ্যরত উমর ফারুক (রা.) ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর মানবীয় গুণটি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠে। তিনি সত্য ও অসত্যের বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ থাকতেন। তিনি রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীর খৌজ-খবর রাখার জন্য পুলিশ বিভাগ ও গোয়েন্দা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। সেনাবাহিনীকে সুশৃঙ্খল করার জন্য প্রতি চার মাস পর বাধ্যতামূলক ছুটির ব্যবস্থা করেন। কৃষি কাজের উন্নয়নে খাল খননের ব্যবস্থা করেন। জনসাধারণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য তিনি রাতের অন্ধকারে পাড়া-মহল্লায় ঘুরে বেড়াতেন। ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে নিজ কাঁধে করে আটার বস্তা নিয়ে তিনি তাঁবুতে দিয়ে আসেন। স্বীয় স্ত্রী উন্মে কুলসুমকে, প্রসব বেদনায় কাতর এক বেদুইনের স্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য তার ঘরে নিয়ে যান। পৃথিবীর রাজা বাদশাহদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এমন প্রজাবৎসল শাসক আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মানব দরদি হ্যরত উমর ফারুক (রা.) ছিলেন সাম্য জবাবদিহিতা ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ। একদা এক লোক স্বয়ং তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, বাইতুলমাল থেকে থাণ্ড কাপড় দিয়ে কারও পুরো একটি জামা হয়নি। অর্থাৎ খলিফার গায়ে সে কাপড়ের একটি পুরো জামা দেখা যাচ্ছে। খলিফা অতিরিক্ত কাপড় কোথায় পেলেন? খলিফার পক্ষ থেকে তাঁর পুত্র আবুল্লাহ (রা.) উভর দিলেন যে, আমি আমার অংশটুকু আমার আববাকে দিয়ে দিয়েছি, এতে তাঁর পুরো জামা হয়েছে।

আমাদের দেশেও যদি শাসনকার্যে জবাবদিহি নিশ্চিত করা যায় তাহলে আমাদের শাসনকাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণও হ্যরত উমরের মতো ন্যায়পরায়ণ হবেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা হ্যরত উমর (রা.)-এর সাম্য, মানবতাবোধ ও জবাবদিহিতার আদর্শ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।

পাঠ ৮

হ্যরত উসমান (রা.)

মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলিফা ছিলেন হ্যরত উসমান (রা.)। তিনি ৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও লজ্জাশীল ছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষায়ও ছিলেন স্বনামধন্য। মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর দু'কন্যা রুক্মাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে (একজনের মৃত্যুর পর আরেকজনকে) তাঁর সাথে বিবাহ দেন। এ কারণে তাঁকে যুন্নুরাইন (দুই জ্যোতির অধিকারী) বলা হয়।

তিনি ৩৪ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাঁর চাচা হাকাম তাঁকে নানা রকম নির্যাতন করে। সব নির্যাতন তিনি সহ্য করেন। আত্মীয়দের নির্যাতন অসহ্য পর্যায়ে পৌছালে তিনি মহানবি (স.)-এর কন্যা ও স্তৰ সহধর্মিণী রুক্মাইয়াকে নিয়ে আবিসন্নিয়ায় হিজরত করেন।

ইসলামের খেদমত

হ্যরত উসমান (রা.) ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী। ব্যবসা করে এসব ধন-সম্পদ অর্জন করেন। যার কারণে তাঁকে গনি (ধনী) বলা হতো। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলাম ও মানবতার সেবায় অকাতরে তাঁর সম্পদ ব্যয় করেন। মদিনার অধিবাসীদের পানির অভাব দূর করার জন্য তিনি ১৮০০০ (আঠার হাজার) দিনার (স্বর্গমুদ্রা) ব্যয় করে একটি কৃপ ক্রয় করে তা ওয়াক্ফ করে দেন। মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি মদিনাবাসীদের মাঝে আগ হিসেবে খাবার বিতরণ করেন। মসজিদে নববিতে মুসলিমদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত খরচে মসজিদ সম্প্রসারণ করেন। তারুক যুদ্ধের ৩০০০০ (ত্রিশ হাজার) সৈন্যের এক তৃতীয়াংশ তথা দশ হাজার সৈন্যের ব্যয়ভার তিনি গ্রহণ করেন। রোমান বাহিনীর বিরুক্তে পরিচালিত এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে শক্তিশালী করতে তিনি একাই এক হাজার উট দান করেন। এ ছাড়াও তিনি সাতটি ঘোড়া ও এক হাজার দিনার মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর দরবারে দান করেন।

হ্যরত উসমান (রা.)-কে আল্লাহ যেমন প্রচুর সম্পদ দান করেছেন তেমনি তিনি তা অকাতরে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সর্বকালের সম্পদশালী লোকদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ।

কুরআন সংকলন

আরবের বিভিন্ন এলাকার লোকজন বিভিন্ন উপভাষায় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করত। হ্যরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের আরও বিস্তৃতি ঘটে। এতে কুরআন তিলাওয়াত নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভাস্তি সৃষ্টি হয়। ফলে মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। হ্যরত উসমান (রা.) এ অবস্থার গুরুত্ব উপলক্ষ্য করে তৃরিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি উম্মুল মু'মিনিন হ্যরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত পবিত্র কুরআনের মূল কপি সংগ্রহ করেন। হ্যরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.)-কে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করে দেন। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.), হ্যরত সাইদ ইবনে আল-আস (রা.) ও হ্যরত আব্দুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে

হিশাম (রা.)। হিজরি ৩০ মোতাবেক ৬৫১ খ্রি. তাঁরা হযরত হাফসা (রা.) থেকে সংগৃহীত কপির আলোকে আরও ৭টি কপি তৈরি করেন এবং তা মুসলিম সান্ত্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। একে ‘মাসহাফে উসমান’ বলা হয়। ফলে সারাবিশ্বে একটি রীতিতে কুরআন তিলাওয়াত আরম্ভ হয়। এজন্য তাঁকে ‘জামিউল কুরআন’ (কুরআন একত্রকারী বা কুরআন সংকলক) বলা হয়। বিশেষ বর্তমানে প্রচলিত কপিগুলোও মাসহাফে উসমানির প্রতিলিপি।

কাজ : শিক্ষার্থীরা হযরত উসমান (রা.)-এর জীবনাদর্শ বাস্তব জীবনে অনুশীলনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপের একটি পরিকল্পনা তৈরি করবে।

পাঠ ৯

হযরত আলি (রা.)

হযরত আলি (রা.) ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা। তিনি ৬০০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশের বনু হাশিম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর চাচা আবু তালিবের পুত্র ছিলেন। তাঁর ডাকনাম ছিল আবু তোরাব ও আবুল হাসান। বাল্যকাল থেকেই তিনি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে থাকতেন। মহানবি (স.)-এর প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। তাই দশ বছর বয়সেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। বালকদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবি।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) হিজরত করে মদিনা যাওয়ার সময় হযরত আলি (রা.)-কে আমানতের মালের দায়িত্ব দিয়ে তাঁর বিছানায় রেখে যান। জীবনের কঠিন ঝুঁকি সত্ত্বেও তিনি এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। মহানবি (স.)-এর দেওয়া দায়িত্বের চেয়ে তিনি তাঁর জীবনের মূল্য তুচ্ছ মনে করেছেন। দায়িত্ব পালনই ছিল তাঁর কাছে বড় ব্যাপার। হযরত আলি (রা.)-এর মতো সত্যের পথে জীবনবাজি রাখা যুক্ত খুব কম আছে। আমরাও সত্যের পথে একনিষ্ঠ থাকব এবং সত্য প্রতিষ্ঠা করব।

বীরত্ব

হযরত আলি (রা.) ছিলেন শৌর্য-বীর্য ও অসাধারণ শক্তির অধিকারী। তাঁর নাম শুনলে কাফিরদের মনে আস সৃষ্টি হতো। বদর যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের জন্য রাসূল (স.) তাঁকে ‘যুলফিকার’ তরবারি উপহার দেন। খায়বারে কামুস দুর্গ জয় করলে হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁকে ‘আসাদুল্লাহ’ (আল্লাহর সিংহ) উপাধি প্রদান করেন। হৃদয়বিয়া সন্ধিপত্র তিনি নিজ হাতে লিখেছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় মুসলিম বাহিগীর পতাকা তাঁর হাতে ছিল।

জ্ঞান সাধনা

হযরত আলি (রা.) অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন। ছেট বেলা থেকেই তিনি ছিলেন জ্ঞান তাপস ও জ্ঞান সাধক। তিনি সর্বদা জ্ঞানচর্চা করতেন। হাদিস, তাফসির, আরবি সাহিত্য ও আরবি ব্যাকরণে তিনি তাঁর যুগের সেরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কথিত আছে যে, ‘হযরত মুহাম্মদ (স.) হলেন জ্ঞানের শহর, আর আলি হলেন তার দরজা’। তাঁর রচিত ‘দিওয়ানে আলি’ নামক কাব্য গ্রন্থটি আরবি সাহিত্যের অন্যত্যন্ত সম্পদ। আমরাও সর্বদা হযরত আলি (রা.)-এর মতো জ্ঞান সাধনা করব।

অনাড়ুব্র জীবনযাপন

হ্যরত আলি (রা.) সারা জীবন জ্ঞান সাধনায় ব্যস্ত থাকায় সম্পদ উপার্জন করার সময় পাননি। তিনি অনাড়ুব্র ও সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন। নিজ হাতে কাজ করে উপার্জন করতেন। কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কখনো না খেয়ে থাকতেন। তবুও আছেপ করতেন না। বাসায় কোনো কাজের লোক ছিল না। তাঁর ত্রী রাসুলুল্লাহ (স.)-এর আদরের কল্যাণ হ্যরত ফাতিমা (রা.) নিজ হাতে জাঁতা পিষে গম গুঁড়ে করতেন ও রুটি তৈরি করতেন। মুসলিম জাহানের খলিফা হওয়ার পরও তিনি বাসায় কোনো কাজের লোক রাখেননি।

ইসলামের সেবা

তিনি আর্থিকভাবে সচ্ছল না হওয়ায় ধন-সম্পদ দিয়ে ইসলামের উল্লেখযোগ্য সেবা করতে পারেননি। তবে তাঁর শৌর্য-বীর্য, সাহসিকতা ও লেখার মাধ্যমে তিনি ইসলামের অনেক সেবা করেছেন। সাহসিকতা, বীরত্ব জ্ঞানচর্চা, আত্মসংযম ও অনাড়ুব্র জীবনযাপনে হ্যরত আলি (রা.) আমাদের সকলের আদর্শ। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে আমরা অনাড়ুব্র জীবনযাপনে অভ্যন্ত হব।

হ্যরত আলি (রা.) ৪০ হিজরী ২১ রমজান শাহাদাত বরণ করেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা হ্যরত আলি (রা.)-এর বীরত্ব ও জ্ঞান সাধনা সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করবে।

মুসলিম মনীষী

মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর নিকট ওহির সূচনা হলো 'ত্রুটি ইকরা' (আপনি পড়ুন) শব্দ দিয়ে। এজন্য ইসলাম শিক্ষায় প্রশিক্ষণ, জ্ঞান ও জ্ঞানীদের অনেক মর্যাদার কথা রয়েছে। আল কুরআনকে বলা হয়েছে হাকিম (বিজ্ঞানময়)। মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, "প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জ্ঞান অঙ্গেষণ করা ফরজ।" (ইবনু মাজাহ)

শিক্ষা বিভাগের লক্ষ্যে মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) মকাব দারুল আরকাম নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মদিনায় হিজরতের পর মসজিদে নববির বারান্দায় ৭০ জন শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে 'সুফফা' নামে একটি শিক্ষায়তন গড়ে তোলেন। মকা বিজয়ের পর মসজিদে নববি জ্ঞানচর্চার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সেখানে সুদূর পারস্য, রোম, কুফা, বসরা, বাগদাদ, সিরিয়া ও মিসর থেকে শিক্ষার্থীরা এসে জ্ঞানের জন্য ভিড় জমাত।

জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বিভাগের জন্য মহানবি (স.) তাঁর সাহাবিদের বিভিন্ন দেশে পাঠাতেন। মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইতিকালের পর তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকে আরও মহিমাপূর্ণ করে তোলেন। জ্ঞানের প্রদীপ বিভিন্ন দেশে প্রজুলিত করেন। প্রতিষ্ঠা করেন অসংখ্য শিক্ষা

প্রতিষ্ঠান ও পাঠগার। আবরাসি খলিফা মামুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাইতুল হিকমার মাধ্যমে পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষায় রচিত বইগুলো আরবিতে অনুবাদ করা হয়। শাসকদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফলে ইতিহাস, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা, পদাৰ্থ, রসায়ন ও গণিতশাস্ত্রে মুসলিম মনীষীগণ বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হন। ফলে মুসলিমগণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের স্বর্গশিখের আরোহণ করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদানের কথা মানব ইতিহাসে স্বর্ণাঙ্কে লিপিবদ্ধ আছে। মুসলমানগণ হাদিস, তাফসির, ফিকাহ, ইতিহাস ও দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রেও অবিস্মরণীয় অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। হাদিস শাস্ত্রে ইমাম বুখারি (র.), ফিকাহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা (র.), দর্শনশাস্ত্রে ইমাম গায়ালি (র.) ও তাফসির শাস্ত্রে ইমাম ইবনে জারির আত তাবারির (র.) অবদান সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

পাঠ ১০

ইমাম বুখারি (র.)

ইমাম বুখারি (র.)-এর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু আন্দুল্লাহ, পিতার নাম ইসমাইল, দাদার নাম ইবরাহিম। উপাধি ‘আমিরুল মু’মিনুন ফিল হাদিস বা হাদিস বর্ণনায় মুমিনদের নেতা’। তিনি ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির লালন কেন্দ্র বুখারা নগরীতে ১৯৪ হিজরি ১৩ শাওয়াল, ৮১০ খ্রিষ্টাব্দের ২১ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তাঁর পিতা ইস্তিকাল করেন। মাঝের স্নেহ ও ভালোবাসায় তিনি বড় হন।

জ্ঞানার্জন

বাল্যকাল থেকে জ্ঞানের প্রতি তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ। তিনি খুব তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। ফলে ছয় বছর বয়সেই পৰিত্র কুরআন হিফজ (মুখস্থ) করে ফেলেন। দশ বছর বয়স থেকেই হাদিস মুখস্থ করা আরম্ভ করেন। ঘোল বছর বয়সেই তিনি হযরত আন্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ও আল্লামা ওয়াকি-এর লেখা হাদিস গ্রন্থদ্বয় মুখস্থ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর মা ও ভাইসহ হজ করতে পৰিত্র মক্কা নগরীতে গমন করেন। সেখানে তিনি হিজায়ের মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদিস শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। একাধাৰে ছয় বছর হাদিস বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰার পৰ তিনি হাদিস সংগ্রহ কৰার জন্য কুফা, বাগদাদ, বসরা, মিসর, সিরিয়া, আসকালান, হিমস, দামিশক ইত্যাদি স্থানে গমন করেন। তিনি লক্ষাধিক হাদিস সনদসহ মুখস্থ করেন। তিনি স্বাধীনচেতা ও আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন বিধায় কোনো রাজা-বাদশাহৰ দরবারে গমনাগমন করতেন না।

বুখারি শরিফ সংকলন

ইমাম বুখারি দীর্ঘ ঘোল বছর সাধনা কৰে ৬ লক্ষ হাদিস থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কৰে ৭২৭৫টি হাদিস বুখারি শরিফে লিপিবদ্ধ করেন। প্রত্যেক হাদিস লিখার পূর্বে তিনি ওয়ু ও গোসল কৰে দুই রাকআত নফল নামায পড়তেন। অতঃপর ইন্দ্রিয়া (স্পন্দ আল্লাহর নিকট থেকে নির্দেশনা পাওয়ার আবেদন) করতেন। বিশুদ্ধ মনে হলে সেই হাদিস লিখতেন। হাদিসবিশারদ ও উল্লামায়ে কেরাম ঐকমত্য পৌষ্ণ করেছেন যে, পৃথিবীতে আল-কুরআনের পৰ বুখারি শরিফই হলো সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ। এটি ছাড়াও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। জ্ঞান সাধনায় ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার কৰলে যে স্মরণীয় ও বরণীয় হওয়া যায় ইমাম বুখারি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বুখারা ত্যাগ

ইমাম বুখারি দীর্ঘ সাধনা শেষে বুখারায় এলে তৎকালীন বাদশাহ খালিদ ইবনে আহমদের সাথে বিরোধ সৃষ্টি হয়। বাদশাহ ইমাম বুখারির ইলমে হাদিসের গভীর জ্ঞানের কথা শুনে তাঁর কাছ থেকে হাদিস শোনার জন্য তাঁকে রাজ দরবারে ডেকে পাঠালেন। ইমাম বুখারির বললেন, “আমি হাদিসকে রাজ দরবারে নিয়ে অপমান করতে চাই না। তার প্রয়োজন হলে সে আমার ঘরে বা মসজিদে আসুক।” অতঃপর বাদশাহ তাঁকে বুখারা ত্যাগে বাধ্য করলে তিনি সমর্থনে চলে যান।

স্মৃতিশক্তি

ইমাম বুখারি ছিলেন অগাধ স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তিনি যা দেখতেন বা শুনতেন তা তাঁর মনে থাকত। তাঁর বয়স যখন এগার তখন ‘দাখেলি’ নামক এক মুহাদিস তাঁর সামনে হাদিস বর্ণনায় ভুল করলে তিনি তা শুন্দ করে দেন। উপস্থিত সবাই ইমাম বুখারির মেধা দেখে আশ্চর্যাপ্নিত হলেন।

সমরকন্দের প্রসিদ্ধ চারশত হাদিসবিশারদ তাঁর হাদিস মুখস্থের পরীক্ষা নেন। তিনি তাতে অত্যন্ত সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হলে সবাই তাঁকে তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ হাদিসবিশারদ হিসেবে স্বীকৃতি দেন। বর্ণিত আছে যে, তাঁর ৯০ হাজারের উপরে ছাত্র ছিল যারা তাঁর কাছে হাদিস শিখেছেন।

যারা জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বিতরণে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায় ইমাম বুখারি তাদের জন্য এক অনুসরণীয় আদর্শ। ইমাম বুখারি (র.) ২৫৬ হিজরির ১ শাওয়াল (৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে) সমরকন্দের খরাতঙ্গ নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে বুখারি শরিফ এহুলায় ইমাম বুখারির সাধনার একটি বিবরণ তৈরি করবে।

পাঠ ১১

ইমাম আবু হানিফা (র.)

ফিকাহ শাস্ত্রের জনক ইমাম আবু হানিফা (র.) ৮০ হিজরি ৬৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম নুমান, উপনাম আবু হানিফা। তাঁর উপাধি হলো ইমাম আয়ম (বড় ইমাম)। পিতার নাম সাবিত। তিনি একজন তাবেঙ্গি ছিলেন।

জ্ঞান সাধনা

ইমাম আবু হানিফা (র.) ছিলেন তৌঙ্গ মেধার অধিকারী। প্রাথমিক জীবনে তিনি ব্যবসায় মনোনিবেশ করতে চাইলেন। কিন্তু কুফা নগরীর তৎকালীন আলেম-উলামার পরামর্শক্রমে তিনি জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করেন। সতের বছর বয়স থেকে জ্ঞান সাধনা আরম্ভ করলেও তিনি অতি অঙ্গ দিনের মধ্যে হাদিস, তাফসির, ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি তাঁর শিক্ষক হ্যরত হাম্মাদ (র.)-এর নিকট একাধারে দশ বছর ফিকাহ বিষয়ের জ্ঞানার্জন করেন। এতে বোঝা যায়, জ্ঞানার্জনের নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই। কঠিন সাধনা থাকলে যে কোনো সময় জ্ঞানার্জন করা সম্ভব।

ফিকাহশাস্ত্রে অবদান

তিনি ফিকাহশাস্ত্রের উক্তাবক ছিলেন। তিনি তাঁর চল্লিশজন ছাত্রের সমন্বয়ে ‘ফিকাহ সম্পাদনা বোর্ড’ গঠন করেন। এই বোর্ড দীর্ঘ বাইশ বছর কঠোর সাধনা করে ফিকাহকে একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র হিসেবে রূপ দান করেন। পরবর্তীতে তিনি বোর্ডের চল্লিশজন সদস্য হতে দশজনকে নিয়ে একটি বিশেষ বোর্ড গঠন করেন। ফিকাহশাস্ত্র প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এই বোর্ডের অবদান সবচেয়ে বেশি। কোনো মাসআলা (সমস্যা) এলেই এই বোর্ড তা নিয়ে গবেষণা করত এবং কুরআন ও হাদিসের আলোকে গবেষণা করে ফতোয়া (সমাধান) দিতেন। এভাবে কুতুবে হানাফিয়াতে (হানফি মাযহাবের কিতাবসমূহ) ৮৩ হাজার মাসআলা ও সমাধান লিপিবদ্ধ করা হয়। তিনি হানফি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে কঠিন বস্তুও যে সহজ করা যায় ইমাম আবু হানিফার ‘ফিকাহ বোর্ড’ এর প্রয়াণ।

হাদিসশাস্ত্রে অবদান

ফিকাহশাস্ত্র সর্বাধিক অবদান থাকার কারণে হাদিস শাস্ত্রে তাঁর অবদান তুলনামূলকভাবে কম মনে হয়। হাদিস শাস্ত্রে তিনি ‘মুসনাদে ইমাম আবু হানিফা’ নামে একটি শৃঙ্খল সংকলন করেন, যাতে ৫০০ হাদিস রয়েছে।

গুণাবলি

ইমাম আয়ম আবু হানিফা (র.) গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, আবিদ ও বৃদ্ধিমান। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর ছাত্র ইয়ায়িদ ইবনে হারুন বলেন, “আমি হাজার হাজার জ্ঞানী দেখেছি, তাঁদের বক্তব্য শুনেছি। তাঁদের মধ্যে পাঁচজনের মতো জ্ঞানী, খোদাভীরু ও ইলমে ফিকাহ-এ পারদর্শী কাউকে দেখিনি। তাঁদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা (র.) হচ্ছেন অন্যতম।” ইমাম শাফেয়ি (র.) বলেছেন, “মানুষ ফিকাহশাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মুখাপেক্ষী।”

ইমাম বুখারির প্রিয় শিক্ষক হ্যরত মক্কি ইবনে ইবরাহিম বলেন- “ইমাম আবু হানিফা তাঁর কথা ও কাজে সত্যনিষ্ঠ ছিলেন।” তিনি এত বেশি ইবাদত করতেন যা চিন্তা করাও কঠিন। তিনি মোট ৫৫ বার হজ করেন। তিনি এতই আল্লাহভীর ছিলেন যে, কুফায় ছাগল চুরির কথা শুনার পর তিনি সাত বছর যাবত বাজার থেকে ছাগলের গোশত ত্রয় করেননি; এ ভয়ে যে এটি চুরির প্রতি ছাগলের গোশত হতে পারে। তিনি বিনা পয়সায় জ্ঞান বিতরণ করতেন। কাপড় ব্যবসা করে জীবনযাপন করতেন। একদা কুফায় তিনি এক লোকের জানায় পড়তে গেলেন। মাঠে প্রচণ্ড রোদ। সকলে বলল, দয়া করে আপনি ঐ বৃক্ষের ছায়াতলে দাঁড়ান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন বৃক্ষটি কার। বলা হলো এটি আপনার অনুক ছাত্রের বাবার। তিনি বললেন, আমি ঐ বৃক্ষের ছায়ায় যাব না। কেননা ঐ ছাত্র মনে করতে পারে যে আমি তাকে শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে তার বাবার বৃক্ষের ছায়াতলে দাঁড়িয়েছি। আদর্শ শিক্ষকের এক মহান দৃষ্টান্ত এটি।

বিচারকের দায়িত্ব পালনে অনীহা

তৎকালীন বাগদাদের খলিফা আল মানসুর ইমাম আবু হানিফা (র.)-কে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নিতে প্রস্তাব দিলে তিনি তা গ্রহণ করেননি। ফলে তাঁকে জেলখানায় আবদ্ধ করে রাখা হয়। বলা হয় যে, এই মহান মুন্নীবী ১৫০ হিজরি ৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে খলিফার নির্দেশে প্রয়োগকৃত বিষক্রিয়ার প্রভাবে ইন্দোকাল করেন। সরকার কর্তৃক দেওয়া সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাখ্যান করে ইমাম আবু হানিফা নৈতিক ও দীনি ইলমের মর্যাদা সমুদ্রত রেখেছেন। আবরাও জ্ঞানচর্চায় ও নৈতিক মূল্যবোধ সংরক্ষণে সচেষ্ট থাকব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ফিকাহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর অবদান সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।

পাঠ ১২

ইমাম গাযালি (র.)

ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ আল গাযালি (র.) ছিলেন মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও ইসলামি চিত্তাবিদ। তিনি ৪৫০ হিঃ ১০৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ‘তুস’ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু হামিদ। পিতার নাম মুহাম্মদ আত্তুসি। তিনি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি সুফিবাদের উপর গুরুত্ব প্রদান করতেন। মানুষের আধ্যাত্মিক ও আত্মিক উন্নতির জন্য নৈতিক শিক্ষা যে কতখানি আবশ্যক তা তিনি তাঁর লেখনীতে তুলে ধরেন। তিনি ইসলামি দর্শন ও সুফিবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অনেক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘ইহইয়াউ উলুমিদ দীন’ (ধর্মীয় বিজ্ঞানের পুনর্জীবন)। প্রামাণ্য ও যুক্তিপূর্ণ দলিলের মাধ্যমে তিনি ইসলামের প্রাথান্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামি দর্শন ও শিক্ষায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে ‘হজাতুল ইসলাম’ (ইসলামের দলিল) নামে অভিহিত করা হয়। তিনি ১১১১ খ্রি. ইন্দোকাল করেন। যাঁরা আধ্যাত্মিক ও আত্মিক উন্নতি করতে চান, ইমাম গাযালি (র.) তাঁদের জন্য আদর্শ।

ইবনে জারির আত-তাবারি (র.)

তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু জাফর, পিতার নাম জারির। তিনি ৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তাবারিন্নানের আমুল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। সাত বছর বয়সে তিনি পরিত্র কুরআন মুখস্থ করে ফেলেন। তিনি একজন প্রখ্যাত মুফাসিসির, আরব ঐতিহাসিক ও ইমাম ছিলেন। তিনি পরিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ তাফসির (ব্যাখ্যা) করেন। ইতিহাস বিষয়েও তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর তাফসির গ্রন্থটির নাম ‘জামিউল বায়ান আন তাবলি আয়িল কুরআন’। আর ইতিহাস গ্রন্থটির নাম ‘তারিখ আর-রুসুল ওয়াল মুলুক’। তাফসির ও ইতিহাস বিষয়ে তাঁর এ গ্রন্থ দুটি প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ। তিনি তাঁর তাফসির গ্রন্থে পরিত্র কুরআনের তাফসিরের প্রগয়নে অগাধ পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দেন। তিনি তাফসির সম্পর্কীয় প্রচুর হাদিস সংগ্রহ করেন এবং হাদিসের আলোকে পরিত্র কুরআনের তাফসিরের প্রগয়ন করেন। এ কারণে তাঁর তাফসির গ্রন্থটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য। পাশ্চাত্য পাণ্ডিতদের নিকট ঐতিহাসিক এবং সমালোচনামূলক

গবেষণার জন্য এ তাফসির গ্রন্থটি বিশেষভাবে সমাদৃত। এভাবে তিনি ইতিহাস গ্রন্থে ধর্মীয় নীতি ও আইন সম্পর্কীয় বিষয়ে বহু বিবরণ উপস্থাপন করেন। তিনি ১৯২৩ খ্রি. বাগদাদে ইস্তিকাল করেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ইমাম গাযালি (র.) ও ইবনে জারির আত-তাবারি (র.)-এর গুণাবলির উপর দশটি বাক্য তৈরি করবে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চায় মুসলমানদের অবদান

শুধু সাধারণ শিক্ষায় নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চায়ও মুসলমানগণ সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ থেচেষ্ট ও অবদানের উপর ভিত্তি করে মুসলমানগণ একসময়ে সারা বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আধুনিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনেক শাখা মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিরই ফসল। এ সকল মুসলিম মনীষীর মধ্যে কয়েকজন সম্পর্কে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

পাঠ ১৩ চিকিৎসাশাস্ত্র

চিকিৎসা শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান অবিস্মরণীয়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির মূলে রয়েছে মুসলমানদের অবদান। যাদের অবদানের কারণে চিকিৎসা শাস্ত্র উন্নতির শিখরে পৌছেছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- আবু বকর আল রায়ি, আল বিরগনি, ইবনে সিনা, ইবনে কুশদ প্রমুখ।

আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া আল রায়ি

তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু বকর, পিতার নাম যাকারিয়া। তিনি আল-রায়ি নামে পরিচিত। তিনি ৮৬৫ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও শল্যচিকিৎসাবিদ ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি জুন্দেরশাহপুর ও বাগদাদে সরকারি চিকিৎসালয়ে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তৎকালে তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ থেকে অনেক রোগী তাঁর নিকট আসতেন।

শল্যচিকিৎসায় আল রায়ি ছিলেন তৎকালের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর অঙ্গোপচার পদ্ধতি ছিল গ্রীকদের থেকেও উন্নত। তিনি মোট দুই শতাব্দিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে শতাব্দিক হলো চিকিৎসা বিষয়ক। তিনি বসন্ত ও হাম রোগের উপর ‘আল জুদাইরি ওয়াল হাসবাহ’ নামক একখনি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মৌলিকত্ব দেখে চিকিৎসা বিজ্ঞানের লোকেরা খুব আশ্চর্যাবিত হয়েছিলেন। তাঁর আরেকটি গ্রন্থের নাম হলো আল মানসুরি। এটি ১০ খণ্ডে রচিত। এ গ্রন্থ দুটি আল রায়িকে চিকিৎসাশাস্ত্রে অমর করে রেখেছে। তিনি হাম, শিশু চিকিৎসা, নিউরোসাইকিয়াট্রিক ইত্যাদি চিকিৎসা সম্পর্কে নতুন মতবাদ প্রবর্তন করেন। আল মানসুরি গ্রন্থে তিনি এনাটমি, ফিজিওলজি, ঔষধ, স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি, চর্মরোগ ও প্রসাধন দ্রব্য, শল্যচিকিৎসা, বিষ, জ্বর ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে ইস্তেকাল করেন।

আল বিরুণি

বুরহানুল হক আবু রায়হান মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল বিরুণি সংক্ষেপে আল বিরুণি নামে পরিচিত। ১৭৩ খ্রিষ্টাব্দে খাওয়ারিয়মের নিকটবর্তী আল বিরুণ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। আল বিরুণি ছিলেন মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মুসলিম পণ্ডিত, মহাজ্ঞানী ও নিষ্ঠাবান গবেষক। তিনি অত্যন্ত মৌলিক ও গভীর চিন্তাধারার অধিকারী বড় দার্শনিক ছিলেন। গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, পদাৰ্থ, রসায়ন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তিনি পারদর্শী ছিলেন। এ ছাড়া তিনি প্রসিদ্ধ ভূগোলবিদ, ঐতিহাসিক পঞ্জিকাবিদ, চিকিৎসাবিজ্ঞানী, ভাষাতত্ত্ববিদ ও ধর্মতত্ত্বের নিরপেক্ষ বিশ্লেষক ছিলেন। স্বাধীন চিন্তা, মুক্ত বুদ্ধি, সাহসিকতা, নিষ্ঠাক সমালোচনা ও সঠিক মতামতের জন্য তিনি যুগান্বিত মনীষী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি আল উসতাদ (মহামান্য শিক্ষক) নামে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ভূগোলের অক্ষরেখার পরিমাপ নির্ণয় করেন। তাঁর লিখিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে ‘আল-আছারুল বাকিয়াহ-আনিল কুরানিল খালিয়াহ’ গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ। এ গ্রন্থে তিনি বর্ষপঞ্জি, গণিত, ভূগোল, আবহাওয়া বিজ্ঞান ও চিকিৎসাসহ নানা বিষয় বর্ণনা করেন। তিনি প্রথম প্রমাণ করলেন যে, পৃথিবী গোলাকার। পৃথিবীর গোলাকার মানচিত্র তাঁর রচিত। তাঁর রচিত কিতাব আল-হিন্দ বা ভারততত্ত্ব এ উপমহাদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ওপর লিখিত একটি আকর গ্রন্থ। তিনি ১০৪৮ খ্রি. ইস্তিকাল করেন।

ইবনে সিনা

তাঁর পুরো নাম আবু আল হুসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সিনা। তিনি বুখারার নিকটবর্তী আফশানা নামক গ্রামে ১৮০ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। দশ বছর বয়সে পৰিত্র কুরআন হিফজ করেন। তিনি দার্শনিক, চিকিৎসক, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ এবং মুসলিম জগতের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। চিকিৎসায় তাঁর অসাধারণ অবদানের জন্য তাঁকে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র ও চিকিৎসা প্রগালি এবং শল্যচিকিৎসার দিশার মনে করা হয়। তাঁর রচিত অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে। তবে চিকিৎসাশাস্ত্রে ‘আল-কানুন ফিত-তিবব’ একটি অমর গ্রন্থ। ড. ওসলার এ গ্রন্থটিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের বাইবেল বলে উল্লেখ করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে এর সমর্পণায়ের কোনো গ্রন্থ আজও দেখা যায় না। আধুনিক বিশ্বেও তাঁর গ্রন্থটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পাঠদান করা হচ্ছে। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যের আশৰ্য রকম সমাবেশ থাকার কারণে গ্রন্থটিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের বৃহৎ সংগ্রহ বলা চলে। তিনি ১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ইস্তিকাল করেন।

ইবনে রুশদ

তাঁর পুরো নাম আবু ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে রুশদ। তিনি স্পেনের করডোবায় জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যযুগে মুসলিমদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি তাঁদের একজন। এই ক্ষণজন্যা পুরুষ শুধু এক বিষয়েই জ্ঞানী ছিলেন না, তিনি জ্ঞানের সকল শাখায় বিচরণ করেছেন। দর্শন, পদাৰ্থ, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র- এ সকল শাখায় তাঁর সমান বিচরণ ছিল। তিনি এরিস্টটলের গ্রন্থসমূহ আরবিতে অনুবাদ করার পাশাপাশি নিজেও অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ‘আল জামি’। এ গ্রন্থে তিনি জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন ও চিকিৎসার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ ল্যাটিন ও হিন্দু ভাষায় অনুবাদ করা হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর লেখা গ্রন্থের নাম হলো ‘কুলিয়াত’। এটি বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানে সমাদৃত হয়েছে।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান মধ্যযুগের মুসলমানদের চিকিৎসাবিজ্ঞানের কাছে অনেক ঝণী। মুসলমানদের ঐ অবদান না থাকলে আজকে চিকিৎসা বিজ্ঞান এতদূর আসতে পারত না। আমরাও চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে গভীর অধ্যয়ন করে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সহজতর করে তুলব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ১৪

রসায়নশাস্ত্র

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ন্যায় রসায়নশাস্ত্রেও মুসলমানদের অবদান অনেক। আল-কেমি (রসায়ন) শাস্ত্রে মুসলিম বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়ান, আল কিন্দি, জুননুন মিসরি, ইবনে আব্দুল মালিক আল-কাসি বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁদের নিরলস পরিশ্রম ও অকৃত্রিম অবদানের ফলে রসায়নশাস্ত্র আজ উন্নতির উচ্চশিখরে পৌছেছে।

জাবির ইবনে হাইয়ান

আবু আব্দুল্লাহ জাবির ইবনে হাইয়ান দক্ষিণ আরবের আয়দ বৎশে ৭২২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাইয়ানও একজন চিকিৎসক ছিলেন। গণিতশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ শেষে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রেও শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি কুফায় চিকিৎসা জীবন শুরু করলেও এর মধ্যে তিনি রসায়নশাস্ত্রে উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি কুফায় একটি বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করে মৃত্যু পর্যন্ত (৮০৪ খ্রি.) সেখানেই গবেষণারত ছিলেন। রসায়নকে তিনি সর্বথম বিজ্ঞানের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রসায়ন ও বিজ্ঞানের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যথো পরিস্রবণ, দ্রবণ, ভস্মীকরণ, বাস্পীকরণ, গলানো প্রভৃতি তাঁরই আবিষ্কার। তিনি তাঁর এছে ধাতুর শোধন, তরলীকরণ, বাস্পীকরণ, ইস্পাত তৈরির প্রক্রিয়া, লোহার মরিচা রোধক বার্নিশ ও চুলের কলপ, লেখার কালি ও কাঁচ ইত্যাদি দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালি ও বিধি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। জাবির ইবনে হাইয়ান রসায়নশাস্ত্রের পরিপূর্ণতা দান করেছেন বিধায় তাকে এ শাস্ত্রের ‘জনক’ বলা হয়। তিনি ৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে ইতিকাল করেন।

আল কিন্দি

আবু ইয়াকুব ইবনে ইছহাক আল কিন্দি ৮০১ খ্রি. কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ইছহাক খলিফা মামুনের শাসনামলে কুফার গভর্নর ছিলেন। তিনি এরিস্টটলের ধর্মতত্ত্ব (Theology of Aristotle) আরবিতে অনুবাদ করেন। খলিফা মামুনের সময়ে জ্যোতির্বিদ, রসায়নবিদ, চিকিৎসক ও দার্শনিক হিসেবে তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আল কিন্দি নিউপ্লেটোনিজমের উপ্তাবক ছিলেন। তিনিই সর্বথম প্লেটো ও এরিস্টটলের মতবাদ সমন্বয় করার চেষ্টা করেন। তিনি অনধিক ৩৬৫টি গ্রন্থ রচনা করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাগারকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁর মতে গণিত ছাড়া দর্শনশাস্ত্র অসম্ভব। দর্শন ছাড়াও তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও সংগীত বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মাত্তভায়া আরবি ছাড়াও পাহলাবি, সংস্কৃত, গ্রিক ও সিরীয় ভাষার সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ইতিকাল করেন।

জুননুন মিসরি

তাঁর নাম ছাওবান, পিতার নাম ইবরাহিম। তিনি জুননুন মিসরি নামে পরিচিত। তিনি মিসরের আখমিম নামক স্থানে ১৯৬ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুফি হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও আরব মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে রসায়নশাস্ত্রের উপর যাঁরা প্রথমদিকে গবেষণা করেন তাঁদের অন্যতম। তিনি রসায়নশাস্ত্রের বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে গবেষণা ও লেখালেখি করেন। তাঁর লেখায় সোনা, রূপাসহ বিভিন্ন খনিজ পদার্থের বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি মিসরীয় সাংকেতিক বর্ণের মর্মার্থ বুঝতেন। তিনি মিসরের আল জিজাহ নামক স্থানে ৮৫৯ খ্রি. ইত্তেকাল করেন।

ইবনে আব্দুল মালিক আল কাসি

তাঁর নাম আবুল হাকিম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল মালিক আল খারেজিমি আল কাসি। তিনি একাদশ শতাব্দীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাগদাদেই অবস্থান করতেন। তাঁর লেখা ‘আইনুস সানাহ ওয়া আইওয়ানুস সানাহ’ (Essence of the Art and Aid of worker) এ গ্রন্থটি রসায়নশাস্ত্রে মূল্যবান একটি সংযোজন। তিনি এ গ্রন্থে রসায়নের প্রত্যেক প্রয়োজনীয় শাখার সরল ও সহজ পথ্য সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছেন। যে সকল বস্তু ‘সাদা’ এবং যে সকল বস্তু ‘লাল’ এদের ব্যবহার ও পার্থক্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নির্দেশনায় রসায়নশাস্ত্রে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করবে।

পাঠ ১৫

ভূগোলশাস্ত্র

অজানাকে জানার আকাঙ্ক্ষা এবং বিস্তৃত এলাকার লোকদের কেবলা নির্ধারণসহ নানা প্রয়োজনে মানচিত্রের খুব প্রয়োজন দেখা দেয়। ইসলাম প্রচারক ও বণিকগণের জন্য দেশ-দেশান্তর ভ্রমণ করার তাগিদে ভূগোলের জ্ঞান অর্জনের খুব প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য আল মোকাদ্দাসি, আল মাসুদি, ইয়াকুত ইবনে আব্দুল্লাহ ও ইবনে খালদুনসহ অনেক মুসলিম মনীষী ভূগোলশাস্ত্রে অসামান্য অবদান রাখেন।

আল মোকাদ্দাসি

তাঁর নাম মুহাম্মদ, পিতার নাম আহমাদ। তিনি ১৯৪৬ খ্রি. বাইতুল মোকাদ্দাস এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন তাই আল মোকাদ্দাসি নামে পরিচিত। তিনি একজন বিখ্যাত পরিব্রাজক ও ভূগোলবিদ ছিলেন। তিনি স্পেন, ভারতবর্ষ ও সিজিস্তান ব্যতীত সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ভ্রমণ করেন। দীর্ঘ বিশ্ব বছরের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি ১৯৮৫ পৃষ্ঠার একটি ধৰ্ম রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থের নাম হলো ‘আহসানুত তাকাসিম ফি মারিফাতুল আকালিম’। এই মনীষী ১০০০ খ্রিষ্টাব্দে ইত্তেকাল করেন।

আল-মাসুদি

তাঁর নাম আবুল হাসান আলি বিন হুসাইন আল-মাসুদি। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে পরিব্রাজক, ইতিহাসবিদ ও ভূগোলবিদ ছিলেন। তিনি তাঁর ঐতিহাসিক ‘ভূগোল বিশ্বকোষ’-এ তাঁর

অমণ্ডসমূহের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করেন। পৃথিবীর আকার, আয়তন, গতি ও প্রধান প্রধান বিভাগগুলোর বিবরণ দেন। ভারত মহাসাগর, পারস্য সাগর, আরব সাগরের ঝড়ের অবস্থার কথা তিনি উল্লেখ করেন। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ভূকম্পন বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেন। তিনি ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মিসরে ইস্তিকাল করেন।

ইয়াকুত ইবনে আব্দুল্লাহ

ইয়াকুত ইবনে আব্দুল্লাহ আল হামাবি পারস্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ‘মুজামুল বুলদান’ নামক গ্রন্থখানি ভূগোলশাস্ত্রের এক প্রামাণ্যগ্রন্থ। এতে তিনি প্রত্যেক স্থানের ঐতিহাসিক, জাতিতাত্ত্বিক ও প্রাকৃতিক বিষয়ের বিবরণ দিয়েছেন। ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের পরিচয় ও ঘটনাসমূহ উল্লেখ করেছেন। তিনি ১২২৮ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে ইস্তিকাল করেন।

ইবনে খালদুন

তাঁর নাম আব্দুর রহমান, পিতার নাম মুহাম্মদ। তিনি ইবনে খালদুন নামে পরিচিত। তিনি ১৩০২ খ্রি. তিউনিসিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতির মূলে ছিল তাঁর ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ ‘কিতাব আল-ইবার ওয়া দিওয়ান আল-মুবতাদা ওয়াল খাবার ফি-আইয়াম আল-আরাব ওয়াল আয়ম ওয়া বারবার’ এটি সংক্ষেপে আল মুকান্দিমা নামে পরিচিত। এই গ্রন্থে ভূগোল বিষয়ে তিনি যেসব তত্ত্ব ও তথ্যের অবতারণা করেছেন তা তাঁকে ভূগোলশাস্ত্রে অমরত্ব দান করেছে। তিনি ১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দে ইস্তিকাল করেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ভূগোলশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করবে।

পাঠ ১৬

গণিতশাস্ত্র

গণিতকে বিজ্ঞানের মূল বলা হয়ে থাকে। এই গণিতশাস্ত্র আবিক্ষারের অগ্রগতি ও উন্নতির উৎকর্ষসাধনে মুসলমানদের অবদান অবিস্মরণীয়। আল-খাওয়ারিয়মি, ইবনে হায়সাম, উমর খৈয়াম ও নাসির উদ্দিন তুসিসহ অনেক মুসলিম মনীষী এ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিয়মি

তাঁর নাম মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল খাওয়ারিয়মি। ৭৮০ খ্রি. খাওয়ারিয়ম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গণিতশাস্ত্রের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁকে গণিতশাস্ত্রের ‘জনক’ বলা হয়। বৌজগণিতের আবিক্ষারক হলেন তিনি। এ বিষয়ে তাঁর রচিত ‘হিসাব আল জাবর ওয়াল মুকাবালাহ’ গ্রন্থের নামানুসারে এ শাস্ত্রকে পরবর্তীকালে ইউরোপীয়রা আল-জেবরা নামকরণ করে। তিনি এ গ্রন্থে আট শতাধিক উদাহরণ সন্নিবেশিত করেন। সমীকরণের সমাধান করার ছয়টি নিয়ম তিনি আবিক্ষার করেন। এটি দ্বাদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হয়ে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পঠিত হতো। ‘কিতাবুল হিসাব আল আদাদ আল হিন্দী’ তাঁর পাটিগণিত বিষয়ক গ্রন্থ। তাঁর গণিতশাস্ত্র দ্বারা উমর খৈয়াম,

লিওনার্ডো, ফিরোনাসসি এবং মাস্টার জ্যাকবসহ আরও অনেকেই প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি ৮৫০ খ্রি. ইত্তিকাল করেন।

হাসান ইবনে হায়সাম

হাসান ইবনে হায়সাম একজন চক্ষুবিজ্ঞানী (Optic Scientist) ছিলেন। তিনি ৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে তিনি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। চক্ষুবিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থ ‘কিতাবুল মানায়ির’ তাঁকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। মধ্যযুগে আলোক বিজ্ঞানের এটি একমাত্র গ্রন্থ ছিল। গবেষক রোজার বেকন, নিউলার্ডো, কেপলার প্রমুখ এ গ্রন্থের উপর নির্ভর করেই তাঁদের গবেষণা করেন। তিনি দৃষ্টি শক্তির প্রতিসরণ ও প্রতিফলন বিষয়ে গ্রিকদের ভুল ধারণা খণ্ডন করেন। তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, বাহ্যপদার্থ থেকেই আমাদের চোখে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়। চোখ থেকে বের হওয়া আলো বাহ্যপদার্থকে দৃষ্টিগোচর করায় না। তিনিই ম্যাগনিফাইং গ্লাস আবিক্ষা করেন।

আধুনিক কালের বিজ্ঞানীরা গতি বিজ্ঞানকে তাঁদের আবিক্ষার বলে দাবি করলেও ইবনে হায়সাম এ বিষয়ে বহু পূর্বেই বিস্তারিত বর্ণনা করেছিলেন। বায়ুমণ্ডলের ওজন, চাপ এবং তাপের কারণে জড়পদার্থের ওজনেও তারতম্য ঘটে। মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ে তিনি তাঁর গ্রন্থসমূহে বর্ণনা করেছেন। স্যার আইজ্যাক নিউটনকে (১৬৪২-১৭১৭ খ্রি) মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কিত শক্তির আবিক্ষারক মনে করা হলেও ইবনে হায়সাম এ বিষয়ে প্রথম ধারণা দিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। তিনি ১০৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ইত্তিকাল করেন।

উমর খৈয়াম

তাঁর নাম উমর ইবনে ইবরাহিম আল খৈয়াম সংক্ষেপে উমর খৈয়াম। ১০৪৮ খ্রিষ্টাব্দে পারস্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণির গণিতবিদ। তাঁর ‘কিতাবুল জিবার ওয়াল মুকাবালা’ গণিতশাস্ত্রের একখানি অমর গ্রন্থ। ঘন সমীকরণ এবং অন্যান্য উন্নতশ্রেণির সমীকরণের পদ্ধতির বিশ্লেষণ এবং সংজ্ঞানুসারে এগুলোকে শ্রেণিভুক্ত করে উমর খৈয়াম বীজগণিতের অসাধারণ অগ্রগতি সাধন করেন। এ ব্যাপারে তিনি গ্রিকদের থেকেও বেশি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। পাটিগণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপরও তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১১২২ খ্রিষ্টাব্দে ইত্তিকাল করেন।

নাসির উদ্দিন তুসি

মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন তুসি ১২০১ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে মোট ঘোলটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ত্রিকোণমিতিকে জ্যোতির্বিজ্ঞান হতে পৃথক করে সমতল এবং গোলাকৃত ত্রিকোণমিতি সম্পর্কে বর্ণনা করেন। গণিতশাস্ত্র বিষয়ে প্রণীত তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে-মুতাওয়াসিতাত বাইনাল হান্দাসা ওয়াল হাইয়া (The Middle Books between Geometry and Astronomy), জামিউল হিসাব বিত তাখতে ওয়াত্তোরাব (Summary of the Whole of Computation with Table and Earth), কাওয়ায়েদুল হান্দাসা, তাহরিরুল উসুল অন্যতম। তিনি ১২৭৪ খ্রি. ইত্তিকাল করেন।

আমরা এসব মুসলিম মনীষীর ন্যায় জগন ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখার চেষ্টা করব। সেই অনুযায়ী জীবন গড়ব এবং দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা গণিতশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি

১. কাকে সর্বশ্রেষ্ঠ শল্যচিকিৎসাবিদ বলা হয়?
 - ক. আল বিরুনিকে
 - খ. ইবনে সিনাকে
 - গ. আল-রায়িকে
 - ঘ. ইবনে রুশদকে

২. মহানবি (স.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবে -
 - i. বহুদৈশ্বরবাদ প্রচলিত ছিল
 - ii. গদ্য সাহিত্যের প্রসার ঘটেছিল
 - iii. অংশিবাদ প্রচলিত ছিল

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

জনাব 'ক' সব সময় সত্য কথা বলেন। এলাকাবাসী বিশেষ অনুরোধ করে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তাঁকে চেয়ারম্যান পদে প্রাপ্তি করেন। নির্বাচিত হবার পর তিনি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কোনো ভাতা নেন না। পরিষদের টাকা খুব হিসেব করে ব্যয় করেন। তিনি নিজে চাষাবাদ করে তার পরিবারের ভরণপোষণ করেন। জনাব 'ক'-এর আতীয় জনাব 'খ' পাশের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। জনগণের অবস্থা দেখার জন্য রাতের বেলায় তিনি ঘুরে বেড়ান। তাগের চাল গোপনে বিক্রি করার অপরাধে জনাব 'খ' তার ছেলেকে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

৩. জনাব 'ক'-এর কর্মকাণ্ডে ইসলামের কোন খলিফার কাজের মিল রয়েছে?

ক. হযরত আবু বকর (রা.)

খ. হযরত উমর (রা.)

গ. হযরত উসমান (রা.)

ঘ. হযরত আলি (রা.)

৪. জনাব 'খ'-এর কর্মকাণ্ডের সাথে যে খলিফার কাজের মিল রয়েছে তা অনুসরণ করলে-

i. জনগণের অধিকার নিশ্চিত হবে

ii. জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে

iii. জনগণ অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যন্ত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

(১)

দৃশ্যপট-১ : 'ক' এলাকার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। প্রচন্ড খরার কারণে এলাকায় তৈরি পানির সংকট দেখা দেয়। জমির ফসল নষ্ট হয়ে গেলে এলাকায় খাদ্যাভাব দেখা দেয়। উসমান সাহেব এলাকার সকল মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন। খাবার পানির সংকট নিরসনে তিনি নিজ উদ্যোগে এলাকার জনগণের জন্য বিশাটি টিউবওয়েল স্থাপন করে দেন।

দৃশ্যপট-২ : 'ক' নগরীতে বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের মানুষের বসবাস ছিল। তাদের মধ্যে প্রায়ই দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই থাকত। এই পরিস্থিতিতে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য একজন দুরদর্শী নেতা একটি চুক্তি করেন। এই চুক্তিতে সকল ধর্ম ও গোত্রের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা বলা হয়। এছাড়াও, নাগরিকদের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষা এবং বহিরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে সমিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা

দৃশ্যপট-৩ : দীর্ঘ আট বছর পর বহিরাগত শাতুর হাতে নির্যাতিত হয়ে স্বদেশ ছেড়ে আসা একদল মানুষ তাদের নিজ শহরে ফিরে আসেন। প্রত্যাবর্তনের সময় তাদের মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল। তবে তাদের নেতা প্রতিশোধের পরিবর্তে ক্ষমা ও শান্তির পথ বেছে নেন। তিনি শাতুদের ক্ষমা করে দেন এবং শহরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

ক. জীবনাদর্শ কাকে বলে?

- খ. হ্যারত আবু বকর (রা.)-কে সিদ্ধিক বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
- গ. দৃশ্যপট-১-এ জনাব 'ক'-এর কর্মকাণ্ডের সাথে কোন খলিফার কাজের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. দৃশ্যপট-২-এ ও দৃশ্যপট-৩-এ মহানবির জীবনে যে দুটি ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা চিহ্নিত করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় কোনটি ভূমিকা রাখে বলে তুমি মনে করো? উভয়ের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মহানবি (স.)-এর আবির্ভাবের আগের সময়কে 'অজ্ঞতার যুগ' বলা হয় কেন?
২. 'হিলফুল ফুজুল ও জাতিসংঘের উদ্দেশ্য অভিন্ন।' ব্যাখ্যা কর।
৩. হ্যারত উমর (রা.)-কে 'ফারুক' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
৪. হ্যারত আলি (রা.)-এর অনাড়ম্বর জীবন্যাপন অনুসরণ করা কেন প্রয়োজন?
৫. ইমাম আবু হানিফা (র.)-কে ফিকহ শাস্ত্রের জনক বলা হয় কেন?
৬. মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারেয়মিকে গণিত শাস্ত্রের জনক বলা হয় কেন?

সমাপ্ত

২০২৬ শিক্ষাবর্ষ

নবম ও দশম : ইসলাম শিক্ষা

যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার করো
তখন ইনসাফের সাথে বিচার করো ।

— আল কুরআন



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ।